দিনের প্রথম আলো

দিনের প্রথম আলো

শক্তিপদ রাজগুরু

বেঙ্গল পাবলিশার্স (প্রাঃ) লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

ট্রেনটা হাওড়ায় পৌঁছালো তখন বিকেল হয়ে গেছে। সমীর এতক্ষণে ভিড়ের মধ্যে কামরার একপাশে চুপচাপ নিজেকে গুটিয়ে বসেছিল। মনে তখন অনেক ভাবনা।

তার লাল মাটি শালবন ঘেরা ছোট্টগ্রামের কথা মনে পড়ে, মায়ের সজল চাহনি, সুবীর, ছোট বোন মিনার মুখটা ভেসে ওঠে। বার বার মনে পড়ে সবুজ গ্রামের পথ, বটগাছের ছায়া ঘেরা শিবতলা, শ্যামলীর মুখ। শ্যামলীই ছিল ওই গ্রামে তার কাছের জন।

শ্যামলী গ্রামের সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি বিভূতিবাবুর মেয়ে। বড় ঘরের মেয়ে, তবু সে সমীরকে কেমন আপন করে নিয়েছিল। শ্যামলীই ওর চাকরির কথায় খুশি হয়ে বলে,

—বাইরে গিয়ে নিজের পায়ের তলে মাটি খুঁজে নিতে হবে সমীরদা। লড়াই কোন দিন হার মানবে না।

সমীর সেই অজানা জগতেই চলেছে আজ। পিছনে পড়ে রইলো তার গ্রাম-আপন জন। মানুষকে এগিয়ে যেতে হলে পিছনের টানকে অগ্রাহ্য করেই এগোতে হয়।

পাশে একটি ভদ্রলোক, সঙ্গে একটি মেয়ে। মেয়েটি দেখছে সমীরকে। ওর চোখে মুখে গ্রাম্য ছাপটা সহজেই চোখে পড়ে। ভদ্রলোকই শুধোন,—কলকাতা যাচ্ছ বুঝি?

সমীর বলে,—হ্যাঁ।

—ওখানেই থাকা হয়?

সমীর বলে,—না। তবে এখন থেকে ওখানেই থাকতে হবে। চাকরি পেয়েছি, তাই যাচ্ছি। সরকারি চাকরির পরীক্ষায় পাস করেছি।

ভদ্রলোক একটু অবাকই হল,—চাকরি পেয়েছো? সরকারি চাকরি?

সরকারি চাকরি পাওয়াটা যেন তার কাছে একটা আশ্চর্যের কথাই। ভদ্রলোক মেয়েকে বলেন।

—দ্যাখ মণি, ব্রিলিয়ান্ট ছেলে।

মেয়েটি অবশ্য তেমন কোন বিশেষ কৌতূহল দেখায় না।

বোধহয় ওর রূপের কিছু দ্যামাক আছে, বিদ্যারও। সমীর গ্রামের ছেলে, শহরে মেয়েদের এই উন্নাসিক ভাবটাকে সে চেনে, তাই চুপচাপ দেখে মাত্র। মেয়েটি ডাগর চোখে সমীরকে একবার দেখে আবার ধাবমান ট্রেনের বাইরের দিকেই চেয়ে থাকে। বাবার কথার তেমন কোন গুরুত্ব দেয়নি। বাবার ওই ভাবে উপযাচক হয়ে কথা বলাটাকে সে পছন্দ করে না।

ভদ্রলোক বলেন,—তা উঠবে কোথায়?

সমীরের কাছে কলকাতা নতুন শহরই। তার গ্রামের নসু ভট্টাচার্য এখন এখানে

বৌবাজারের ওদিকে একটা বাসা ভাড়া করে রয়েছে। আপাততঃ নসুদার ওখানে উঠে চাকরিতে জয়েন করে পরে একটা আস্তানা দেখে নেবে।

তাই বলে,—বৌবাজারের ওদিকে গোপাল মল্লিক লেনে এক আত্মীয়ের ওখানেই উঠবো।

ভদ্রলোক বলেন,—আমরা থাকি ওদিকেই। শ্রীমানী বাজারের পিছনে। সরকার লেনে এসে বলরামবাবুর বাড়ি বললে সবাই দেখিয়ে দেবে। এসো একদিন—অবশ্য সরকার লেন ঠনঠনিয়া কালীবাড়ির কাছেই।

মেয়েটি বাবাকে যেন নীরব চাহনিতে এবার কথা বন্ধ করতেই বলে। কিন্তু বলরামবাবুর কথা বলার অভ্যাসটা বোধহয় বহুদিনের। তাই মেয়ের শাসন কানেই তোলে না।

বলে,—এই আমার মেয়ে সুলেখা, এও সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে চাকরি করে। ডালহৌসীতে ওদের অফিস।

ট্রেন তখন হাওড়ার কাছাকাছি এসে গেছে। সমীর প্রথমে একাই মুখ বুজে বসেছিল। বাড়ির কথা—নানা কথাই ভাবছিল।

এই ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলে তবু কিছুটা সময় কেটে গেল।

মেয়েটি বলে,—বাবা হাওড়া আসছে। মালপত্র গোছগাছ করে নাও।

বলরামবাবুরও খেয়াল হয়,—বলেন, হ্যাঁ।

স্টেশনের বাইরে এসে বলরামবাবু কোথায় মিলিয়ে গেছেন সকন্যা। সমীর আবার একা। বৈকালের ম্লান আলো পড়েছে গঙ্গার বুকে—দু'চারটে লঞ্চ, নৌকা দেখা যায়। ডাঙ্গার পথে মানুষের ভিড় আর ভিড়, যেন মানুষের জোয়ার নেমেছে। সমীরকে যেতে হবে বৌবাজারের দিকে।

সঙ্গে একটা টিনের রঙচটা সুটকেস। ওটা তার অনেক দিনের সঙ্গী। গ্রামের বাড়ি থেকে ওটা এখানে এসেছে তার সঙ্গী হয়ে, আর সতরঞ্চিতে জড়ানো পাতলা তোষক, চাদর, একটা বালিশ দড়ি দিয়ে বাঁধা।

—কোথায় যাবেন বাবু?

একজন লোক তাকে শুধোচ্ছে। শীর্ণ গাল তোবড়ানো লম্বাটে চেহারা।

সমীর বলে,—বৌবাজারের ওদিকে গোল দিঘীর কাছে।

লোকটা এবার ওর বেডিংটাই তুলে নিয়ে পরম আত্মীয়ের মত বলে,—আসুন, আসুন। এসব মালপত্তর নিয়ে ট্রামে বাসে যেতে পারবেন না। রিকশাতে চলুন। আরামসে একেবারে বাড়ির দোরগোড়ায় পৌছে যাবেন।

তারপরই এদিকে একটা রিকশাওয়ালাকে ডেকে তার রিক্সায় মালপত্তর তুলে দিয়ে বলে সমীরকে,

—বসুন। রিকশাওয়ালাকে ডেকে বলে,—বাবু গোলদিঘীর কাছে যাবেন। হ্যারিসন রোডের ওদিকে, কলেজ স্ট্রিটের ওপরেই।

রিকশাওয়ালা বলে,—চলিয়ে।

শীর্ণ লোকটা বলে,—একদম ঠকাবে না। পাঁচ টাকা ভাড়া দেবেন—সমঝা?

রিকশাওয়ালা রাজি। এবার শীর্ণ লোকটা সমীরকে বলে,

—তিন টাকা এখন দিন তো স্যার। বাবুকে ঠিক সে লে যানা।

সমীরও যাবার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে শীর্ণলোকটার হাতে তিন টাকা দিতে এবার রিকশাওয়ালাও দৌড়াতে শুরু করে।

তখনও গঙ্গার উপর নতুন হাওড়া ব্রিজ তৈরি হচ্ছে, আকাশ ছোঁয়া লোহার বিমগুলো জোড়া হচ্ছে। এক কর্মকাণ্ড চলেছে, অনেক নীচে ভাসমান নৌকার উপরের পথ।

ওই উপর দিয়ে রিকশা চলেছে মহানগরের দিকে। একে একে আলোগুলো জ্বলে ওঠে। গ্রামের অন্ধকার এখানে নেই। কর্মব্যস্ত আলো ঝলমল পথে ট্রাম বাসের জটলার মধ্যে চলেছে রিকশাওয়ালা। সমীর বিস্মিত চাহনিতে নতুন এক শহরকে দেখছে। ইট কাঠ কংক্রিটের এই অচেনা শহর। এখানেই তাকে থাকতে হবে। নিজের ঠাঁই করে নিতে হবে।

রিকশাওয়ালা গোলদিঘীর কাছে আসতে এবার সমীরের পথটা মনে পড়ে। কিছুদিন আগে নসুদার বাসায় থেকে পরীক্ষা দিতে এসেছিল। তাই বলে,—শ্রীগোপাল মল্লিক লেন যাবে, ওই দিকে।

কর্মব্যস্ত শহরের মধ্যে গলিগুলোর নিজস্ব একটা রূপ আছে। টিমটিম করে আলো জ্বলে। পথটা নির্জন, শীতের দিন, কুয়াশা নামছে। একটা প্রায়ান্ধকার বাড়ির কাছে এসে নামে। এই বাড়িটাই। পাশে একটা ডাস্টবিনে এখনও জঞ্জাল পড়ে আছে। দূরে একটা লাইট পোস্ট, তবে ওর আলোটা জ্বলেনি।

সমীর নেমে রিকশাওয়ালাকে দুটো টাকা দিতে সে বলে,

—পাঁচ রুপেয়া বাবু।

সমীর বলে,—আগে যে ওকে তিন টাকা দিলাম।

রিকশাওয়ালা বলে,—উ তো ওর দালালি লে গিয়া, হামারা পাঁচ রুপেয়া দিজিয়ে।

অবাক হয় সমীর,—ও তোমার লোক নয়?

—নেহি। উহার কো হাম নেহি পছন্‌তা। হামকো পাঁচ রুপেয়া চাহিয়ে।

অর্থাৎ গেল তিনটে টাকা। সমীরকে কলকাতা পা দিতেই প্রথম ঠকালো লোকটা। সমীরের কাছে তিনটে টাকাও অনেক। বাড়ি থেকে আসার সময় ধান বিক্রি করে সংসারের খরচ থেকে মাত্র কুড়ি টাকা সংগ্রহ করে এনেছে। চাকরি পেলে মাস গেলে তবে টাকা পাবে। ততদিন নসুদার দুবেলা অন্নই তার ভরসা। আর ওই টাকাটা। তার থেকে আট টাকাই চলে গেল।

রিকশাওয়ালা তাড়া লাগায়,—হামারা রুপেয়া বাবু।

দু একজন কৌতূহলী লোকও দাঁড়িয়ে গেছে। গোলমাল ঠেকাবার জন্য সমীর ওকে তিনটে টাকা দিয়ে দেয়।

নসু ভট্টাচার্য এখানকার কোন বেসরকারি অফিসে চাকরি করে। সমীরদের গ্রামে ভট্টাচার্য পাড়ায় বাড়ি। ছুটি ছাটায় বাড়ি যায়। সমীরকে চেনে। সে-ই একদিন বলেছিল,

—আর কোথায়ও ঠাঁই না পাস, আমার ওখানে দু'চার মাস থাকতে পারবি। তবে কষ্ট করে থাকতে হবে।

সমীর সেই ভরসাতেই এসেছে। মাথা গোঁজার ঠাঁই একটা দরকার।

নসুবাবু সবে অফিস থেকে ফিরে হাত-পা ধুয়ে ঠাকুর প্রণাম করে লুঙ্গি পরে চাদর

জড়িয়ে বসেছে। গিন্নী প্রমীলাও গ্রামের মেয়ে। সমীরদের গ্রামে অর্থাৎ নিজের শ্বশুরবাড়িতে কয়েক বছর থাকার পর কলকাতার ভাড়া বাড়িতে এসেছে। একটি মেয়ে, প্রমীলা তাকে এখানকার স্কুলে ভর্তি করেছে। নিজে তেমন লেখাপড়া জানে না, তাই কাজলীকে আধুনিকা করে তুলতে চায়।

কাজলী ও ঘরে পড়ছে। এবার ক্লাশ নাইনে উঠেছে সে। পড়াশোনা ছাড়া প্রমীলা তাকে পাড়ার গানের স্কুলে গানও শেখায়। তার জন্য অফিস থেকে টাকা ধার করে একটা ভাল হারমনিয়ামও কিনে এনেছে নসুবাবু। কিনতে বাধ্য হয়েছে।

কাজলী প্যাঁ পোঁ করে গানের রেওয়াজ করছে। হঠাৎ কড়া নাড়ার শব্দ হয়। নসুবাবু এগিয়ে যায়।

—কে? দরজাটা খুলতে এবার ঘরের আলোয় সমীরকে দেখে বলে,

—তুমি! সমীর, এসো, এসো। তারপর গলা তুলে বলে, কে এসেছে দেখে যাও।

প্রমীলার দাদার আসার কথা ছিল। প্রমীলার বাপের বাড়ির দিকে টান একটু বেশি। তাই দাদাকে অভ্যর্থনা করার জন্য হাসিমুখে বের হয়ে এসে সামনে মালপত্র সমেত সমীরকে দেখে হাসিটা মিলিয়ে যায়। বুঝেছে সমীর এখানেই থাকবে ওর মালপত্র দেখে। খরচাতো বটেই তার খাটুনিও বাড়বে। নসুবাবু বলে,

—এসো, এসো সমীর। গ্রামের খবর ভাল তো?

—হ্যাঁ।

সমীর নসুদা আর বৌদিকে প্রণাম করে। রেওয়াজ বন্ধ করে কাজলী এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়েছে। সমীরকে সে দেখেছে গ্রামে।

নসুবাবু বলে,—বোস।

তক্তপোষেই বসে সমীর। নসুবাবু প্রমীলাকে বলে,—ছেলেটাকে চা-জলখাবার দাও। এত দূর থেকে আসছে। সমীর কলতলায় হাত-মুখ ধুয়ে নে।

একতলায় রান্নাঘরের সামনে একটু বারান্দা মত। পুরনো আমলের বাড়ি তাই সামান্য একটু উঠোন আছে। ওদিকে বাড়িওয়ালার দোতলায় ওঠার সিঁড়ি। নিচে এদের বাথরুম।

নসুবাবু বলে,—এই ঘরে তুই আর আমি শোব। বিছানাপত্রও এনেছিস দেখছি। বেশ, তক্তপোষে পেতে দে।

প্রমীলা চা আর মুড়িমাখা এনেছে। সেই দুপুরে দুর্গাপুর ইস্টিশনে পাউরুটি আর ঘুগনি খেয়েছিল। খিদেও লেগেছে সমীরের। এবার খিদেটা জানান দেয়।

সমীর মুড়ি খেতে খেতে বলে, চাকরিতে জয়েন করতে বলেছে কাল।

—যাক, চাকরিটা পেয়েছিস তাহলে! বাঃ! সরকারি চাকরি বলে কথা।

কথাটা শুনেছে প্রমীলা। সমীর বলে,

—কিছুদিন তোমার এখানে ঠাঁই দিতে হবে নসুদা। তারপর মেস টেস দেখে চলে যাব তোমাদের অবশ্য অসুবিধে হবে। নসুবাবু বলে,—অসুবিধে হবে তোরই। আমার বরং সুবিধেই হবে। সকাল-সন্ধে কাজলীকে পড়াবি। বুঝলি মেয়েটার মাথা আছে। ভাল করে পড়লে ভাল রেজাল্ট করবে। তা পড়ে কই। এবার থেকে তুই ওকে পড়াবি। আমি নিশ্চিন্ত হব।

সমীরও খুশি হয়। তবু নসুদার জন্য কিছু করতে পারবে। সমীর বলে,
—তাই পড়াবো। আমারও সময়টা কেটে যাবে।
প্রমীলাও শোনে কথাটা। সমীর লেখাপড়ায় ভাল। দুবেলা মেয়েকে পড়াবার জন্য মাস্টার রাখার জন্য খরচাও তো কম নয়। সারাক্ষণের জন্য একজন মাস্টার থাকলে তো ভালই হয়। তাই প্রমীলা এটাকে মেনে নেয়।
রাতে সমীর ও নসুবাবু ও ঘরে শুয়েছে। এ ঘরে মা আর মেয়ে।
প্রমীলা বলে,—এবার থেকে সমীর তোকে পড়াবে।
কাজলী বলে,—ওই গেঁইয়া ছেলেটার কাছে পড়তে হবে?
প্রমীলা বলে, কলকাতায় প্রথমে গেঁইয়ারাই আসেরে। পরে তারাই শহুরে হয়ে উঠে। সমীর লেখাপড়ায় খুবই ভাল।
কাজলী চুপ করে কি ভাবে।

বিরাট বিল্ডিং। ওদিকে বিশাল গম্বুজ, তাতে পেল্লায় একটা ঘড়ি। লালদিঘীতে এসেছে সমীর তার চাকরিস্থলের খোঁজে। পকেটে সেই রেজেস্ট্রিকরা চিঠিখানা। গোলদিঘী দেখেছে—এটাকে বলে লালদিঘী।
চারিদিকে সুন্দর বাগান, ঘাস-ফুলের বাহার। সারবন্দী কয়েকটা পামগাছ মাথা তুলেছে। লালদিঘীর জলে ওদিকের গম্বুজের ছায়া পড়েছে। ট্রাম বাস-এর জটলা আর চলেছে কেরানিকুল। যেন কোন যুদ্ধের পল্টনই চলেছে। যে যার অফিসে ঢুকে পড়ে।
সমীর এসে বিশাল বাড়িটার সামনে দাঁড়ায়। বড় বড় থাম। প্রশস্ত বারান্দা। দরজাগুলো বিশাল। কোন দিকে কোথায় যাবে জানে না সে। শেষে এক কাউন্টারে বসা এক ভদ্রলোককে চিঠিখানা দেখাতে সে বলে,—পিছনের গেট দিয়ে ঢুকে বাঁ পাশে একটা চারতলা বাড়ির দোতলায়. স্টাফ সেকশনে যান।
সমীর গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকে অবাক হয়! বিশাল উঠানে সারবন্দী লাল রঙের বড় মাঝারি ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে। আর সেগুলো থেকে ছোট বড় ব্যাগ নামানো হচ্ছে। ব্যাগের মুখগুলো বাঁধা, সিল করা একটা ট্যাগ লাগানো। কোথা থেকে আসছে সেইটাই পড়ে চলেছে একজন আর অন্য জন তার হাতের কাগজের লিস্টে টিক দিচ্ছে।
তারপর ব্যাগগুলো ট্রলিতে চাপিয়ে চলে যাচ্ছে ওদিকে লিফ্‌টে করে। উপরে তোলা হচ্ছে ওদিকের বড় বাড়িটায়। চারিদিকে কর্মব্যস্ততা।
সমীর চিঠিখানা দেখিয়ে স্টাফ সেকশনের নাম করতে একজন ওই বিলডিং-এর দোতলায় যেতে বলে।
খুঁজে সমীর একটা বড় হলঘরে আসে। সারবন্দী টেবিলে ফাইল, লোকজনও কাজে ব্যস্ত। ওদিকে একজন ভদ্রলোক অপেক্ষাকৃত বড় টেবিলে বসে পান চিবুচ্ছেন। বানাতমোড়া টেবিল। সেখানে দাঁড় করানো একটা যন্ত্র। তাতে কলকের মত একটা ছোট চোঙ ঝুলছে। ঝনঝন করে সেটা বেজে উঠতেই ভদ্রলোক কলকের মত বস্তুটা কানে দিয়ে সামনের ছোট চোঙে মুখ লাগিয়ে কি কথা বলছেন। ওটা টেলিফোনই। নাম শুনেছিল, এখন দেখলো সেটা।
কথা বলা শেষ হতে সমীর ভীরু পায়ে এগিয়ে গিয়ে চিঠিটা দেখাতে তিনি চিঠিখানা পড়ে বললেন,

—ওহে নিশি তোমার আর একজন এসেছে। ওইখানে যাও, ওর কাছে।

নিশিকান্তবাবু চিঠিখানা নিয়ে ওকে বসতে বলে ওদিক থেকে একটা ফাইল বের করে। সমীর দেখে তার নাম লেখা ফাইল। ওতে তারই পাঠানো দরখাস্ত, ফিলআপ করা ফর্ম সার্টিফিকেট সবই আছে। ভদ্রলোক ওই চিঠিখানা রেখে এবার একটা ফর্ম সই করিয়ে নিয়ে বললেন,—চলো।

অন্য একটা বিল্ডিং-এর একতলার লম্বা হল ঘরে সমীর আসে তার সঙ্গে। সার সার চেয়ার। চেয়ারগুলো বেশ উঁচু। লম্বা কাউন্টারে বসে ক'জন রেজিস্ট্রি চিঠি নিচ্ছে। অন্য একজন টিকিট ঠিক আছে কি না দেখে রসিদ দিচ্ছে। ওদিকে প্রত্যেক কাউন্টারের সামনে মানুষের ভিড়। খাঁকি উর্দিপরা বিভিন্ন বেসরকারি অফিসের দারোয়ানরা রয়েছে চিঠির বান্ডিল নিয়ে।

নিশিবাবু ওই সেকশনের বড়বাবুকে সমীরকে দেখিয়ে বলে,—একে এখানেই পোস্টিং করে গেলাম। আপনার সেকশনে রমেশবাবু।

রমেশবাবুর জোড়া ভুরু। চোখে চশমা। এবার বেশ চড়াস্বরে বলে সে,—স্টাফ সেকশন কি আমার সেকশনকে ট্রেনিং স্কুল ভেবেছে মশাই? সব নতুন মালদের এখানেই দেবে? কিছুই জানে না। এদের নিয়ে আমি কী করবো?

নিশিবাবু বলে,—লেখাপড়া জানা ছেলে, দুদিনেই কাজ শিখে নেবে। তখন দেখবেন বুড়ো বেতো ঘোড়ার চেয়ে এরাই হবে কাজের।

রমেশবাবু সমীরকে এবার আপাদমস্তক জরিপ করে দেখে বলে,—কী পাস?

—বি-এ।

—হুঁ। গোবিন্দ।

একজন টাক পড়া লোক এগিয়ে আসে। রমেশবাবু বলে,—একে এখন রেজিস্ট্রি লিস্ট লিখতে শেখাও। আর রেট-ফেটগুলো বুঝিয়ে দেবে, যাও।

কাজ তেমন কিছুই নয়। ঘর কাটা চালানের খাতা।

কাউন্টার থেকে বুক হয়ে তাড়া তাড়া রেজিস্ট্রি চিঠি আসছে ভিতরের টেবিলে। পাঁচ ছ'জন তার বয়েসি তরুণ কার্বন পেপার দিয়ে সেই নাম্বার আর গন্তব্যস্থল লিখে চালান বানাচ্ছে। এক একটা ফর্মে পঞ্চাশখানা করে চিঠি এনট্রি করে চালান সমেত বান্ডিল বাধছে। সেই চিঠিগুলো এবার চালানে সই করে নিয়ে যাচ্ছে শর্টিং সেকশনের লোকেরা। একাজে বুদ্ধির দরকার নেই, শুধু লিস্ট করা।

সমীরও দু-একজনের কাছে ব্যাপারটা দেখে নিয়ে লিস্ট বানাতে থাকে।

বৈকাল নেমেছে, এবার ছুটি। হিসাবপত্র মিলে গেছে। সমীর এবার একজনের কথা শুনে তাকালো। ফর্সা ছিপিছিপে চেহারা, পরনে আদ্দির পাঞ্জাবি। চেহারাটা সুন্দরই। ছেলেটি বলে,

—আজ নতুন ঢুকলে?

—হ্যাঁ।

—আমার নাম রোহিণী চৌধুরী।

সমীরও তার নাম বলে। এর মধ্যে তাদের বয়সীই আর কয়েকজন—তারা উঁচু চেয়ারে

বসে রেজেস্ট্রি বুক করছিল, তাদের ডিউটিতো শেষ হয়েছে। একজন বলে,—মরতে আর চাকরি পেলে না ভায়া? এখানে ছুটি নেই, শুধু খাটো আর খাটো।

কে বলে,—থামবি মিছরি?

মিছরি নামটাও বিচিত্র, সেই তরুণ বলে,—

—থেমেই তো ছিলাম রে। টং-এ চড়েছিলাম এগারোটায়-ওই রমেশের টং, নামছি তিনটেতে। তারপর চালান বানাও-ওদিকে ওর পেটোয়ারা আরামসে আছে, খেটে মরছি আমরা, চল—

সমীর তবু খুশি, চাকরি একটা পেয়েছে, সরকারি চাকরি। তবে ভেবেছিল টেবিল চেয়ারে বসে ফাইলে ইংরাজী লিখবে। কিন্তু তা নয়। পেনসিল দিয়ে চালান বানানো—না হয় ওই টং-এর চেয়ারে বসে সামনে সারবন্দী দারোয়ানদের চিৎকারই শুনতে হবে।

তবু এই জীবনকেই মেনে নিতে হবে। আরও দেখেছে ডালহৌসী পাড়ার সব অফিসই রবিবার বন্ধ। সেদিন এ'দিকটা একেবারে নির্জন। চা-হকার, দু'চারজন খাবারওয়ালারাও বসে না বড় বড় বাড়িগুলো সেদিন যেন ঘুমন্তপুরী।

রবিবারও তাদের কাজ করতে হয়। সাপ্তাহিক কোন ছুটিই নাই তাদের। সে দিন রেজেস্ট্রি বুকিং হয় না। কিন্তু সারা ভারত থেকে মেল ট্রেনে ডাকের বস্তা ঠিকই আসে। সেগুলো থেকে রেজেস্ট্রি চিঠি যত কলকাতায় আসে সেগুলো লিস্ট করে বিভিন্ন অফিসে পাঠাতে হয়।

সব বিভাগেরই এই ভিতরের কাজ চলে। কেবল ওই এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং অর্থাৎ লাল বাড়িতে যারা কাজ করেন তাদের নাকি ইংরাজী লিখতে হয়। মাথা ঘামাতে হয়। বড় সাহেবের খাস দপ্তরের লোক তারা, তারাই ছুটি পায়।

তখন ব্রিটিশ আমলের শেষ দিক চলছে। বড় সাহেবও একজন লালমুখো সাহেব, লম্বা চেহারা—একটা হাফপ্যান্ট পরে কুকুর নিয়ে শিষ দিতে দিতে বিভিন্ন বিভাগে ঘোরে। সঙ্গে ওই লালবাড়ির দু' একজন ফেউ থাকে। কেউ সাহেবের মত পেন্টুল কোটও পরে। গুরুশরণবাবু তাদের একজন, আর একজন মিত্তিরবাবু। তিনি সার্টটাকে কাপড়ের নিচে চালান করে মালকোচা মেরে ধুতি পরেন। পায়ে মোজা-বুট আর গায়ে কোট। যেন এক খিচুরি সাহেব।

ডিপার্টমেন্টে সবাই তখন তটস্থ থাকে। সাহেবের কোপ কখন কার উপর পড়বে কে জানে!

সাহেবের পর কোপ পড়বে ওই মিত্তিরসাহেবের। তাকে কেউ হাসতে দেখেনি, আর সে ইংরাজীতেই কথা বলে।

সমীরদের সেকশনে সেই টেকো শীর্ণ ভোলানাথ বলে,

—কাঁচাখেকো দেবতা। দু'পাতা ইংরেজী জানলে আমিও র‍্যালা নিতাম।

ভোলানাথের বাড়ি তারকেশ্বর লাইনে। শনিবার সে ওই রমেশবাবুকে তেল দিয়ে বেলা তিনটের ট্রেন ধরবেই। আর রবিবারটাও ম্যানেজ করে সোমবার ফিরবে। বড়বাবুর জন্যে খেতের বেগুন, আলুর বস্তা, খেজুরগুড়ের পাটালি ইত্যাদি নিয়ে এসে বলে,—খেতের বেগুন, টাটকা স্যার। গাছের গুড় স্যার। ভাবলাম নিয়ে যাই স্যারের জন্যে।

দুষ্টু লোক বলে, ভোলা এখানকার বাজার থেকে কিনে এনে খেতের বলে ভেট দেয়।

সমীর অফিসে এখন ধাতস্থ হয়ে গেছে। রেজেস্ট্রি কাউন্টারে এখন বুকিং করে। এখন ওর হাতও চলে জোর। ওর বুকিং দেখে রমেশবাবুও খুশি।

এর মধ্যে অনেক সমবয়সী বন্ধুও জুটে গেছে। তাই অফিসের সময়টা কেটে যায় ভালই।

মাসের মাইনেও পেয়েছে সে। জীবনে এই প্রথম রোজকার। এতগুলো টাকা সে এর আগে একত্রে পায়নি। এ তার নিজের প্রথম রোজগার। সমীর জানে দেশের বাড়িতে তাকে মা ভাই বোনদের ভরণপোষণ করতে হবে। ভাইদের মানুষ করতে হবে, বোনদের বিয়েও দিতে হবে। আজ তার বাবা নেই। সব কাজ দায়িত্ব সেইই নিজের কাঁধে নিয়ে সেটাকে পালন করবেই।

মাকে মনিঅর্ডার করে পঞ্চাশ টাকা পাঠিয়ে দেয়। নিজের জন্যে কিছু টাকা রেখে দেয়।

গোপি বলে,—বি এ অনার্স তুই। এবার আপার ডিভিশনের জন্যে পড়াশোনা শুরু কর। তোর হবেই, মাইনেও দেড়া হয়ে যাবে। চাকরিতে উন্নতি করতেই হবে রে, না হলে এই কাউন্টারে বসে পাবলিকের গালাগালই খেতে হবে।

সমীরও ভাবছে কথাটা। উপরে তাকে উঠতেই হবে।

নসু ভটাচায ছাপোষা মানুষ। সমীর দেখেছে তবু গ্রামের ছেলে বলে নসু ভটচায তাকে এই বিপদের সময় আশ্রয় দিয়েছে, খাবারও দিয়েছে। অবশ্য সমীরও এর মধ্যে কাজলীকে ইংরাজী-অঙ্কতে কিছুটা এগিয়ে দিয়েছে। আজ সকালে সমীরই বাজার করে আনে। নসু ভটচায আপত্তি করে।

—এ সব কি করছো সমীর?

সস্তার বাজার। দু'টাকাতেই কাঁচা বাজার মাছ হয়ে যায়। টিফিনের পাউরুটি কলাটাও হয়ে যায়। সমীর বলে—এটুকু করতে দাও নসুদা।

প্রমীলা অবশ্য খুশিই হয়। তবু সংসারে এখন খাওয়াটা ভালোই হয়। রোজ মাছ, কলা পাউরুটি এসব আসে। বাজারের পয়সা অবশ্য প্রমীলা কিছু বুঝে নেয় নসুর কাছে। সেটা তার ভাঁড়েই জমা হয়। এদিকটা সামলায় সমীরই।

বাজার থেকে এসে এবার কাজলীর পড়া নিয়ে বসে। কাজলী এমনিতে ফাঁকিবাজই। স্কুলের পড়ার খোঁজ খবর নেওয়ার সময় নসুর ছিল না। সকালে বাজার সেরে অফিস, আর অফিসের পর রাধাবাজারে একটা অফিসে খাতা লেখার কাজ সেরে বাড়ি ফেরে নটা নাগাদ। তখন আর মেয়ের পড়ার খবর নেওয়ার মত ধৈর্য থাকে না। খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়ে।

ফলে কাজলী নিজের খুশি মতই চলতো। স্কুলে যেত আসতো। সন্ধ্যায় প্রমীলাকে দেখিয়ে পড়তে বসতো মাত্র। এখন আর সেটা চলে না।

সমীর বলে,—এতদিন ধরে ফাঁকি দিয়েছো।

কাজলী বলে,—না তো!

—ইংরেজী গ্রামার, ট্রানশ্লেশনের বাহার তো এই। আর অঙ্ক, ইতিহাস, বাংলা—এসবে তো এবার নির্ঘাৎ ফেল করবে।

প্রমীলা বলে,—ওমা! এই পড়তিস তুই!

কাজলী এখন পড়াশোনা করতে বাধ্য হয়েছে। অফিস থেকে ফিরে সমীর কাজলীকে রাত দশটা পর্যন্ত পড়ায়।

প্রমীলাও খুশি। এবার হাফইয়ারলি রেজাল্ট দেখে নসু বলে,

—না, সমীর তুমি গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করেছো হে।

কাজলী বলে,—আমি গাধা?

—না, তখন গাধা ছিলি। সমীর তোকে জাতে তুলেছে।

স্কুলেও কাজলীকে কেউ চিনতো না। অবশ্য রূপের চটক তার ছিল। দিদিমণিরা বলতো,—রাঙামুলো। মন দিয়ে পড়াশোনা কর।

সেই কাজলী এবারের পরীক্ষায় অনেক ভাল রেজাল্ট করেছে। ইংরেজি, অঙ্কে প্রভৃত উন্নতি দেখে দিদিমণিরাও খুশি, তারাই এবার বলেন মন দিয়ে পড় কাজলী, ফার্স্ট ডিভিশন তো পাবিই। অঙ্কে লেটারও থাকবে।

কাজলীও বোঝে স্কুলে তার কদর বাড়ছে। সম্মান-প্রীতিও পাচ্ছে সে অনেকের। আর এটা সম্ভব হয়েছে ওই সমীরদার জন্যে।

প্রথম প্রথম সে সমীরকে পাত্তাই দিতে চায়নি। শহরের মেয়ে সে। সমীর তাদেরই আশ্রিত। প্রথম প্রথম বলতো,—কী পড়াবে তুমি? ইংরেজি, অঙ্ক?

সমীর বুঝেছিল শুধু কাজলী নয়, অনেকেই তাকে গেঁইয়া বলে ভাবে। পাত্তাই দিতে চায় না। ট্রামে সেদিন কার পা মাড়িয়ে দিতে লোকটা ওকে দেখে বলে—যত্তসব গেঁইয়া ভূত এসে শহরটাকে নষ্ট করে দিল।

সমীর মনে মনে বলে, একদিন এই গাঁইয়া ভূতরাই শহরকে দখল করবে, তোমাদের শহরে বাবুগিরির হাল বদলে দেবে। কথাটা বলতে গিয়েও পাবেনি, তবে তার মনের অতলে এই শহরে পা রাখার সিদ্ধান্তই নেয় আর একবার।

কাজলীর কথায় বলে,—গাঁইয়ারাও মানুষ। আর তারা শহরের মানুষের থেকে কম নয় কিছুতেই। পড়তে এসো। এই ট্রানস্লেশনটা করে রাখবে। ওবেলায় যেন দেখি, সাবজেক্ট প্রেডিকেট, ভার্ব সব যেন ঠিক ঠিক থাকে, আর এই অঙ্ক কটাও।

—কাজলী বলে-কখন করবো এতো?

—আজ তো স্কুল নেই। সমীর বলে।

—গানের ক্লাস।

প্রমীলাই বলে—গান পরে হবে। সামনে পরীক্ষা. সমী যা বলছে তাই কর।

কাজলী বুঝেছে এবার সমীরের গুরুত্ব বেড়েছে এ বাড়িতে। মুখ বুজে থাকে কাজলী।

নসুও বলে,—সমীর যা বলে তাই করবি।

প্রমীলা এখন একটা কথা ভাবছে। শহরে এসে সে দেখেছে পাড়ার অনেক মেয়েকেই। নিজেরাই সেজেগুজে স্কুল কলেজে যায়। অনেকেই বিয়ে করে ভালবেসে। এখন 'লাভ' কথাটা বেশ চালু হয়ে গেছে।

পাশের মুখুজ্জেবাড়ির মেয়ে ললিতাই তো এক কাণ্ড বাধিয়ে বসলো। মুখুজ্জেরা নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। কর্তা ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী করেন। গঙ্গাস্নানে যান প্রতিদিন ট্রামে চড়ে। সেই বাড়ির মেয়ে ললিতা কলেজে পড়তে গিয়ে একটি ছেলের সঙ্গে প্রেম করলো। ছেলেটি

ঘোষ। কেউ বলে কায়স্থ, কেউ বলে গোয়ালা। বাড়ির অমতে বিয়ে করে বসলো সে। এই নিয়ে থানা, পুলিশ, কোর্ট-কাছারিও হয়ে গেল।

তাই ভয় হয় প্রমীলার কাজলীকে নিয়ে। মেয়ে বড় হচ্ছে, ও স্কুলে-গানের স্কুলেও যায়। নসু বলে-এবার পাস করলে ওকে কলেজেই পড়াবো।

প্রমীলা শহরে থাকলেও আসলে সে গ্রামের মেয়ে। গ্রামীণ সংস্কৃতিকে এখনও সে ভোলেনি, বাড়িতে রোজ পূজা টুজা ও করে। প্রমীলা বলে—আর বেশি পড়িয়ে কাজ নাই। যা দিনকাল পড়েছে, মেয়ের বিয়ে-থা দেবার চেষ্টা করো। বড় ভয় হয় বাপু!

নসু বলে— আরে ভয়ের কি আছে, বিয়ে বললেই তো বিয়ে হবে না। পাত্র পছন্দ করতে হবে, তারপর একগাদা টাকা চাই। সময় লাগবে। কি এমন বয়স ওর, পড়াশোনা করছে, করে যাক।

কাজলীও শোনে কথাটা। তার দেহ-মনে সদ্যজাগর যৌবনের পদধ্বনি। নিজেকে ও যেন নতুন করে আবিষ্কার করে সে। সেই দেহে এসেছে নতুন এক সত্তার প্রকাশ। মুখ চোখের চাহনি বদলেছে, বুকের চেহারাও যেন ফলভারাবনত শাখা। নিজের দেহমনের রূপান্তর তার কাছে ধরা পড়ে। কাউকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতে মন চায়। তাই বেশ কিছু যুবকের মুখ, তাদের চাহনিগুলো ভেসে-উঠে। এই সব ভাবনাগুলো এতদিন মনে জাগেনি। কেমন বিচিত্র অনুভূতি জাগে মনের গহনে। একটা আনন্দের সাড়া জাগে তার মনে।

সেদিন অঙ্ক কয়েকটা পারেনি। সমীর এখন অফিস থেকে আইনের বইপত্র এনে নিজেই পড়াশোনা করে আর কাজলীকেও পড়ায়।

কাজলী বলে, অঙ্কগুলো করতে পারিনি।

সমীর বিরক্ত হয়ে বলে,—কোন কম্মেরই নয় তুমি। একেবারে রাঙামূলো।

অন্য দিন হলে কাজলী জবাব দিত, কিন্তু আজ সে দেয় না। সমীর তাকে এইসব বলছে, কি রুদ্ধ অভিমানে সে কান্নায় ভেঙে পড়ে। ডাগর চোখ জলে ভরে ওঠে। ওর কান্নায় অবাক হয় সমী।

---কী হল! কাঁদবার কী হল?

কোন জবাব দেয় না। কাজলী কাঁদতে থাকে। সমীর বলে,

—ঠিক আছে। আজ পড়তে হবে না।

—না, আমি এগুলো করে তবেই উঠবো

কাজলীর গলায় জেদ, অভিমানের সুর বাজে।

এখন এক নতুন কাজলী। সমীর চেনে না তাকে। এই বয়েসের মেয়েদের রহস্যময়ী বলে মনে হয় তার। শ্যামলীর কথা মনে পড়ে।

তাদের গ্রামে বিভূতিবাবুর মেয়ে। বিভূতিবাবু ওখানের অঞ্চলপ্রধান। সঙ্গতিপন্ন পরিবার। ছেলে নামী ডাক্তার। বিভূতিবাবুর ছোট মেয়ে শ্যামলী। শ্যামলীর চোখেও সে জল দেখেছে কারণে-অকারণে। কলকাতা আসাব দিনও এসেছিল সে। সমীর দেখেছিল তার চোখে জল। কারণটি শুধিয়েও জানতে পারেনি।

শ্যামলীর কথাই মনে পড়ে আজ বারবার। মনে পড়ে গ্রামের কথা। আজ চার-পাঁচ মাস সে বাড়ি ছেড়ে এসেছে। নতুন চাকরি। ছ'মাস না গেলে সে কোন ছুটি পাবে না। ছ'মাস পার হলেই সে বাড়ি যাবে।

অবশ্য বাড়ি থেকে মাঝে মাঝে সুবীর চিঠি দেয়। সুবীর পাশের গ্রামে জুনিয়ার হাইস্কুলে পড়ে। আর প্রবীর দূরের কোন স্কুল বোর্ডিং-এ থেকে এবার ম্যাট্রিক দেবে। সমীর প্রতি মাসে মাইনে পেয়ে মাকে টাকা পাঠায়। আজ তার কিছুটা তৃপ্তি জাগে মা, ভাই, বোনদের জন্যে কিছু করতে পেরেছে। অন্তত মানুষ করার চেষ্টা সে করছে ভাই বোনদের, নিশ্চিন্ত করতে পেরেছে মাকে।

সমীরের মনে পড়ে বাবা প্রবাসে চাকরি করতেন। দেশের বাড়িতে দাদাকে টাকা তবু পাঠাতেন। প্রবাসে বাবা মারা যাবার পর মা প্রভাদেবী সমীর, প্রবীর, সুবীর আর মিনাকে নিয়ে দেশের বাড়িতে ফিরলেন। সেদিন জ্যাঠামশাই নেই। জ্যাঠতুতো দাদা রমেন আর ছোট দেবেন আর দেখেছিল দজ্জাল জেঠতুতো করালীদিকে। জেঠিমাও এবার হঠাৎ এসে পড়া প্রভাদেবীকে মেনে নিতে পারে না। নানাভাবে অত্যাচার অপমানই শুরু হলো।

সেই দিনগুলোর কথা ভোলেনি আজও সমীর। তাদের সম্পত্তির অংশ দেবে না। কিন্তু মাকে দেখেছিল সমীর। বিপদের সময় নিজের সন্তানদের বাঁচাবার জন্য ম-ই নিয়েছিল রক্ষাকর্ত্রীর ভূমিকা। সেদিন মায়ের ব্যক্তিত্ব আর বুদ্ধির জন্যই সমীররা পায়ের তলায় মাটি পেয়েছিল।

হোক মাটির জীর্ণ ঘর তবু নিজেদের আশ্রয়, কিছু জমি পেয়েছিল। সেই মা যেন আজও তাদের বুক দিয়ে আগলে রেখেছে।

—খেতে চল। গম্ভীরভাবে এসে ডাকে কাজলী। সে বলে,—তোমার সব অঙ্ক করে ফেলেছি। এ্যাই দ্যাখো।

খাতাটা দেখে সমীরও খুশি হয়। সে বলে,

—এই তো লক্ষ্মী মেয়ে।

—ছাই! আমি তো অকম্মা রাঙামুলো। চলো মা খাবার নিয়ে বসে আছে।

অফিসে ভোলাবাবু ক'দিন আসেনি। বড়োবাবু রমেশ সেন গর্জায়, বলে,

—আসুক চার্জশিট দেব। আন অথরাইজড অ্যাবসেন্স।

সমীর অনেক কষ্টে ছ'দিনের ছুটি পেয়েছে। বাড়ি যাবে কতদিন পর, কিন্তু ভোলাবাবু না ফিরলে তার ছুটি মঞ্জুর হবে না। সমীর তাই ভোলাবাবুর ফেরার পথ চেয়ে আছে।

কয়েকদিন পর ফিরল ভোলাবাবু। ঘাড়ে একটা মস্ত কাঁঠাল। তার সুবাস ছড়াচ্ছে চারিদিক। রমেশবাবুর টেবিলে কাঁঠালটা রাখতে চাইল। রমেশবাবু বলে,

—অ্যদ্দিন কোথায় ছিলে? না বলে কয়ে ডুব দেবে? চার্জশিট করব।

ভোলাবাবু বলে,—অপরাধ নেবেন না বড়বাবু। কাঁঠালটা পাকছিল না। ভাবলাম গাছপাকা কাঁঠাল খাওয়াব আপনাকে। তাই কদিন অপেক্ষা করলাম। কাল পাকতেই কেটে নিয়ে ভোরের ট্রেনেই চলে এলাম। গাছপাকা রসখাজা কাঁঠাল দেখবেন স্যার। বাগবাজারের রসগোল্লা কোথায় লাগে। কি খুসবু দেখুন!

রমেশবাবু বলে,—দরখাস্ত দাও, তারপর দেখছি কি করা যায়। এ ভাবে ডুব দিলে আর ছুটি হবে না। লাস্ট ওয়ার্নিং দিলাম তোমায়।

অবশ্য ভোলাবাবুকে বেশ কয়েকবারই লাস্ট ওয়ার্নিং দিয়েছেন। তবু ওর বেলায় রমেশবাবু যেন অসহায়। অনেকের মাইনে তবু আটকেছেন, কিন্তু ভোলার নয়।

ভোলাবাবু এবার রোহিণীকে বলে,

—তুই তো কাবি, গান-টান লিখিস, আমার ছুটির দরখাস্তটা লিখে দে।

রোহিণী কবিতা, গান-টান এসব লেখে। রোহিণী বলে,

—কী লিখবো? কাঁঠাল পাকাচ্ছিলে কিলিয়ে বড়বাবুকে খাওয়াবার জন্য, রসখাজা কাঁঠাল? কাঁঠালের ইংরাজি কি রে?

মিছরি বলে,—জ্যাকফ্রুট। লিখে দে, পাঞ্চিং জ্যাকফ্রুট টু রাইপ......

ভোলাবাবুই গর্জে ওঠে,—থাক, থাক, তোদের আর লিখতে হবে না। ভোলা ঘোষও ইংরিজি জানে, তোদের শিখিয়ে দিতে পারে।

ভোলাবাবু এবার কয়েকখানা কাগজ নষ্ট করে দরখাস্ত তৈরি করে দেয়, রমেশবাবুর সহকারী ভূধরবাবুকে।

—নিন ছুটির দরখাস্ত। ভোলা ঘোষও ইংরিজি জানে।

দরখাস্তখানা মিছরিই হাতিয়ে নিয়ে পড়ে,—স্যার, আই অ্যাম দি ওনলি হাসব্যান্ড অফ মাই ওয়াইফ। সি ইজ ভেরী ইল।

মিছরি বলে,—ভোলাদাই বৌদির ওনলি হাজব্যান্ড। তাই তো ভোলাদা........

ভোলাদা এবার খিঁচিয়ে ওঠে,

—খবরদার একদম যা তা বলবি না! আমার বৌকে নিয়ে ইয়ারকি! বড়বাবু শুনুন!

মিছরি বলে,—তুমিই লিখেছো এখানে, আর বললেই দোষ?

রোহিণী বলে,—থাম এবার মিছরি।

সমীর দীর্ঘ সাত মাস পরে গ্রামে আসছে। তখনও দুর্গাপুর ছিল অরণ্যঘেরা একটা ধুমন্ত স্টেশন। এদিকে কিছু খড়ের চালের দোকান। দু'একটা পাকা বাড়ি, ওই হাটতলা—তারপর শুরু হয়েছে বনভূমির।

স্টেশনে নেমে সমীর মাঠ-পার হয়ে আসে দামোদর নদীর ধারে। এখন বিস্তীর্ণ বালুচর। মাঝে হাঁটুভোর জল বয়। তারপর আবার বালিচর ভেঙে এদিকে গ্রামসীমা। বট, আম গাছের নিচে খড়ের চালের দোকান। মুড়ি চপ মণ্ড মেলে। এখান থেকে খোয়াঢালা পথটা গেছে সদর শহর বাঁকুড়ার দিকে। খান দুয়েক লক্কড় মার্কা বাস চলে তাদের মর্জিমত।

বাস না থাকলে হাঁটতে হয় মাইল দশেক পথ। কারণ বাস কখন চলবে, কখন বন্ধ হবে তা কেউ জানে না।

সমীর কলকাতা থেকে ভাইবোনদের জন্য জামাপ্যান্ট, মায়ের জন্য কাপড় এনেছে। তা ছাড়া টুকিটাকি জিনিসে ব্যাগ বোঝাই। এপারে এসে শোনে বাস বন্ধ।

ময়রা মাসি বলে,—কাল থেকে মুখপোড়ারা আসে নি গো! মান্ষের কত কষ্ট বল দিনি। জলটল খেয়ে হাঁটা দাও, আর কী করবে।

মুড়ি আর মণ্ডা দিয়ে জল খেয়ে এবার ওই ব্যাগ ঘাড়ে করে হাঁটতে শুরু করলো সমীর। সঙ্গে আশপাশ গ্রামের দু'চারজনও রয়েছে।

বৈকাল নামছে। সঙ্গীরা যে যার পথ চলে গেছে। সমীর একাই চলেছে। আসুড়ের হাট-তলা পার হতে চোখে পড়ে তাদের গ্রামসীমা। কাছিমের পিঠের মত মাঠগুলো নেমে গেছে আবার উঠেছে দিগন্তে। রুক্ষ তাম্রাভ প্রান্তরের পাশে তাদের গ্রাম। আমবাগান তালবাগান

ঘেরা পুকুরের পাড় দেখা যায়। ওখানেই তাদের গ্রাম। বৈকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামছে। ঘরে ফেরা পাখিদের কলরব ওঠে। পশ্চিম আকাশে শেষ সূর্যের আভা মিলিয়ে আসছে।

সমীর ঘরে ফেরে। মা অবাক হয়, বলে,

—এলি সমীর?

ক্লান্ত সমীর মাকে প্রণাম করে। মা বলে,

—এতখানি পথ ওই বোঝা নিয়ে হেঁটে এলি? বাস ছিল না?

—না। হেঁটেই এলাম। সুবীর মিনাকে দেখছি না?

—খেলছে কোথাও, এসে পড়বে। তুই হাতমুখ ধো বাবা। সন্ধে দিয়েই চা করছি, জলটল খা।

সমীর বোঝে আজ যেন গ্রামে রাতারাতি তার কদর বেড়ে গেছে গ্রামের মানুষের কাছে। সকালেই সমীর ভট্টাচার্য পাড়ায় গেছে নসুদাদের বাড়িতে। নসুদা ওর বাবা-মায়ের জন্যে একটা প্যাকেট পাঠিয়েছে সেটা দিতে গেছে। নসুদার মা বলে,

—কেমন আছে ওরা সব?

—ভালই।

—ভাল তো থাকবেই! ওর জন্যই তো বউ লাফিয়ে কলকাতায় চলে গেল। বুড়ো-বুড়ি বাঁচলো কি মরলো সে খবরও রাখে না!

বাবা বলে,—ভাল থাক তাতেই খুশি। তা ওকে বলিস যেন একবার দেখতে আসে। বয়স হয়েছে, কবে আছি, কবে নেই।

মা বলে,—আমাদের কথা ভুলেই গেছে বোধহয়।

সমীর চুপ করে শোনে। বোঝে নসুদার বাবা মায়ের অভিমানের সঙ্গত কারণ আছে। তারা চায় বৃদ্ধ বয়েসে ছেলের সান্নিধ্য। তাদের অবলম্বন করে বাঁচতে যায়। কিন্তু নসুদার পক্ষে আজ তা সম্ভব নয়। তারও একটা পারিবারিক জীবন আছে। কিন্তু কিছু করার নেই। পল্লীগ্রামে, শুধু গ্রামই বা কেন, সর্বত্র জীবিকার তাগিদে সব সম্পর্কগুলো যেন কেমন ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। সব জেনে বুঝেও মানুষ আজ অসহায়। তাই পরস্পর পরস্পরকে ভুলই বোঝে।

বের হয়ে আসছে সমীর।

ওদিকে শরৎ ভট্টাচার্য তখন দাওয়ায় হুঁকো নিয়ে বসেছে রোদে পিঠ করে। সমীরকে দেখে হাঁক পাড়ে,—সমীর নাকি! কবে আসা হলো?

—কাল!

—শুনলাম ভাল চাকরি পেয়েছে। তা মাইনে কত দিচ্ছে?

সমীর জানে গ্রামের মানুষ সহজভাবেই টাকার কথা বলতে পারে। সমীর বলে,—দিচ্ছে সরকারের গ্রেড মতই। চলি।

এড়িয়ে যায় ওকে সমীর। জানে শরৎ ভটচার্য এরপর নসুদার সম্বন্ধেই বেশ কিছু কথা শোনাবে। লোকটা কারও ভাল দেখতে পারে না।

তার তুলনায় বিভূতিবাবু সম্পূর্ণ অন্য জাতের মানুষ। ওর বাড়ির কাছে এসেছে সমীর। বাইরের মহলে বিভূতিবাবু ওর বসার ঘরে রয়েছেন। অঞ্চলের বেশ কিছু মানুষ আসে তার কাছে নানা কাজের ব্যাপারে। পঞ্চায়েতের কাজ তো আছেই।

সমীর ঢুকে ওকে প্রণাম করতে বিভূতিবাবু চাইলেন।

—এসো, এসো, সমীর। চাকরি ঠিকঠাক চলছে তো?

—হ্যাঁ, সমীর গ্রামের মধ্যে ওই মানুষটির কাছে কৃতজ্ঞ। ওই বিভূতিবাবুই তাদের মত অসহায় পরিবারের পিছনে দাঁড়িয়েছিলেন যেদিন তাদের পাশে কেউ ছিল না।

জেঠিমা চক্রান্ত করে গ্রামের ওই শরৎ ভট্চায, গোবিন্দ মুখুজ্যে অন্য মাতব্বরদের হাত করে তাদের অংশ দিতেই চায়নি। ওরাও বলেছিল সমীরের বাবা আগেই তার সব অংশ তার দাদাকে বিক্রি করে দিয়ে দেশ ছেড়ে গেছিল।

কিন্তু ওই বিভূতিবাবুই সেদিন অসহায়, নবাগত সমীরের হয়ে কঠিন প্রতিবাদ করেছিলেন।

—এসব মিথ্যা। কোন ভিত্তিই নাই এসবে। তাহলে দলিল দেখানো হোক!

জেঠিমা মালতী এর মধ্যে গোবিন্দ মুখুজ্যেকে দিয়ে একখানা জাল দলিল করার ব্যবস্থাও করেছিল। কিন্তু স্বয়ং বিভূতিবাবুকে এর মধ্যে এসে পড়তে দেখে গোবিন্দই জালিয়াতি করতে ভয় পায়। বলে মালতীকে,—এ সব গোলমালে যেও না ঠাকুরণ। জালিয়াতির দায়ে পড়বে।

বিভূতিবাবুর জন্যই সমীররা তাদের পৈতৃক সম্পত্তির অংশ পেয়েছিল। বিভূতিবাবুও সমীরকে নিজে সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন চাকরির ব্যাপারে।

সমীর বলে,—ভালই চলছে।

বিভূতিবাবু বলেন,—সরকারি চাকরি মন দিয়ে কাজ কর আর প্রমোশনের জন্য পরীক্ষাও দাও। তুমি ঠিক পাস করে যাবে।

—চেষ্টা করছি কাকাবাবু।

—ক'দিন আছো তো?

—হ্যাঁ। এক সপ্তাহের ছুটি পেয়েছি। পরে আসবো।

বের হয়ে আসছে সমীর। অনেকেই আজ ওকে চেয়ে দেখে। অপরিচিতের মত এসেছিল সমীর বিদেশ থেকে সব হারিয়ে অনাথ ভাই বোন অসহায় মাকে নিয়ে। সেদিন গ্রামের মানুষ তাদের যেন ঠিক মেনে নিতে পারেনি।

এখন সমীর পায়ের তলে মাটি পেয়েছে।

শিবতলার পরিবেশ তেমনি রয়ে গেছে। ঘন গাছ-গাছালি, জায়গাটা এমনিতে নির্জন। গুলঞ্চ ফুল ফুটেছে—কোন গাছের ডাল বেয়ে উঠেছে মাধবীলতার পুঞ্জ। হলুদ লালচে ফুল ফুটেছে অজস্র।

মন্দিরটার গায়েও কালচে ভাব। ওই বনের ছায়ায় মহাদেব যেন সমাহিত রয়েছে। শ্যামলিকে দেখে চাইল সমীর।

—তুমি!

বিভূতিবাবুর ছোট মেয়ে শ্যামলী। সমীর এখানে এসে সেই দুর্দিনে দেখছিল এই মেয়েটিকে। সদ্য যৌবনের ছোঁয়া ওর দেহে। সমীরের তখন চাকরি নাই। মাথার উপর এত বোঝা। চারিদিকে যেন তার জমাট হতাশার অন্ধকার। সেদিন ওই শ্যামলীই তার কাছে এসেছিল। তার শূন্য মনে এনেছিল বাঁচার এক নতুন আশ্বাস। শ্যামলী বলতো,

—এত ভেঙে পড়ছো কেন সমীরদা। দেখবে পথ ঠিক পাবেই। মন দিয়ে পরীক্ষাটা দাও। আমি বুড়ো শিবের কাছে মানসিক করেছি।

সেদিন অবাক হয়েছিল সমীর—তার জন্যে শ্যামলীর ভাবনা দেখে। চাকরির চিঠি আসতে সমীরও ছুটে গেছিল শ্যামলীর কাছে। সেদিন শ্যামলী খুশি হয়েছিল। বলে,

—বলিনি, পথ একটা হবেই।

আজ শ্যামলী যেন তার জন্যেই অপেক্ষা করছিল এখানে, শ্যামলী বলে,

—কাল সন্ধ্যায় এসেছো মিনা বললো।

সমীর বলে—তোমাদের বাড়ি গেছিলাম বিভূতিকাকাকে প্রণাম করতে, তোমাকে দেখলাম না।

শ্যামলী বলে,—এখানেই তো এসেছি। নাও, বাবার চানজল নাও। বুড়ো শিবের দয়াতেই সব হয়েছে।

সমীর হাসে, শ্যামলী দেখছে ওকে।

—কী হ'ল?

—দেখছি তোমাকে। কলকাতায় ক'মাসেই চেহারাটা বদলেছে। কলকাতাইয়া হয়ে উঠেছো।

—তাই নাকি!

শ্যামলী বলে,—তা চাকরি করছো, না পড়াশোনা লেখার কাজ করছো? বুঝলে চাকরি তো অনেকেই করে। বাঁচার জন্য ওটা করতে হবে। কিন্তু লেখার অভ্যাসটা ছেড়ো না। কলকাতায় রয়েছো—প্রচারের পথও আছে সেখানে। লেখা ছাপারও সুবিধে হবে।

সমীর এখানে এসে মাঝেমাঝে গল্প, কবিতা লিখতো। তার জীবনের ফেলে আসা দিনের কত হারিয়ে যাওয়া স্মৃতি, কত চেনা মুখের ভিড় জমতো। অনেকের না বলা যন্ত্রণা—তাদের কথা যেন বুঝতে পারতো সমীর।

পাঁচগাঁয়ে থাকতে সেখানের লাইব্রেরিতে কত বই পড়েছে। প্রবাসী, ভারতবর্ষ, বসুমতী মাসিক পত্রে কত লেখকের লেখা পড়েছে সেগুলো মনে পড়ে। সেই ময়ূরাক্ষীর বালুচর, হারানো বন্ধুরা তার মনের জগতে বেঁচেছিল।

তাদের কথা—সেই জীবনের স্মৃতির টুকরো নিয়ে দু'চারটে গল্প লিখতো কর্মহীন অলস মধ্যাহ্নে। সমীর ওই লেখার মধ্য দিয়েই যেন তাদের ফিরে পেত। এই কঠিন বর্তমানের বুক থেকে যেন ফিরে যেত সেই অতীতের আনন্দমুখর দিনে।

কাউকে সেই খাতাখানা দেখায়নি। মেজভাই প্রবীরও তো স্কুল বোর্ডিং-এ। ছোট ভাই সুবীর ছোট। মিনা গ্রামের পাঠশালায় পড়ে। মা ভাবতো পড়াশোনাই করছে সমীর।

শ্যামলী আসে প্রভার কাছে। প্রভা সেলাই ফোঁড়াই এর কাজ ভাল জানে। প্রভা তখন বড়জা মালতীর সঙ্গে পৃথক হয়ে গেছে।

ওদিকের ভাল টিনের বাড়িটা মালতীদের, উঠানে ধানের মরাইও রয়েছে। মাঝে একটা প্রাচীর তুলে প্রভাদের তারা মাটির জীর্ণ চালওয়ালা বাড়িটা দিয়ে ওদিকে সরিয়ে দিয়েছে।

প্রভার কাছে আসে শ্যামলী, সমীরের ঘরেও ঢোকে। সেদিন শ্যামলী সমীরের খাতাটাকে আবিষ্কার করে এক নিঃশ্বাসে দু'একটা গল্প পড়ে ফেলে।

শ্যামলী মাধ্যমিক দিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পড়ছে। বাংলা পত্র-পত্রিকা তাদের বাড়িতে আসে। স্কুল লাইব্রেরি থেকে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির গল্প পড়েছে সে।

তাই সমীরের গল্প পড়ে ভাল লাগে তার। তারাশঙ্করবাবুর লেখার সুর যেন এই লেখাতে রয়েছে।

সমীর হাটে গেছিল। ফিরে শ্যামলীকে এখানে দেখে অবাক হয়,—তুমি!

শ্যামলী কৌতূহলী চোখ তুলে বলে,

—লুকিয়ে লুকিয়ে এই সব করা হচ্ছে? নভেল, ছোট গল্প লিখছো?

চমকে ওঠে সমীর,—না। মানে—অ্যাই খাতাখানা দাও! প্লিজ!

শ্যামলী দেখছে ওকে, বলে সে,—

—সমীরদা, তোমার লেখার প্রথম পাঠক কিন্তু আমিই। লেখা চালিয়ে যাও। থেমো না। সত্যি-ভাল লিখেছো তুমি।

সমীর বলে,—সময় কাটে না। তাই লিখি। কাজও নেই।

—এটাকে অকাজ ভেবো না। দেখবে একদিন সবাই চিনবে তোমাকে।

সমীর বলে—ছাড়ো তো, দাও ওটা। আর শোন—

শ্যামলী চাইল, সমীর বলে—এসব কথা কাউকে বলো না।

হাসে শ্যামলী। বলে সে—বলব না এক সর্তে।

—কি।

—তুমি লিখবে আরও পড়াশুনা করবে, দেখবে, ভাববে আর লিখবে।

সেই কথাগুলো আজ সমীরের মনে পড়ে। কলকাতায় গিয়ে কাজ আর দুবেলা ওই টিউশানের পর আর সময় পায় না।

নিজের আফিসের পরীক্ষায় বসার জন্য বাড়িতে বইপত্র এনে পড়ে সমীর, কাজলীও পড়ে তার পড়া। কিন্তু প্রমীলা বৌদি দেখে সমীর যেন নিজের পড়া নিয়েই ব্যস্ত। কাজলীর পিছনে কম সময় দিচ্ছে। তাই বলে সে।

—কিরে কাজলী, সমীর ঠিকমত তোকে পড়াচ্ছে তো?

কাজলীও ক্রমশ সমীরের সান্নিধ্যে এসে এখন তার সদ্যজাগর যৌবন মন দিয়ে ভাবছে এক নতুন ভাবনা। সমীরকে অজানতেই তার ভালো লাগতে শুরু করেছে। এটা তার একান্ত নিজের ব্যাপারই। তাই মায়ের কথায় বলে—কেন, ঠিক পড়ায় তো।

প্রমীলা বলে—ছাই পড়ায়। দেখি তুই পড়ছিস আর ও নিজের পড়া পড়ছে। তোকে পড়ায় কখন?

কাজলী বলে—যেটা না পারি বুঝিয়ে দেয়। পড়তে তো হবে আমাকেই।

প্রমীলা ওর জবাবে ঠিক খুশি হয় না। বরং মেয়ের জবাবেই তার চিন্তা হয়। হঠাৎ কাজলীও যেন সমীরের জন্য বেশি ভাবছে।

সমীরও দেখেছে প্রমীলা বৌদি আগের মত ঠিক খুশি নয়। সমীরও এদের সংসারে কাঁচা বাজারটা করে আনে নিজের খরচায়। নসুদা আপত্তি করেছিল প্রথমে। পরে অবশ্য বৌদিই বলে,

—আনতে চায় ভালোবেসে বাধা দিয়ো না বাপু।

সমীর এখন বুঝতে পারে নিজেই যেন ওদের কাজে জড়িয়ে পড়েছে বেশি করে। লেখার কাজ আর হয়নি। চাকরি পেয়েই খুশি হয়েছে।

শ্যামলী বলে—এখন ভাবো কথাটা। লাখো মানুষ চাকরি করে—কিন্তু তার মধ্যে থেকেও নিজেকে তুলে ধরে ক'জন? এতেই জীবনের সব পাওয়া হয়ে গেল?

সমীর ভাবছে কথাটা।

ছায়া নামে বুড়ো শিবতলায়, ক'টা চড়ুই নিজেদের মধ্যে কলরব করে। দূর দিগন্তপ্রসারী মাঠ কাছিমের পিঠের মত নেমে গেছে। কেউ লাঙল দিচ্ছে।

শান্তগ্রামের জীবনযাত্রা অব্যাহত চলেছে। সমীরের মনে হয় এর বাইরেও একটা জগৎ আছে। সে এই শান্ত জীবনযাত্রা থেকে নির্বাসিত হয়েছে শহরের কর্মব্যস্ত জীবনে। সেখানের ভিড়ে সে হারিয়ে যাবে না। নিজের সত্তাকে সে খুঁজে ফিরবে-সামান্য এইটুকুতেই সে তৃপ্ত হবে না। তাকে অনেক কিছু পেতে হবে। সে বলে,—কথাটা মনে থাকবে শ্যামলী।

সাতটা দিন কোথা দিয়ে কেটে যায়। প্রবীর একদিন হোস্টেল থেকে এসেছিল বাড়িতে। সমীর বলে,—এবার ম্যাট্রিক দিবি, পড়াশোনা করছিস তো ঠিক মত?

প্রবীর এমনিতে একটু বাবু গোছের। তার চাই ভাল জামা প্যান্ট। টিফিনের পয়সাও দরকার। অন্য ছেলেরা বাড়ি থেকে টিন ভর্তি মুড়ি, পাটালি, গুড় এই সব নিয়ে যায়। বাড়ির জিনিস পয়সাও বাঁচে। কিন্তু প্রবীর চায় দোকানের পাউরুটি, চপ এসব খেতে।

প্রভা বলে,—বাড়ি থেকে মুড়ি-গুড় নিয়ে যা। এত পয়সা কোথায় পাবো?

প্রবীর বলে,—ধ্যাৎ। ওসব ভাল লাগে না। আর দাদা, এবার আমি ক্লাশ টেনে উঠেছি। ইংরেজি আর অঙ্ক দুটোর জন্যেই কোচিং-এ ভর্তি হতে হবে। দশ টাকা করে কুড়ি টাকা লাগবে।

প্রভা বলে,—কুড়ি টাকা! সে তো অনেক রে!

প্রবীর বলে,—ভাল মাস্টাররা এর কমে পড়ান না। মাস ছয়েক সময়, পাস তো করতে হবে।

সমীর ভাবছে কথাটা। মাসের খরচা বাদেও কুড়ি টাকা বেশি দিতে হবে কয়েক মাস। পাস ফেলের প্রশ্ন রয়েছে। একটা বছর আবার নষ্ট হবে। সব দিক ভেবে সমীর বলে,

—তাই হবে। প্রাইভেট টিউশনিতে তুই ভর্তি হয়ে যা।

প্রভা বলে,—এতগুলো টাকা!

—তবু যেমন করে হোক দিতে হবে মা।

অবশ্য তাদের পাশের গ্রামের মাইনর স্কুলে এবার এক এক ক্লাস করে বাড়াচ্ছে। দুতিন বছরের মধ্যে ওটা হাইস্কুল হয়ে যাবে। সুবীরকে বোর্ডিং-এ পাঠাতে হবে না। ঘরের খেয়েই পড়তে পারবে সে। প্রবীর ম্যাট্রিক পাস করে কোথাও কোন চাকরি পেলে সংসারের সুরাহা হবে।

মিনাও বড় হচ্ছে। বাবার সামান্য টাকা মা ব্যাঙ্ক-এ রেখেছে। ওটাতে হাত দিতে চায় না সমীর। প্রভা বলে,—মেয়ের বাড়! ওর জন্যে তো কিছু রাখতে হবে। বিয়ে থা দিতে হবে।

জমির আয়ে সংসারের চাল, আর কিছু হয়। কিন্তু অন্য খরচা তো আছে। মাটির বাড়ি। এখন জরাজীর্ণ অবস্থা।

বৈশাখ মাস। এখন এখানে দাবদাহ চলছে। রুক্ষ প্রান্তরে লেলিহান শিখায় যেন আগুনের আভা ওঠে। এর মধ্যে পশ্চিম আকাশ মাঝে মাঝে কালো মেঘে ঢেকে যায়। চারিদিকে নামে একটা স্তব্ধতা। সব কেমন চুপচাপ।

এরপরেই পশ্চিম আকাশে হঠাৎ লাল আভা জাগে। কালো মেঘের রঙ হয়ে ওঠে লালাভ। গ্রামে সাড়া পড়ে যায়। মাটির ঘর, খড়ের ছাউনিই বেশি। উনোনে আগুন থাকে অনেকের। এবার সেই আগুন নিভিয়ে সেই উনোনে বড় মাটির পাত্র উপুড় করে দেয়, যাতে আগুনের ফিনকি না ওঠে। কালবৈশাখী আসছে। লাল ধুলো ওঠা প্রচণ্ড ঝড়। গাছগুলোর ঝুটি ধরে কোন দৈত্য যেন নাড়া দিচ্ছে। এবার ধুলোর রাশ ওঠা ঝড় এসে হানা দেয় জনপদে। কার ঘরের খড়গুলো আকাশে উড়ছে, কার ফলন্ত পেঁপে গাছ ছিটকে পড়লো—সারা গ্রামে শুরু হয় তাণ্ডব।

প্রভা ঘরের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে ইষ্টনাম জপছে। ছোট্ট মিনা আতঙ্কে বিড়বিড় করে, আমাদের ঘর উড়িয়ে নিও না ঠাকুর। সমীরও দেখছে ঝড়ের মুখে এদের অসহায় অবস্থা। এক একটা দমকা বাতাসের দাপট আছড়ে পড়ছে ঘরের চালে। যেন সব শুদ্ধু তুলে নিয়ে যাবে। তাদের আশ্রয়টুকুও চলে যাবে।

ঝড় থামার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি। তুমুল বৃষ্টি। আকাশ ভেঙে যেন বৃষ্টি নেমেছে। বৃষ্টির যবনিকায় চারিদিক আচ্ছন্ন। এর মাঝে সুবীরের পাত্তা নেই।

প্রভা বলে,—সেই বাঁদরটা গেল কোথায়? ওই-ই আমার হাড়-মাস ভাজা ভাজা করে দিল। এই ঝড়ে রইলো কোথায়?

সমীর বলে,—কোনও বন্ধুর বাড়িতে আটকে পড়েছে। ঝড় থামলেই আসবে।

প্রভা বলে,—ওকে তুই চিনলি না।

বৃষ্টি নেমেছে। তাদের ঘরের জীর্ণ চালের কিছু অংশ ঝড়ের তোড়ে উড়ে গেছে। সেই জায়গা দিয়ে বৃষ্টির জল পড়ছে। মাটির দাওয়া ফোঁটাফোঁটা বৃষ্টির জলে কাদা কাদা হয়ে যায়। মিনা দু'একটা জায়গায় থালা বাটি পেতেছে যাতে দাওয়ায় বৃষ্টি পড়ে দাওয়া প্যাচ প্যাচে না হয়ে যায়। কিন্তু তাতেও বাধা মানে না।

প্রভা তার জিনিস এদিক ওদিক করছে। সমীর বুঝেছে তার মা-ভাই-বোন কী করে রয়েছে এই জীর্ণ ঘরে। এই ভাবেই প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে বাঁচতে হয় ওদের। সমীর বলে,—এবার ঘরটা না ছাইলেই নয়।

প্রভা বলে,—ভূষণ ঘরামিকে ডেকেছিলাম। দু'কাহন খড়, দড়ি, বাতা এ সব লাগবে। তার ওপর মজুরী, তিনশো টাকার ধাক্কা!

—কিন্তু এই বর্ষার আগে কিছু না করলে ঘরটাই পড়ে যাবে মা।

সমীরের কথায় প্রভা বলে,—কিন্তু কি করা যাবে বল?

সমীর বলে,—আমার জমানো শ'দুয়েক টাকা আছে। আর ধান বিক্রি করো কিছু। তবু শান্তিতে থাকতে পারবে। না হলে তো বিপদ হয়ে যাবে মা। কালই ভূষণকে ডেকে ব্যবস্থা করে যাবো।

এমন সময় বৃষ্টিতে ভিজে সুবীর একটা বস্তা ঘাড়ে করে কি এনে দাওয়ায় নামায়। বাগানের অংশ অবশ্য তাদেরও আছে। ঝড়ের সময় আম পড়লে যে পাবে তার।

তাই অন্যদের সঙ্গে সুবীরও দৌড়েছিল আমবাগানে। এই ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে কিছু আম কুড়িয়ে এনেছে।

—দ্যাখো মা—কত আম।

প্রভা মুখিয়েছিল। এতক্ষণ ধরে সে ছেলের জন্যে ভেবেছে আর ছেলে কিনা বাগানে গেছে এই ঝড়ে আম কুড়োতে। জীর্ণ প্রাচীন গাছগুলো। ডালও ভেঙে পড়তে পারে।

সেবার দত্তদের ফটিক ডাল চাপা পড়ে কোন মতে হাসপাতালে গিয়ে বেঁচে আসে। তার একটা পা চিরদিনের জন্যে ল্যাংড়া হয়ে গেছে। প্রভা সুবীরের চুলের মুঠি ধরে কয়েক ঘা বসিয়ে দিয়ে গর্জায়,—এই ঝড়ের সময়ে বাগানে গেছিলি? ডাল চাপা পড়লে কী হতো? হারামজাদা বাঁদর!

সমীরই ছাড়িয়ে দেয়।

—আর যাস্‌নে, মা ভাবছিল।

সুবীর বলে,—এত এত আম সবাই কুড়িয়ে নিয়ে গেল। ভবাদাও এসেছে। ও আমার আম কাড়তে এসেছিল। বলে তোদের বাগান নয়। দিয়েছি এক কিল।

অবশ্য কিলটা জোরেই পড়েছিল সমীরের জ্যাঠার ছোট ছেলে দেবেনের নাকে। তাই এবার পাঁচিলের ওদিক থেকে জ্যাঠাইমা আর তার মেয়ে করালীদির গলা সপ্তমে ওঠে।

—এমনি করে তোকে মারলো রে ভবা! ওই বাঁদর সুবীরের নাকটা তুই ভাঙতে পারলি না?

করালী গলা সপ্তমে চড়িয়ে প্রভাকে শুনিয়ে বলে,—উড়ে এসে জুড়ে বসেছে। বুকে বসে দাড়ি ওপড়াচ্ছে। সব কিছু দখল নেবে? সর্বনাশী।

প্রভা চুপ করে শোনে। সমীর বলে সুবীরকে,

—মারপিট করতে গেলি কেন?

সুবীর বলে,—ভবা বলেছিল তোদের বাগান নয়, ঢুকবি না। ওর বাগান? এখন থেকে ওই শিশুদের মনেও যেন ঝগড়ার বীজ বুনে চলেছে জেঠিমা।

প্রভা বলে,—পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া করবে ওরা। কেমন শত্রুপুরীতে বাস করছি দেখ।

সমীরের করার কিছুই নেই। জেঠিমার মনে জ্বালা তো হবেই। তাদের কাছ থেকে সম্পত্তির ভাগ নিয়েছে, এটা তারা সইতে পারছে না এখনও।

কিন্তু বড়দা রমেন এ সবে নেই। জেঠিমার বড় ছেলে রমেনদা সমীরের সঙ্গে কথাও বলে। ওর স্ত্রী পারুলবৌদি শাশুড়িকে লুকিয়ে এ বাড়িতে প্রভার কাছে আসে।

মায়ের স্বভাবই এমনি কাকিমা।

সমীরও বৌদিকে শ্রদ্ধা করে। এই বৌদি মাকে জেঠিমার অন্যায় জুলুম থেকে বাঁচিয়েছে। করালীদি আর জেঠিমা অবশ্য তার জন্যে পারুলবৌদিকে কথা শোনাতে ছাড়েনি।

রমেনদা কাজকর্ম তেমন কিছুই করে না। তখনকার দিনে গ্রামে সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থের অনেক ছেলের অভিভাবক তাদের নামমাত্র স্কুলে পাঠাতেন। সেও মাইনর স্কুলে। হাইস্কুল তখন এত ছিল না। ওই বিদ্যের পর তারা জায়গা-জমি দেখভাল করতো। কিছু মধ্যস্বত্বের ধান পেত। সংসারের প্রয়োজনও তখন কম ছিল। চাহিদাও ছিল সামান্য। তাই জমিজমা দেখে গ্রামের মাতব্বরী করে না হয় যাত্রাপালা করে দিন কাটাতো।

রমেনদাও গ্রামের রাখাল ছেলেদের নিয়ে কেষ্টযাত্রার দল খুলেছে। এতে খরচ কম। আর আসরও পাওয়া যায় অনেক। অবশ্য আশপাশের গ্রামে এরকম কেষ্টপালার দল আছে। জগন্নাথপুরের কেষ্ট যাত্রা দলের 'মানভঞ্জন' পালা নাকি খুবই জমাটি। তারা ওই পালার জন্যে বায়নাও পায় অনেক।

সেদিন রমেনদা বলে সমীরকে,—সমীর একটা কাজ করে দিবি?

সমীর ওই আপনভোলা লোকটিকে ভালবাসে। মায়ের কথায় ও কোনদিন এদের সঙ্গে ঝগড়া করেনি। বরং মাকে বোঝাতে গিয়ে নিজে আর পারুলবৌদি জেঠিমার বাক্যবাণে বিদ্ধ হয়েছে,—অকম্মা! বামুনের ঘরের এঁড়ে! একটা পয়সা রোজগারের মুরোদ নেই! জমিজায়গা গেলে খাবি কী? নিজের ভাল বুঝিস না! আপনি পায় না, শঙ্করাকে ডাক!

তার তুলনায় ছোটভাই দেবেন অনেক হিসেবি। সে বলে,—এক ছটাক ধান দেব না ওই সমীরদের। আদালতে বুঝে নিক!

রমেন চুপ করেই থাকে। সে যে সত্যি অসহায় এটা বোঝে সে।

রমেনদার কথায় সমীর বলে,—কি কাজ করতে হবে?

রমেনদা বলে,—আজ বেনেদের লক্ষ্মীমেলায় জগন্নাথপুর দলের 'মানভঞ্জন' পালা হবে। ওদের পালাটা তুই শুনে শুনে লিখে দিতে পারবি? ওরা কিছুতেই দেবে না। কুড়ি টাকা দিতে চেয়েছিলাম।

আসরে অবশ্য পালাগান গায় অনেক সময় নিজেই। সংলাপ বেশি নাই, সবই গান আর সেগুলো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গায়, কপি করা খুব অসুবিধের কাজ নয়। একটু দ্রুত লিখতে পারলেই হবে। তবু সমীর বলে,—এটা কি ঠিক হবে?

রমেন বলে,—ওরা আমাদের মাথুরের সাট চুরি করেছে। তার জবাব দিতে হবে। তুই একটু করে দে। তোকেই কুড়ি টাকা দেব।

সমীর বলে,—টাকা লাগবে না। তোমরা আসরের পাশেই একটা ঘরে আমার বসার জায়গা করে দিও। ওরা যেন আমাকে দেখতে না পায়।

রমেন বলে,—ও হয়ে যাবে।

গ্রামের মধ্যে বেনেদের ওখানে মাঝে মাঝে গান, পালাগান হয়। গ্রামের লোকজন ভেঙে পড়ে আসরে।

হেসাকের আলো জ্বলছে। তার মাঝেই পালা শুরু হয়। আর এদিকের ঘরে সমীরও তার কাজ শুরু করে। রমেন মাঝে মাঝে এসে দেখে যায় সমীরের কাজ। দেখে খুশি হয়, বলে,—চালিয়ে যা! ব্যাটাদের মুখের মত জবাব দেব এবার!

কেষ্টযাত্রা শেষ হয়। জগন্নাথপুরের দল ওদের এসেট পত্র নিয়ে বিদায়ী টাকা বুঝে নিয়ে গরুর গাড়িতে করে চলে গেল। তারপর রমেনদা ঘোষণা করে—এবার আমরাই ওই পালা করবো।

কেষ্ট লোহার দলের ম্যানেজার। সে বলে—শালাদের পালার সাট কোথায় পাবে ঠাকুর? যা জমাটি পালা—মোটন বুকে করে রাখে ওই সাট।

এবার রমেন বিজয়ীর মত বলে।—অ্যাই দ্যাখ। ওদের পুরো পালার সাট আমার হাতে। এবার ওদের সব আসর আমাদের।

এরাও খুশি। তবে কীভাবে সংগৃহীত হলো ওই সাট সেটা জানায়নি রমেনদা সমীরের অনুরোধেই। তবু রমেনদা বলে—তোর জন্যেই এ সব হয়েছে রে! এবার এলে তোকে আমাদের পালা দেখাবো।

রমেন যেন আজ রাজ্য জয় করেছে। এবার ধান বিক্রি করে রাধা কেষ্টর নতুন পোশাক মায় মুরলী অবধি কিনে এনে জোর মহড়া শুরু করে। আর এর মধ্যে চারিদিকে রটে গেছে রমেনবাবুরা নতুন পালার 'সাট'ও পেয়ে গেছে।

ওদের জগৎ আলাদা। গ্রামের সামান্য চাওয়া পাওয়ার ছোট্ট পরিসীমার মধ্যেই দিন কাটায় ওরা এই পরিবেশে. সমীরের জগৎ এখন এদের থেকে স্বতন্ত্র। এই শান্ত সবুজ পরিবেশে মহুয়া ফুল ফোটা জগতে তার ঠাঁই নাই। তার জগতে শাল বন, লাল মাটি নেই। নেই পাখিদের কলরব, সবুজ দিগন্তপ্রসারী ধানের ক্ষেত। এখানে তার অন্ন নেই, তাকে বের হতে হয়েছে এই শান্ত সবুজ জগৎ থেকে সেই ইট কাঠ কংক্রিটের জগতে।

ক'টা দিন কোন দিক দিয়ে কেটে গেল বুঝতে পারে না সমীর। বাড়ির ছাউনির কাজ শুরু হয়েছে। এখন জীর্ণ খড়ের চাল ঝেড়ে ফেলে নতুন খড় দিয়ে নীচে পচা বাখারি বদলে মজবুত করে ছাউনি করেছে। বহুদিন ধরেই ওই ঘরটা ছাওয়া হয়নি। মালতীরা নতুন টিনের বাড়িতে যাবার পর ওটা পড়েই ছিল।

এতদিন পর আবার খড়ের ছাউনি দিয়ে মজবুত করে সাজাতে ওর রূপ বদলে যায়। মিনাও এবার নিশ্চিন্ত হয়। সব দেখে সুবীরকে বলে—ঝড়ে আর আমাদের ঘর উড়বে না রে ছোড়দা।

সুবীর বলে না-না।

—বৃষ্টির জলও আর দাওয়ায়, ঘরে পড়বে না।

—না, একেবারে নতুন হয়ে গেছে। সুবীর বলে।

প্রাচীরের ওদিকে মালতী করালীও দেখেছে ব্যাপারটা। ঝড় বৃষ্টির সময় এদের দুর্ভোগ দেখেছে আর তারা খুশি হয়েছে। আজ তারা গর্জায়,—হেই পবনদেব, ঝড়ে এদের সবকিছু উড়িয়ে নিয়ে যেও ঠাকুর। ভিটে মাটি উড়ে পুড়ে যাক। আমার সর্বস্ব কেড়ে নিয়েছে ওই মুখপুড়ি।

এখন ওই নতুন ছাউনকরা ঘরটা দেখে বলে,

—অ করালী, ইযে নতুন করে ছাউনি দিলে রে!

করালী বলে—এবার ছেলের চাকরি হয়েছে, খড়ের ঘর কি গো, কোঠা বালাখানা বানাবে।

মালতী ফুঁসে ওঠে,—থাক। বলে না,—

ছেলের চাকরি প্যাদাগিরি, তাই রেখেছে মোচ,
সেই গরবে মায়ের গরব ঘরে দেয় না ছোঁচ।

প্রভা শোনে কথাটা। তাদের শুনিয়েই বলেছে মালতী। প্রভা বলে,—শুনছিস সমীর? ঘরটা ছাইবারও উপায় নেই।

সমীর বলে,—ছাড়ো ওদের কথা।

ও সুটকেশ গোচ্ছাচ্ছে, মা দোকানে গেছে, শ্যামলীকে আসতে দেখে চাইল।

শ্যামলী বলে,—সুটকেশ গোছাচ্ছো যে।
সমীর শোনায়—বন্দরের কাল হল শেষ, এবার তো ফিরতে হবে শ্যামলী।
শ্যামলী চুপ করে থাকে। কদিন তার সময়টাও ভালই কেটেছে।
সমীর বলে,—গ্রামের শান্ত জীবনে আমাদের ঠাঁই নেই শ্যামলী। শুধু দৌড়তে হবে কিসের পিছনে জানি না।
শ্যামলী বলে,—তাই। মানুষকে চলতে হবেই। থামা মানে মৃত্যু। ভাবছ গ্রামের মানুষ শান্তিতে আছে, মোটেই তা নয়। এদের আর কিছু করার নেই তাই এখানে আটকে আছে। তোমাকে অনেক কিছু করতে হবে সমীরদা, থামবে না।
সমীর দেখছে শ্যামলীকে। এখানে একজন প্রকৃত বন্ধুকে সে পেয়েছে।
সমীর বলে,—মাধ্যমিক দিয়ে কলেজে যাবে তো?
শ্যামলীর মা চান মেয়ের বিয়ে থা দিতে। ডাক্তার ছেলে শহরে থাকে তাদের মত করে। মা চান নিজে দেখে শুনে ভালো ছেলের হাতে শ্যামলীকে তুলে দেবে। কথাটা মা বাবাকে বলেছে। শ্যামলীর কানে এসেছে।
শ্যামলী সমীরকে বলে,—পাস করি। তারপর বাবা মা কি করে দেখা যাবে।
সমীর চুপ করে শোনে মাত্র। তার এ ব্যাপারে বলার কিছুই নেই। সে শুধু আশা করেছিল মাত্র শ্যামলী কলকাতায় মেয়েদের কলেজে পড়তে যাবে, কিন্তু সে সব স্বপ্নই।
শ্যামলী আরও কিছু যেন বলতে চায় তার নীরব চাহনি দিয়ে। সে ভাষা যেন সমীর বুঝতে পারে না। কেমন রহস্যই থেকে যায়।
চলে আসছে সমীর, শ্যামলীও এসেছে। মাকে প্রণাম করে, সুবীর, মীনাও রয়েছে। শ্যামলী বলে,
—গিয়ে চিঠি দিও—কাকিমা ভাবে।
সুবীর সুটকেশটা নিয়ে এগিয়েছে। মা চেয়ে থাকে। পথের আড়ালে আর দেখা যায় না।
লালমাটির পায়ে চলা পথ, কটা মহুয়া গাছের জটলা। ফুলগুলো এখন ঘুমন্ত। ওদের ঘুম ভাঙবে রাতে। তখন সমীর বহু দূরে। গ্রামের তাল গাছগুলো আর দেখা যায় না। তার গ্রাম হারিয়ে গেছে। সমীর বাস রাস্তার দিকে চলেছে। তার সামনে এখন নতুন দিগন্ত।
কাজলী পরীক্ষা দিচ্ছে। সমীর কিছুদিন নিজের পরীক্ষার পড়া পড়েও কাজলীকে মন দিয়েই পড়িয়েছে। সমীর অবাক হয়! বেয়াড়া মেয়েটা এখন শান্ত হয়েই পড়াশোনা করে। কেমন যেন বদলে গেছে।
সমীর অফিস থেকে বেরিয়ে এক এক দিন বন্ধুদের সঙ্গে দলবেঁধে সিনেমা দেখতে যায়। মেট্রো, লাইট হাউজ পাড়ায় তখনও সাহেবদের ভিড় কিছু আছে।
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়েছে। হিটলার তখন সারা ইউরোপে ঝড় তুলেছে। পোল্যান্ড দখল করেছে। ওরা এখন নজর দিয়েছে ফ্রান্স বেলজিয়ামের দিকে। এবার ইংরেজও তৈরি হচ্ছে। আমেরিকাও বসে নেই। কলকাতার কাগজে তখন যুদ্ধের খবর। পাড়ার চায়ের দোকানে তখন জোর আলোচনা শুরু হয়েছে। কেউ জার্মানদের রণ কৌশলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কেউ তাকে নস্যাৎ করে দিয়ে বলে,

—ইংরেজদের চেনো না। ওস্তাদের মার শেষ রাতে। যখন গুছিয়ে প্যাঁদাবে তখন জার্মানরা পালাতে পথ পাবে না।

দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মাঝে কেমন একটা বেসুর বাজছে। ভারত-বাংলার বুকে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ঢেউ তখনও মুছে যায়নি। মেদিনীপুরের মানুষ ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে লড়ছে। তারপরই এলো সর্বগ্রাসী বন্যা, প্রাকৃতিক বিপর্যয়।.

ওদিকে মহাযুদ্ধের ছায়া ঘনিয়ে আসছে। ভারতের বুকে, কলকাতায়—পশ্চিমবাংলায় পানাগড়, পাণ্ডবেশ্বর—নানা জায়গায় গড়ে উঠেছে এয়ার বেস। হাজার হাজার মানুষ কাজ করছে। আর এসেছে আমেরিকা থেকে লাল মুখোর দল। ব্রিটিশরাও পাঠিয়েছে টমিদের।

ওদিকে ইউরোপের যুদ্ধ এবার এশিয়াতেও ছড়িয়েছে। জাপান যুদ্ধ ঘোষণা করেছে আমেরিকার বিরুদ্ধে। পার্ল হারবারের উপর কঠিন আঘাত হেনে এবার তারা সিঙ্গাপুর হয়ে বার্মার দিকে এগোচ্ছে।

ইংরেজ সরকারও বুঝেছে তাদের বিপদ শুধু ইউরোপেই নয়—ভারতেও। গান্ধীজীর কুইট ইন্ডিয়া আন্দোলন ব্যর্থ করলেও এবার জাপানীরা প্ল্যান করেছে তারা ভারতে আসবে।

কলকাতার রূপ বদলাচ্ছে। ইংরেজ বুঝেছে ভারতের মানুষ, বাংলার মানুষ তাদের আর চায় না। দুশো বছরের প্রতিষ্ঠা তাদের ধূলিসাৎ হতে চলেছে। কিন্তু তা তারা হতে দেবে না।

তারা এবার বাংলার মানুষকে শিক্ষা দেবার জন্য সব খাদ্য নিজেরাই আটকে রেখে বাংলার মানুষকে অনাহারে ঠেলে দিতে চায়। রাতারাতি সব খাদ্যশস্য কোথায় যেন গায়েব হয়ে গেল।

চালের দরও বাড়ছে হু হু করে। গ্রামবাংলাতেও ধান, চাল আর নেই। যুদ্ধের যন্ত্রণার চেয়ে মন্বন্তরের হাহাকারই প্রকট হয়ে দাঁড়িয়েছে বাংলায়।

তবু প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা থেমে নেই। শহরে আর্ত ক্ষুধার্ত মানুষের হাহাকার কেউ কানে শোনে না। মহানগরের চৌরঙ্গী এলাকায় বিদেশীদের ভিড় আর আলোর রোশনাই।

সমীর এই দিনগুলো দেখে। কাজলীর পরীক্ষা চলছে, এর মধ্যে সমীরের বিভাগীয় পরীক্ষার দিন এসে যায়। সমীর জানে এই পরীক্ষায় তাকে পাস করতে হবে। জীবনে সে পিছনে পড়ে থাকতে চায় না। তাকে এগিয়ে চলতেই হবে।

কাজলীর পরীক্ষা হয়ে গেছে। বলে সে-এবার ছুটি। নসু ভটচার্য বলে—দিন কতক দেশের বাড়িতেই যা।

প্রমীলা দেশে যেতে চায় না। সে বলে—তোমার বাবা-মা দিনরাত টিক টিক করে। তারপর গ্রামে আলো নেই। পথঘাটও নাই। হাটবাজারও ভিন গাঁয়ে। পোস্ত আর ঝিংগা খেতে হবে।

নসু বলে,—ওই খেয়ে আর ওখানে থেকেই তো মানুষ হয়েছি।

প্রমীলা বলে,—যা হয়েছো তা তো দেখছি!

কাজলী সেদিন বলে সমীরকে,—চলো না কোথাও ঘুরে আসি। দক্ষিণেশ্বর দেখিনি—বিরাট মন্দির, চলো না।

প্রমীলাও এবার কথাটা ভাবছে. বাজারদর বাড়ছে। আগে ওই মাইনেতে নসুর সংসার

ভালোই চলতো, কিন্তু বাজারে যেন আগুন লেগেছে। ওদিকে মেয়েও বড় হচ্ছে, তার বিয়ের খরচা আছে। ভাবনায় পড়ে এবার।

প্রমীলা দেখেছে সমীর আসার পর কাজলীও কেমন বদলে গেছে। মেয়েটা অনেক শান্ত হয়েছে। আরও দেখে প্রমীলা কাজলী আগে কোন কাজই করতো না।

এখন সমীরের জন্যে চা করে, মাঝে মাঝে দু'একটা রান্নাও করে। সমীর দেরি করে ফিরলে বলে,

—কোথায় ছিলে এতক্ষণ!

সেদিন বৃষ্টিতে ভিজে বাড়ি ফিরেছে সমীর। কাজলী তোয়ালে এগিয়ে বলে,—জামা কাপড় ছেড়ে মাথা মুছে ফেল। জ্বর বাধালে কে দেখবে?

সমীর বলে,—ট্রাম থেকে নামতেই বৃষ্টিটা নামলো।

—কোথায় গেছিলে? বন্ধুদের সঙ্গে সিনেমায়? এত সিনেমা দেখা আর বন্ধুদের সঙ্গে মেশা কিন্তু ভাল নয়।

সমীর চুপ করে থাকে।

প্রমীলা সবই দেখে।

এবার সে-ই ভাবছে কথাটা। সমীর তাদের পাল্টিঘর। তবে এক গ্রামেরই ছেলে। সরকারি চাকরি করছে, লেখাপড়ায় ভাল। কি সব পরীক্ষা দিয়েছে।

নসু বলে,—পাস ও করবেই। পাস করলে মোটা মাইনে পাবে। পাকা চাকরি। আমাদের মত শেঠজীর দয়ায় থাকতে হবে না।

প্রমীলা নিজে যে কথাটা ভেবেছে তা নসুকে এখনও বলেনি। সে দেখেছে কলকাতায় এখন ছেলেমেয়েরা অনেকেই নিজেরাই পছন্দ করে বিয়ে থা করছে। কাজলীর সঙ্গে সমীরের বিয়ে হলে ভালোই হবে। এমন একটা সুপাত্র অনায়াসে বিনা খর্চাতেই পাবে সে, তাদেরও শেষ বয়সে একটা নির্ভর হবে।

তাই প্রমীলাও কাজলীর এসব ব্যবহারকে নীরবে সমর্থন করে। কাজলীর বেড়াতে যাওয়ার কথায় সমীর বলে,

বৌদি—আপনিও চলুন। দক্ষিণেশ্বর গেলে আপনারও ভাল লাগবে।

প্রমীলা বলে,—আমার বাতের শরীর। ট্রেনে বাসে গেলে আমার শরীর টাটিয়ে যাবে। তোমরাই ঘুরে এসো।

কাজলী বলে,—মায়ের কথা ছাড়োতো। চলো।

সমীর একজন যুবতী মেয়ের সঙ্গে এই প্রথম বের হয়েছে। শিয়ালদহ থেকে ট্রেনে দক্ষিণেশ্বর নেমে ওরা মন্দিরে এসেছে। কাজলী বলে,—ও দিকে গঙ্গার ধারে চলো। ঘাসে বসা যাবে।

সমীর একটু ইতস্তত বোধ করে। কাজলী বলে.—কী হল? গাইয়ার মত এদিক ওদিক চাইছো যে! অ্যাই বাদামওয়ালা!

নিজেই চিনে বাদাম কিনে জমিয়ে ঘাসে বসে সমীরের গা ঘেঁসে। ওর নরম দেহের স্পর্শ যেন সমীরের মনে কি একটা সাড়া আনে।

কাজলী বলে—তুমি একেবারে হাঁদারাম!

—কেন? সমীর চাইল।

—দক্ষিণেশ্বর না বললে মা আমাকে আসতে দিত না। ভাবলাম বাড়ি থেকে বেরিয়ে মেট্রোয় গিয়ে একটা ইংরেজি সিনেমা দেখবো। তা না উনি নিয়ে এলেন এখানে!

সমীর বলে,—কেন, দক্ষিণেশ্বর তো সুন্দর জায়গা। পবিত্র স্থান। ওই পঞ্চবটি বন, বিশাল বটগাছ। এখানেই তপস্যা করেছিলেন রামকৃষ্ণদেব। ওদিকে গঙ্গা, অস্ত যাচ্ছে সূর্য, তার লাল আভা পড়েছে নদীর বুকে।

কাজলী বলে ওঠে,—অ্যাই তুমি কবিতা টবিতা লেখ নাকি!

—কেন?

—ও সব আদিখ্যেতা, ওই কাব্য কবিতা যারা লেখে তাদের একদম বিশ্বাস নেই। জানো, তারা অনেকেই লোক সুবিধের নয়। ওসব আমি পছন্দ করি না। যত্ত সব ন্যাকামো!

সমীর অবাক হয়ে দেখে কাজলীকে। কাজলী ওর হাতটা তুলে নেয় নিজের হাতে। সমীর সরে বসার চেষ্টা করে। কাজলী বলে,—কত মাইনে পাও তুমি? আর প্রমোশন হলে কত টাকা পাবে?

সমীর অবাক হয় কাজলীর কথায়। মনে পড়ে শ্যামলীকে। শান্ত নম্র একটি মেয়ে। কোন দিন এভাবে তার সঙ্গে কথা বলেনি। কবিতা লেখার ব্যাপারে কাজলীর কথাগুলো তার কাছে বিশ্রী লাগে। কাজলী তাড়া লাগায়,—কী হল? জবাব দিচ্ছ না যে? সব টাকাই বুঝি বাড়িতে পাঠাও? বাবাও আগে তাই করতো। মা এসে বাসা করতে তবে থামালো বাবা। আরে বাবা! নিজে খাটবে রোজগার করবে এত কষ্ট করে, নিজে ভোগ করবে না! সব দেশে ভূতভোজনে পাঠাতে হবে?

কথাগুলো সমীরের ভাল লাগে না। কাজলী যেন একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এই সব কথা বলছে। ওদিকে আরতি শুরু হয়েছে। এদিক ওদিকে বসে থাকা লোকজন মন্দিরে আরতি দেখতে যাচ্ছে। এ দিকটা ফাঁকা হয়ে আসে।

সমীর বলে,—চলো মন্দিরে আরতি দেখতে যাবে না?

কাজলীর ওদিকে বিশেষ আগ্রহ নেই। এদিকটা এখন অপেক্ষাকৃত জনহীন হয়ে আসছে। গাছের ফাঁক দিয়ে আকাশ দেখা যায়। সামনে গঙ্গার বিস্তার। পাখিদের কলরব ওঠে। লোকজন সব মন্দিরে।

কাজলী বলে,—বসো তো। এতক্ষণ চারিদিকে লোকজন কলকল করছিল, এখন একটু শান্তিতে দুজনে বসা যাবে।

সমীর ওর কথায় চাইলো। এদিক ওদিক চেয়ে কাজলী এবার হঠাৎ ওর কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ে বলে,—বসে বসে হাত পা ব্যথা করছিল। অ্যাই, মাথা ধরে গেছে, কপালটা একটু টিপে দাও তো।

নিজেই সমীরের হাতটা ধরে ওর কপালে রাখে। এই নির্জন পরিবেশে কাজলী যেন বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। সমীরের কোলে সহজেই মাথা রেখে শুয়ে পড়ে। ওর উন্নত বুকও কিছুটা অনাবৃত।

সমীর বলে,—ওঠো, সাতটা বাইশের ট্রেন মিস করলে সেই নটার আগে আর ফেরার ট্রেন পাবো না।

কোন মতে যেন ঠেলেই কাজলীকে উঠিয়ে দিয়ে নিজে উঠে দাঁড়ালো। বেশ বুঝেছে এখানে থাকা নিরাপদ হবে না। সমীর কাজলীর ডাকে মন থেকে সাড়া দিতে পারে না।

কাজলী ওকে দেখছে, মন্দিরে আরতির ঘণ্টা বাজছে।

সমীর এগিয়ে চলে, পিছনে চলেছে কাজলী। সে যেন বেশ ক্ষুব্ধই। মুখে সেটা কিছু না বললেও তার চালচলনে সেটা ফুটে ওঠে।

প্রমীলা ওদের ফেরার পথ চেয়েছিল। ওদের ফিরতে দেখে শুধোয়,

—কেমন বেড়ানো হল রে কাজলী?

—কাজলী বলে,—হলো, মা, খিদে পেয়েছে, হাতমুখ ধুয়ে আসছি। খেতে দাও তো বাপু।

ওদিকে ঘরের মধ্যে চলে গেল সে। প্রমীলা যেন মেয়ের কথায় কিছুটা হতাশই হয়। হয়তো সে ভেবেছিল দুজনে কোন দামী রেস্তোরাঁয় খেয়েই আসবে। কিন্তু সে সব হয়নি এটা বুঝতে পারে সে।

সমীরকে বলে প্রমীলা,

—তুমি, জামা-কাপড় বদলে হাতমুখ ধুয়ে নাও সমীর।

এ বাড়ির ছাদটা তবু কিছুটা ফাঁকা। অবশ্য আশেপাশে তিনচার তলা বাড়ির আড়াল রয়েছে। তবু ওরই ফাঁক দিয়ে এক ফালি রোদ, একটু বাতাস আসে। এদিকে একটা নিম গাছ এত প্রতিকূলতার মধ্যেই কিছুটা সবুজের আভা নিয়ে বেঁচে আছে। তাদের ডালে ফুলের সাড়াও আসে। ওই একবিন্দু সবুজের দিকে চেয়ে সমীরের বন্দী মন ফিরে যায় তার গ্রামের সবুজ স্নিগ্ধতার মাঝে। কেমন যেন নিঃসঙ্গ সে এখানে।

সেই বেড়ানোর পর সমীর কাজলীকে এড়াবার চেষ্টা করে। বিশেষ করে কাজলী না থাকলে তবে সে ছাদে আসে। কাজলীও মাঝে মাঝে বলে আড়ালে,

—অ্যাই চলো না, লাইট হাউজে দারুণ একটা ছবি এসেছে। ক্লাশের বন্ধুরা বলছিল।

সমীর বলে,—দেখি, একদিন যাবো।

—কবে?

সমীরের অফিসের পরীক্ষার ফল বেরুবে এবার। সে বেশ উৎকণ্ঠার মধ্যে রয়েছে। সংসারে টাকার দরকার। মিনার বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে দু'চার বছরের মধ্যে। প্রবীরের কলেজের পড়ার খরচা আছে। সুবীরও পড়ছে। ওদিকে সংসারে খরচা বাড়ছে। নিজের ভবিষ্যতের কথা তারপর। এখন ওদের ভাবনাতেই সে ব্যস্ত।

কাজলীকে নিয়ে স্বপ্ন দেখার সময় তার নেই। কিন্তু এবার প্রমীলা কথাটা ভাবছে। আর সে-ই চেষ্টা করেছিল কাজলী সমীরকে একটু ঘনিষ্ঠ করে নিক। আজকাল পাড়ায় বহু ঘরে দেখেছে এই ব্যাপারটা।

পাত্র হিসেবে সমীর ফ্যালনা নয়। সরকারি চাকরে—প্রমোশনও পাবে। জীবনে আরও বড় হবে। আর সব চেয়ে সুখের কথা তার মেয়ে কলকাতাতেই বাসা করে স্বামী-স্ত্রী দু'জনে থাকবে। নির্ভেজাল সংসার। সমীরকে হাতে পেলে তার ঘাড় থেকে সমীরের মা, ভাই, বোনদের বোঝাটাকে সে-ই ছিটকে ফেলে দিয়ে সমীরকে ভারমুক্ত করে দেবে তার মেয়ের জন্যই।

তাই সেদিন প্রমীলাই নসুবাবুকে কথাটা বলে,

—সমীর কাজলী দু'জনকে বেশ ভালই মানাবে।

—মানে? নসুবাবু এসব ভাবেনি। তাই সে অবাক হয়।

প্রমীলা বলে,—সমীর কাজলী দু'জনে এখন বেড়াতে টেড়াতে যায় টায়।

কাজলীরও অমত হবে না এ বিয়েতে।

নসুবাবু বলে—এসব কি বলছ। ওরা দুজনে ভাই বোনের মত মেশে টেশে। তাছাড়া সমীরের ঘাড়ে এত দায়-দায়িত্ব, বোনের বিয়ে দিতে হবে, ভাইদের মানুষ করতে হবে। বিধবা মা।

প্রমীলা বলে,—তারা তো গ্রামের সব কিছু ভোগ করছে। আর সমীরের সাধ আহ্লাদ কিছু নেই? তুমি বাপু সমীরকে বলো কথাটা।

নসুবাবু স্ত্রীর কথায় বিস্মিত। সে বলে,

—সমীরের মা রয়েছেন, সমীরকে কী বলব। তাছাড়া সমীরের মা এখন বিয়েতে মত নিশ্চয়ই দেবেন না। তাছাড়া একই গাঁয়ে এপাড়া ওপাড়ায় কুটুম্বিতা-এটা ঠিক নয়। দূরের কুটুমই ভালো। সম্পর্ক ভালো থাকে। এ বিয়েতে বাপু আমার মত নেই।

—তা কেন থাকবে। নিজের ভালো মন্দও বোঝ না।

প্রমীলার কথায় বলে নসুদা—এটা ভালো নিশ্চয় নয়।

এসব মতলব ছাড়ো। আর মেয়েকে পড়াশুনোয় মন দিতে বলো। সামনে পরীক্ষা, একটু সুশিক্ষা দাও।

এবার যেন আগুনে ঘি পড়ে। প্রমীলা ফুঁসে ওঠে।

—মেয়েকে আমি কুশিক্ষাই দিই তাই বলতে চাও? আমি ভালোমন্দ কিছুই বুঝি না? গাঁইয়া? জানি, জানি, তোমার কীর্তিকলাপ আর জানতে বাকি নেই।

নসু ভটচায এবার হাওয়া গরম বুঝে বাজারের থলিটা হাতে নিয়ে কেটে পড়ে। জানে এবার প্রমীলার তর্জন গর্জন বেড়েই চলবে তাই সরে পড়াই উচিত।

এদের এই পারিবারিক ঝগড়াটাও সমীরের চোখে পড়ে। দুই পক্ষই গম্ভীর। সমীর দশটার মধ্যেই বের হয়ে পড়ে, নসুদাও। প্রমীলা ভাতের থালা দুটো এনে ঠক্ করে নামিয়ে দিয়ে চলে যায়।

সমীরের বয়সও কম স্বাস্থ্যও ভালো। ভাত একটু বেশিই খায়।

নসুই বলে—কই গো সমীরকে ভাত দিয়ে যাও।

ওদিক থেকে কোন সাড়াই নেই। সমীর বলে,

—না-না, আর ভাত লাগবে না। অনেক খেয়ে ফেলেছি।

সমীর খাওয়া সেরে উঠে পড়বে এমন সময়, প্রমীলা ভাত আনে।

—ওমা, উঠে পড়লে যে।

সমীরই বলে,—পেট ভরে গেছে, আফিসের দেরি হয়ে যাবে।

হাত ধুয়ে তৈরি হতে থাকে সে বের হবার জন্য।

সমীরও বুঝেছে এবাড়িতে তাকে কেন্দ্র করেই যেন একটা অশান্তির পরিবেশ গড়ে উঠছে। প্রমীলা আগেকার মত সহজভাবে আর তার সঙ্গে কথা বলে না।

সমীর তবু কাজলীকে পড়াতে বসে, তার পড়াশোনা ঠিকমত করে না কাজলী। সমীর ধমক দিলে চুপ করে থাকে।

সমীর বলে,—ফেল করবে যে!

কাজলী বলে,—তাতে কার কি এসে যায়।

—আমার তো বদনাম হবে। ঠিকমত পড়াইনি। নসুদাও ভাববেন ফাঁকি দিয়েছি।

কাজলী বলে,—ঠিক আছে পড়বো।

কিছুক্ষণ পরেই পড়া ছেড়ে বলে,—অ্যাই কাল বিকেলে ময়দানে বেড়াতে নিয়ে যাবে? কাল তো ছুটি।

ছুটির দিনটা সমীরের একান্তই নিজেরই, তাদের অফিসের রোহিণীদের বাড়িতেই যাবে বলেছে সে। এসপ্লানেড থেকে ট্রামে বেহালা। সেখান থেকে নেমে দশ-পনেরো মিনিট হেঁটে যেতে হবে। ওই পথটা তার ভালো লাগে। পিচ রাস্তা নেই, খোয়া ইট ফেলা পথ। দুদিকে ঘন সবুজ গাছ-গাছালি, পরিত্যক্ত পুকুরে পানার জঙ্গল। পারের গাছগুলো সুবর্ণলতার হলুদ আবরণে ঢাকা, বাঁশবন। পাখির ডাক শোনা যায়, সবুজ মাঠে দু'একটা চালা ঘর। গ্রামীণ পরিবেশ, পায়ে চলা পথটা গিয়ে রোহিণীদের কলোনিতে ঢুকেছে। সেখানে বেশ ছিমছাম পরিবেশ।

সাজানো পল্লী। বিস্তীর্ণ এলাকা নিয়ে গড়ে উঠেছে নতুন বাড়িগুলো। একতলা দোতলা মধ্যবিত্তের বাড়ি। সামনে কারও ফুলের বাগান। ওদিকে একটা পুকুর। বেশ টলটলে জল। সামনে কলোনির পুজোমণ্ডপ, খেলার মাঠ। তার ওদিকে রোহিণীদের বাড়ি।

রোহিণী কবিতা লেখে। তার কবিতাও ছাপা হয় অনেক পত্র-পত্রিকায়। সমীরেরও ভাল লাগে ওর কবিতা। ওদের পাড়াতেই থাকে অশোক আর মানস।

মানসের বাবা ছিলেন সিভিল সার্জন। এখন রিটায়ার করেছেন। মানস আর.জি. করে ডাক্তারি পড়ে। অনেক দূরের পথ। তাই মেডিকেলের ছাত্রদের হোস্টেলে থাকে। হাসপাতালের কাছে, রবিবারে বাড়ি আসে। আর আড্ডা মারে রোহিণীদের সঙ্গে।

অশোক অবশ্য লেখাপড়া ছেড়ে এখন ফিল্মে নামার কথা ভাবছে। সেই সঙ্গে কোন ম্যাজিশিয়ানের কাছে ম্যাজিকও শিখছে। সে বলে,—বুঝলে! দুনিয়ার মানুষকে তাক লাগিয়ে দিতে হবে। সে যে কোন উপায়েই হোক। তাক্ লাগাতে পারলে সে তোমাকেই মেনে নেবে। ব্যস্, কেল্লা ফতে।

সে এর মধ্যে শূন্যে হাত ঘুরিয়ে লাল বল ধরতে পারে। হরতনকে বদলে রুইতন করে তাক লাগাতে পারে।

রোহিণীর কবিতা পাঠও হয়। সমীর অবাক হয়ে শোনে। কথার মালা গেঁথে ভাবকে মানুষের অন্তরে পৌঁছে দিতে পারাটাই কঠিন কাজ! আর সেই কঠিন কাজটা রোহিণী অনায়াসে করতে পারে।

রবিবারটা তার কাছে স্মরণীয়। তাই সে ওখানে যাবেই। কাজলীকে নিয়ে বের হয়ে নানা সমস্যার মুখোমুখি হতে চায় না সে। তাই সমীর বলে,—কাল যাব কী করে?

—কেন?

—অফিসের ওভার টাইম করতে হবে যে।

—অফিসের ওভার টাইমই বড় হল? কাজলী ঠোঁট ফুলিয়ে বলে কথাটা।

সমীর বলে,—পরে একদিন যাবো। যাও এখন অঙ্কগুলো করে ফেল।

কাজলী চুপ করে যায়।

অফিসের পরীক্ষার ফল বের হয়েছে। সমীর অফিসে এসে খবরটা পায়। রোহিণী বলে,—চিঠি পাও নি? তুমি দারুণ রেজাল্ট করেছ। তাহলে কেরানিকুলের খাতায় পাকা করে নাম লেখালে।

সমীর বলে,—কেন? তুমিও তো পাস করেছ।

রোহিণী বলে,—তা করেছি। তবে এই জোয়াল বাঁধা হয়ে চাকরি নিয়ে পড়ে থাকতে আমার ভালো লাগেনা হে, এখানে শিল্পীর অপমৃত্যু ঘটে। হাঁপিয়ে উঠেছি।

রোহিণীর মাঝে একটা বাঁধন ছেঁড়া বেপরোয়া ভাবকেই দেখেছে সমীর, কিন্তু সমীরের কিছু করার নেই। এই জীবনকে মেনে নিতে হবে। তার পায়ের তলে রোহিণীর মত শক্ত মাটি নেই।

তবে প্রমোশন পেয়ে এবার নতুন কথা ভাবছে সমীর। খবরটা নসুদাকেও বলেছে সমীর, দেশেও মাকে জানিয়েছে। প্রমীলা খবরটা জেনে নসুকে শুধোয়,

—কত টাকা মাইনে পাবে সমীর?

নসু বলে,—তা ভালই পাবে। সরকারি কর্মচারী, বছর বছর মাইনে বাড়বে। আর প্রমোশন পেয়ে উপরে উঠে যাবে, অফিসার হবে।

এ হেন পাত্রকে হাত ছাড়া করতে চায় না প্রমীলা। কাজলীও কথাটা শুনেছে। সে এবার মনে মনে ছক কষে ফেলেছে।

সে দিন সন্ধ্যায় সমীর অফিস থেকে ফিরেছে। প্রমীলা পাড়ার কোন মন্দিরে কথকতা শুনতে গেছে। নসুবাবু ফেরে সেই রাত নটার পরে। বাড়িতে একাই রয়েছে কাজলী।

সমীরকে ফিরতে দেখে বলে,—এত দেরি হল যে?

সমীর বলে,—দেরি কোথায়? সবে ছ'টা বাজে। এখনও পড়তে বসোনি?

কাজলী এগিয়ে আসে, বলে,—তোমার শুধু পড়া আর পড়া। এ ছাড়া আর কিছু নেই?

সমীর তার দিকে তাকালো। কাজলী বলে,—হাত মুখটা ধুয়ে নাও। চা আনছি।

বাড়িটা নির্জন। কাজলী আজ সেজেছে। এগিয়ে আসে সমীরের দিকে। হঠাৎ সে দুহাত দিয়ে সমীরকে জড়িয়ে ধরে। সমীর বিব্রত বোধ করে। কাজলীর বুকের জামাটাও নেই। সে যেন আজ নিজের অফুরন্ত যৌবন দিয়ে সমীরকে মোহগ্রস্থ করে নিজের দখল কায়েম করতে চায়।

উষ্ণস্পর্শে সমীরের মনে কি ঝড় ওঠে। সে কিন্তু সমীর এভাবে নিজেকে হারাতে চায় না। সব শক্তি একত্রিত করে যেন ওই কালনাগিনীর কঠিন বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে সে কোনমতে বাড়ি থেকে বের হয়ে গেল ওই সন্ধ্যার অন্ধকারে।

বৌবাজারের ওদিকে তারই অফিসের কেশব, জগন্নাথরা একটা মেসে থাকে। গলির মধ্যে একটা জীর্ণ তিনতলা বাড়িতে মেসটা। এক-দু, তিন তলায় বেশ কয়েকটা ঘর। ওদিকে

ফাঁকা উঠানে দুটো বড় বড় চৌবাচ্চায় জল ধরা থাকে। স্নানের ব্যবস্থা ওই মুক্ত উঠানেই ওদিকে কয়েকটা পায়খানা। প্যাইকেরী ব্যবস্থা।

জগন্নাথ সমীরকে ঢুকতে দেখে চাইল।

—কিরে! একেবারে ঝোড়ো কাকের মত অবস্থা, কি হয়েছে?

মৃগেনও ওপাশের ঘরে থাকে। সেও আসে। এর মধ্যে মেসের চাকর ওদের চাও দিয়ে যায়। সমীর ও কথাটা কিছুদিন থেকেই ভাবছিল। প্রমীলা বৌদির ব্যবহার তাকে ভাবতে বাধ্য করেছে। আর কাজলীও ক্রমশ মাত্রা ছাড়িয়ে চলেছে।

সমীরও ভাবতে পারেনি যে কাজলী এইভাবে তাকে আক্রমণ করবে। ভালোবাসা আর দৈহিক সঙ্গতা এ দুটোর মাঝের পার্থক্যটা বুঝেছে। শ্যামলীকেও দেখেছে সে। তার চরম বিপদের দিনে শ্যামলী তার পাশে এসেছিল। তাকে সাহস যুগিয়েছিল। এগিয়ে যাবার অনুপ্রেরণা দিয়েছে। সে কোনদিনই এইভাবে তার যৌবনকে নিয়ে তার সামনে বেসাতি করেনি। সমীরও সহজভাবে বন্ধুর মতই মিশেছে তার সঙ্গে। তার কাছে পেয়েছে অনেক।

কিন্তু কাজলী তার তুলনায় একেবারে অন্য প্রকৃতির। মেয়েটার লেখাপড়া-গান-কোন সুস্থ রুচিবোধ নেই। নিজেকে সাজাতেই ব্যস্ত, আর পুরুষের সামনে নিজেকে প্রজাপতির মতই তুলে ধরতেই জানে। নিজের স্বার্থেই আজ সে সমীরকে কাছে পেতে চায়। গ্রাস করতে চায়।

এবার সমীরও বুঝেছে এর পিছনে প্রমীলাবৌদিরও প্রচ্ছন্ন সোচ্চার মদতই রয়েছে। মেয়েকে সেই ঠেলে দিতে চায় সমীরের দিকে। সমীরকে ওরা গ্রাস করতে চায়।

সমীর এতে রাজি নয়। তার ঘাড়ে সারা পরিবারের দায়িত্ব। সমীরের মনে পড়ে বাবার কথা। সমীরের বাবা ছিলেন সরকারি কর্মচারী। দূরের কোন জেলায় তার চাকরি ছিল। সমীররা তাদের গ্রাম ছেড়ে বাবার চাকরীর জায়গাতেই থাকতো। সমীর বাইরে বাইরে মানুষ।

দূর মুর্শিদাবাদ জেলার প্রত্যন্ত এক গ্রাম পাঁচপুরেই সে মানুষ হয়েছিল। প্রাইমারি থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেছিল সেখানেই। নিজের গ্রামে বাবার সঙ্গে দু' একবার এসেছে মাত্র। কিছুদিন থেকে গেছে জ্যাঠামশাই, জেঠিমার সংসারে। সে জানতো ওই পাঁচপুরই তার জায়গা। সেখানেই তার বাল্যবন্ধুরা রয়েছে। সেও ওদেরই একজন।

তারপর হঠাৎ দীর্ঘদিন পর তার বাবার বদলির অর্ডার এলো, ওখান থেকে ওদের চলে যেতে হবে অন্যত্র। সেইদিন আবিষ্কার করেছিল সমীর সে এখানের কেউ নয়। যে মাটিতে সে মানুষ হয়েছে—সেই মাটির সে কেউ নয়। এখান ছেড়ে চলে যেতে হবে তাদের। এতদিনের পরিচয় সম্পর্ক সব পরিণত হয়েছিল বেদনাদায়ক এক স্মৃতিতেই।

পাঁচপুর ছেড়ে চলে এসেছিল সমীর এক ভোরের আবছা অন্ধকারে তারা ঘুমন্ত পাঁচপুর ছেড়ে এসেছিল। সেই মুহূর্তটিকে আজও ভোলেনি সে। পিছনে পড়ে রইল সেই জনপদ বন্ধুরা। সেই ভোরের তারাজ্বলা অন্ধকারে তার বন্ধুরাও পর হয়ে গেল। নিঃসঙ্গ একাকী সে।

তারপর আরও কয়েক জায়গায় ঘুরে ছিল, কিন্তু পাঁচপুরকে সে ভোলেনি। তারপর বাবা মারা যান প্রবাসেই।

অসহায় মা-ভাই বোনদের নিয়ে ফিরে আসে তার গ্রামে। সেই লালমাটি শালবনের দেশে। সেই মাটিই আবার তাকে ঠাঁই দিয়েছে। অন্ন জুগিয়েছে।

এখনও মা-ভাই বোনরা ওই মাটিতেই রয়েছে তারই মুখাপেক্ষী হয়ে তাদের মানুষ করতে হবে। মিনার বিয়ে দিতে হবে। এখন তার অনেক কর্তব্য বাকি। সেই কর্তব্যের বোঝা ফেলে দিয়ে সমীর ওই প্রমীলার ফাঁদে পা দেবে না। কাজলীর মত মেয়েকে সে ঘৃণাই করে। ওর-নিজেদেরই স্বার্থ দেখে অন্যের কথা ভাবার সময় তাদের নাই। সমীর তার কর্তব্য স্থির করে নিয়েছে।

তাই জগন্নাথকে বলে তোমার মেসে আমার একটা সিটের ব্যবস্থা করে দাও।

কলকাতায় এই মেস অনেকই আছে। ডালহৌসীর কাছাকাছি অঞ্চল, অফিস হেঁটেই যাতায়াত করা যায়। তাই এই অঞ্চলের বহু কেরানিকুল বৌবাজার, হ্যারিসন রোড মিরজাপুর স্ট্রিট অঞ্চলে একটা বাড়ি ভাড়া নিয়ে বেশ কয়েকজন মিলে থাকে কোনমতে। নিজেরাই ঠাকুর চাকর রেখে রান্না করায় আর সব খরচের টাকাটা মেম্বাররাই ভাগ করে মিটিয়ে দেয়। মাসে মাসে এক এক জন ম্যানেজার হয়। সেইই হিসাব পেশ করে মাসকাবারে।

এই মেসবাসীরা কলকাতায় বাসই করে, এদের কাজ সকাল দশটায় অফিস যাওয়া আর সন্ধায় অফিস থেকে ফিরে মেসেই তাসের আসর বসানো। এরা কলকাতায় থাকে—খায়—প্রাকৃতিক কর্ম করে আর অফিস করে। বাইরের সমাজে এদের মেলামেশা কমই। সপ্তাহে এরা শনিবার অফিস করেই ট্রেন ধরে দেশের বাড়ির যায় আবার সোমবার সিধে অফিসে এসে সন্ধায় মেসে ফেরে তারপর থেকেই আগামী শনিবারের দিন গোনে।

এইভাবেই তারা দিন মাস। বছরের পর বছর কাটিয়ে চাকরি থেকে রিটায়ার করে কলকাতাকে সেলাম জানিয়ে দেশগাঁয়েই শেষ জীবনটা কাটিয়ে দেয়।

অবশ্য এখন দিন বদলাচ্ছে। আজকের তরুণদের অনেকেই চাকরিতে উন্নতি করে কলকাতায় মেসজীবন ছেড়ে স্থায়ী বসবাস শুরু করেছে। তারা কলকাতার সমাজের বাইরে পড়ে থাকেনি, এখানের সমাজের মূল স্রোতে তারা অংশ নিয়েছে।

তাই মেসের জীবনযাত্রাতেও বেশ কিছু পরিবর্তন শুরু হয়েছে। জগন্নাথই এখন মেসের ম্যানেজার। মেসের জীবন থেকে দু' একজন এখন বাসা করে থিতু হচ্ছে কলকাতায়। সাধারণত মেসের সিট খালি থাকে না। অনেকেই লাইন দিয়ে থাকে। কিন্তু ক'দিন আগেই জগন্নাথদের মেসের শশীকান্তবাবু শ্যামবাজারে বাসা নিয়েছে—ফলে একতলায় তার সিটটা খালিই রয়েছে। বাড়িটা তিনতলা, তাও গলির গলি তারই মধ্যে। একতলায় ওই একটা ছোট ঘর—আর ওদিকে রান্নাঘর, খাবার ঘর, উঠানে বাথরুম ইত্যাদি। অন্য ঘরগুলো দোতালা-তিনতলায়। সাধারণ ওইসব ঘরেই আলো হাওয়া একটু আসে নীচের ঘরের তুলনায়।

কিন্তু সমীর নসুদার আশ্রয় ছাড়বেই—এখন এই ঘরেই উঠে আসবে সে। ঘরটা নিরিবিলি। একটা তক্তপোষ পাতা—অন্য ঘরগুলোয় মাটিতেই তিনজন বিছানা করে শোয়। দিনভোর বিছানাটা গোটানো থাকে, সন্ধ্যায় পাতা হয়।

জগন্নাথ বলে—সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়। কেন রে? ওখানে তো ভালোই আছিস। বাড়ির রান্না—একটা ফ্যামিলি পরিবেশ আছে এখানে তাও নাই। তুইও মেসশাবক হয়ে যাবি?

সমীর বলে—ওখানে পড়াশোনা কাযকর্মের অসুবিধা হচ্ছে। তাহলে এইমাস থেকেই আমি আসছি ওই ঘরে। টাকাকড়ি—কি লাগবে বলো।

সমীরই টাকাকড়ি দিয়ে মেসের খাতায় নাম লিখিয়ে আসে। যেন কিছুটা এবার নিশ্চিন্ত হতে পারে সে।

প্রমীলাও এবার স্বপ্ন দেখছে। তার একমাত্র মেয়েও কাছেই থাকবে। একা স্বামীর রোজগারই নয়। এবার সমীরের টাকাটাও হাতে পাবে সে।

প্রমীলা কাজলীকে বলে—সমীর কিছু বলছিল? ক'দিন তো ঘুরছিস ওর সঙ্গে। এবার তুইও কথাটা জানা ওকে।

কাজলী বলে—ওসব ব্যাপারে আমি নাই। মুখ গোঁজ করে বসে থাকে।

—তুই কি করিস? কোনও কম্মের নোস। আমাকেই সব করে দিতে হবে? প্রমীলা মেয়েকেই ধমকায়।

এবার সেইই কথাটা বলবে সমীরকে। নসু ভটচায কিন্তু এটাকে সমর্থন করতে পারে না। বলে সে প্রমীলাকে,

—সমীরের ঘাড়ে এখন অনেক বোঝা। ওর বিয়ে করার সময় এখন নয়। তাছাড়া ওর মাকেই জানানো দরকার।

প্রমীলা ধমকে ওঠে থামো তো তুমি। চাকরী করছে নিজে ঘর সংসার করবে না ওই রাবণের গুষ্ঠীর চিন্তা করবে? বিয়ের বয়স তো পার হতে চললো, আর বিয়ে করবে কখন? আমিই বলছি সমীরকে।

প্রমীলা আজ মক্‌সো করে রেখেছে। নিজেই দোকান থেকে গরম সিঙ্গাড়া, রাজভোগ কিনে এনেছে। সমীরকে যত্ন করে খেতে দিয়ে কথাটা পাড়বে।

সমীরও এবার সব ব্যবস্থা করে এসেছে।

পরশুই চলে যেতে হবে তাকে মেসে। এর মধ্যে নতুন বিছানা বালিশ-চাদর এসব কিনে মেসের ঘরে রেখে এসেছে। আজ নসুদাও সকাল সকাল বাড়ি ফিরেছে। প্রমীলা বলে—সমীর হাত মুখ ধুয়ে এসো। ও কাজলী সমীরের জলখাবার নিয়ে আয়, চা বসা।

কাজলী চায়ের জল চাপিয়েছে। আজ সেও জানে মা সমীরকে তাদের বিয়ের কথা বলবে। কাজলীর চোখেও কি স্বপ্ন। ঘর বাঁধার স্বপ্ন। বিয়ের সমন্ধে তারও একটা আতঙ্কই ছিল। কেমন লোক হবে—কোথায় যেতে হবে এসব নিয়ে তারও একটা ভয়ই ছিল। কিন্তু সমীরকে দেখার পর তার মনের সেই ভয়ের ছবিটা মুছে গিয়ে একটা আনন্দের আভাসই জেগেছিল। সমীরকেও চিনেছে সে। বিয়ের পরও এখানেই থাকবে এই পরিবেশেই এসব ভেবে কাজলীও খুশি হয়েছে।

সমীর কিন্তু ওদের সব আশা স্বপ্নকেই ব্যর্থ করে দিয়ে বলে.—নসুদা, বৌদি আমি পরশুই চলে যাচ্ছি এখান থেকে।

কাজলী চা খাবার এনেছে। প্লেটটা নামিয়ে দিয়ে সে অবাক হয়।

প্রমীলাই শুধোয়—সেকি। চলে যাচ্ছো এখান থেকে?

নসুদা বলে—বদলি হয়ে যাচ্ছিস নাকি এখান থেকে?

তা প্রমোশন পেলি তাই বদলি? কোথায় পোস্টিং দিল?

সমীর বলে—না। কলকাতাতেই থাকছি।

নসুদা বলে—কলকাতাই থাকছিস তবে এখান থেকে চলে যাবি? প্রমীলাও চমকে ওঠে। হাতের শিকার ফস্‌কে যেতে দেবে না সে। তাই বলে,—এখানে তোমার কি অসুবিধা হচ্ছে সমী? আমরা কি পর হয়ে গেলাম?

সমীর বলে—না-না। এখানে আপনাদেরই অসুবিধায় ফেলেছি। এতদিন আপনারাই আমায় আশ্রয় দিয়েছেন, অন্ন দিয়েছেন। কিন্তু আপনাদের আশীর্বাদে এবার চাকরিতে প্রমোশন হয়েছে। এবার আর কষ্ট দিতে চাই না, তাই একটা মেসেই সিটের ব্যবস্থা করে টাকাকড়িও দিয়ে এসেছি। কালই চলে যাবো। ছুটি রয়েছে।

নসুদা বলে—টাকাকড়ি দিয়ে পাকা করে এসেছো?

—হ্যাঁ।

প্রমীলা বলে—মেসেই চলে যাব?

সমীর বলে—এই কলকাতাতেই থাকছি। আসা-যাওয়াও করবো। দূরে তো যাচ্ছি না।

—অ! প্রমীলা বুঝেছে এবার শিকার ফস্‌কেই গেল। আর সমীর এটা জেনেবুঝেই করেছে। তাই চুপ করেই থাকে।

রাতে এবার রাগটা ঝড়ে নসুর উপরই। প্রমীলা বলে,—প্রথম থেকে তুমিই গা করলে না। এমন ছেলে ফস্‌কে গেল হাত থেকে।

নসু বলে—ভালোই হয়েছে কাজলীর মা। কাজটা ঠিক হতো না। এছাড়া পতিপত্নী বলে কথা। এটা আগে থেকেই নির্দিষ্ট হয়ে থাকে। তোমার মেয়ের ভালো ঘর করেই বিয়ে দোব।

—থাক! তোমার মুরোদ বোঝা গেছে। প্রমীলা মুখ ঝামটা দিয়ে ওঠে। কাজলী দেখে চুপ করেই। আজ মনে হয় তার সে যেন হেরেই গেছে। ওই সমীরকে সে ঠিক চিনতে পারেনি। ওকে ছলাকলা আর রূপযৌবন দিয়েই বাঁধতে চেয়েছিল। কিন্তু অনেকেই আছে যাদের শুধুমাত্র ওই দিয়েই বাঁধা যায় না। তাই হেরেই গেছে সে। তার মনের অতলে পুরুষদের সম্বন্ধে একটা রাগই জমে ওঠে।

কলকাতার বুকে সময় বসে নাই। যুদ্ধের খবর তারা কাগজে পড়েছিল। জার্মানি এগিয়ে যাচ্ছে---একের পর একটা দেশ গ্রাস করে চলেছে, তার লক্ষ্য ইংল্যান্ড। বিমান আক্রমণ শুরু হয়েছে সেখানে।

ইংল্যান্ডও বসে নাই। সেও লড়ছে।

আর আমেরিকাকেও এদিকে আক্রমণ করেছে জাপান। জাপান এগিয়ে আসছে সিঙ্গাপুরের পতন ঘটেছে। এবার তারা আসছে বার্মার দিকে। ? বার্মা তারা দখল করে এবার ভারতের দিকে হাত বাড়িয়েছে।

ওদিকে রাশিয়াও এবার জার্মান আক্রমণে বিব্রত।

এবার কলকাতাতেও যুদ্ধের ছায়া পড়েছে। পথে-ঘাটে ব্যাফেল ওয়াল; মাঠে পার্কে আঁকাবাঁকা গর্ত কেটে ট্রেঞ্চ বানানো হয়েছে। সন্ধ্যার পর থেকে পথঘাটের আলোও প্রায় নেভানো। রাতের বিমান আক্রমণ হতে পারে তাই এই আলো আঁধারের খেলা।

আর শেষ অবধি রাতেই বিমান আক্রমণ শুরু হলো। সমীরদের মেসটা গলির মধ্যে। রাতের স্তব্ধতার মাঝে যুদ্ধবিমানে হঠাৎ সাইরেন বেজে ওঠে একটার পর একটা। স্তব্ধ রাত্রির অন্ধকার ছিন্ন ভিন্ন করে ওই শব্দটা উঠছে—স্তব্ধ শহর।

তারপরই শোনা যায় যুদ্ধ বিমানের ইঞ্জিনের শব্দ। অনেকগুলো প্লেন যেন চক্কর দিয়ে তাদের লক্ষ্যবস্তুকে খুঁজছে। মেসের সবাই তিনতলা-দোতলা থেকে নেমে একতলার ঘরে-গলিতে, প্যাসেজের গলিতে আশ্রয় নিয়েছে।

তারপরই শুরু হয় প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ, কলকাতা এই প্রথম বিমান আক্রমণের লক্ষ্য হয়ে উঠলো। দরজা-জানলাগুলো কেঁপে ওঠে একটার পর একটা বোমার শব্দে। সমীরও ভীত। যদি একটা বোমা তাদের ঘাড়ে পড়ে সারা বাড়ি তাসের ঘরের মতই ভেঙে পড়বে। চাপা পড়েই মরতে হবে তাদের।

কতক্ষণ এই রুদ্ধশ্বাস সময় কেটেছে জানে না তারা। তারপর বোমার শব্দ থেমে যায়—এবার সাইরেনটা একটানা শব্দে বেজে চলে। শত্রুবিমান চলে গেছে।

কিন্তু বাবুদের মন থেকে ভয়ের চিহ্ন মুছে যায় না। নরহরিবাবু মেসের প্রবীণ বাসিন্দা, মোটা গোলগাল দেহ। কাটোয়ার ওদিকে কোন গ্রামে বাড়ি। হরিদাসবাবুর শীর্ণ লম্বা টিকটিকির মত দেহ।

নরহরি বলে—ব্যাটারা আবার ফিরে আসতে পারে হে। হরিদাসবাবু বলে—ছাড়ো তো, ইংরেজ গোরাদের চেন না—যা অ্যান্টি এয়ার ক্রাফট কামান দাগছিল—দ্যাখো কখানা প্লেন পড়েই গেছে। জাপান করবে যুদ্ধ।

রাত কাটে আধো ঘুমের মধ্যে। সকালে দেখা যায় কলকাতার আর এক দৃশ্য। এর মধ্যেই কলকাতার পক্ষে মানুষ নেমে পড়েছে। দলে দলে মানুষ মালপত্র নিয়ে হাটতে শুরু করেছে শহর ছেড়ে।

খাটালের মালিকও গরুর পাল নিয়ে পালাচ্ছে শহর ছেড়ে। জাপানীরা একবার যখন এসেছে তখন আবার আসবে। এবার আরও বিপদই বাড়বে মানুষের।

তাই বহু মানুষ শহর ছেড়ে গ্রামের দিকেই চলেছে। পথে-ঘাটে তাদের ভিড়। মুখে আতঙ্কের ছায়া।

সিঙ্গাপুর গেছে, বার্মা গেছে। জাপানীরা রেঙ্গুন-ই [illegible]িয়ার সবই দখল করে ইংরেজকে এবার তাড়া করে ভারতেই এসে হানা দিয়েছে।

কাগজেও ওইসব খবর ছাপা হচ্ছে। এবার ছাপা হয় কলকাতায় বিমান হানার খবর। সমীররা রোজকার মত অফিসে আসছে—দেখে ডালহৌসি স্কোয়ারেই বোমার বিস্ফোরণের দৃশ্য। পূবদিকে সারবন্দী কয়েকটা সুন্দর বটল পাম গাছ ছিল। বোমার স্প্লিন্টারে সেই গাছগুলো ক্ষতবিক্ষত, দু-একটা গাছকে বোমার টুকরো দু' খণ্ড করে দিয়েছে। সারা এলাকার অফিসের জানলার কাঁচ ভেঙে ছিটিয়ে পড়ে আছে।

দুপুরেই আবার বেজে ওঠে আর্তকণ্ঠে সাইরেন—মানুষজন ছোটে আশ্রয়ের সন্ধানে, কিন্তু বিমান আর আসেনি—আবার অলক্লিয়ার সাইরেন বেজে ওঠে।

কিন্তু মানুষের মনে আতঙ্ক তখন দানা বেঁধেছে। পথে-ঘাটে পলাতক জনতার ভিড়। হাওড়া-শিয়ালদহ স্টেশনে ট্রেনে ওঠার জন্য মারপিট শুরু হয়েছে। অনেকে ট্রেনের আশা ছেড়ে দিয়ে পায়দল চলেছে শহর ছেড়ে।

বহু দোকানপাটও বন্ধ হয়ে যায়। বাজারেও আসে না বেসাতি নিয়ে বাইরের মানুষ। সন্ধ্যার পর থেকেই পথঘাট নির্জন হয়ে যায়। যে কলকাতা ছিল জনারণ্য—এখন সেখানের পথে নেমেছে অরণ্যের নির্জনতা। দু' একটা ট্রাম-বাস ভীত-সন্ত্রস্ত গতিতে যেন পালাচ্ছে তাদের আস্তানার দিকে। কলকাতা প্রতীক্ষা করছে মুখ বুজে আরও বৃহত্তর আক্রমণের জন্য।

নরহরিবাবু বলে—অফিসে মেডিক্যাল দিলাম হে। কালই চলে যাচ্ছি।

হরিদাস খেতে খেতে নজর রাখে আজ মাছের মুড়ো কার পাতে দিয়েছে ঠাকুর। হরিদাসই আজ মাছের মুড়ো পেয়েছে। বেশ তারিয়ে তারিয়ে খাচ্ছে মুড়োটা। এবার নরহরি বাবুর কথায় বলে,

—কাওয়ার্ড। বোমার ভয়ে পালাচ্ছো? তা দেশে থাকবে ক'দিন? নরহরি বলে—শোন নি, জাপানী ফৌজ এবার এখানেই ল্যান্ড করছে। কাতারে কাতারে নামবে গড়ের মাঠে। জাহাজও আসছে—জাপানী জাহাজ। কলকাতার পোর্টে নামবে তারা।

হঠাৎ সাইরেন বেজে ওঠে। খাওয়া ফেলেই উঠে পড়ে অনেকে। হরিদাসবাবু সবে রুই মাছের বড় মাথাটায় কামড় বসিয়েছে। সেও গর্জে ওঠে—শালা জাপানীরা ছোটলোক হে—বোম ফেলার আর টাইম পেলো না? শান্তিতে খেতেও দেবে না।

গোলকবাবু বলে—তাইতো নসুদা দেশে চলে যাচ্ছে। আমাদেরও না যেতে হয়। কি বলো হে সমীর? জাপানী ব্যাটারা শুনেছি মহা খচ্চর।

সমীর তা জানে না। ওরা কান পেতে আছে কোথাও বোমার শব্দ শোনা যায় কি না। সত্যিই কলকাতায় থাকাই এবার সমস্যা হয়ে উঠবে।

কলকাতা এখন অনেক ফাঁকা। এখনও পালাচ্ছে অনেকেই। প্রাণ নিয়ে পালাবার জন্য মানুষ যেন মরিয়া হয়ে উঠেছে। সমীরেরও ভয় হয়। ভয় জিনিসটাই সংক্রামক। আর নিত্য নতুন যেসব গুজব ছড়াচ্ছে তাতে ভয়ই বেড়ে চলে। একটা সাইরেনের আতঙ্কিত চীৎকার সাধারণ মানুষের মনে আতঙ্কের বাতাবরণকে বাড়িয়েই তুলেছে।

কাতারে কাতারে মানুষ চলেছে কলকাতা ছেড়ে। পাড়ায় লোকজনও কমে গেছে। সেদিন সমীর নসুদার বাড়িতেই যাচ্ছে। লোক চলাচল নাই গলিতে। আলোও নাই এ যেন অন্ধকার এক জগৎ। প্রাণের কোন স্পন্দন নাই।

বাড়িটা নিস্তব্ধ। আলো জ্বলেনি। কড়া নেড়ে চলে সমীর। স্তব্ধতার মাঝে কড়া নাড়ার শব্দটা কানে বাজে। নসুদাই দরজা খুলে দেয়—তুই, ভিতরে আয়।

সমীর ঢুকে দেখে রান্নাঘরে নসুদা স্টোভে কি চাপিয়েছে। সমীর বলে—বৌদিরা নাই?

নসুদা শোনায়—বোমা পড়ার পর তোর বৌদির শরীর খারাপ হয়ে গেল ভয়ে। কাজলীও বলে এখানে থাকবো না। ওদের দেশের বাড়িতে রেখে এলাম। তোর মায়ের সঙ্গেও দেখা হয়েছে। তোর মাও ভাবছে। বললাম ভালোই আছে সমী।

নসুদাই বলে—যা সব শুনছি এরপর কলকাতায় থাকা বোধ হয় যাবে না রে। জাপানীরা যদি ল্যান্ড করে—

সমীর বলে—ওসব গুজবে কান দিও না। একটা জাত দুশো বছর গোলামি করে আমরা কেঁচো হয়ে গেছি তাই একটু এয়ার রেডেই ভেঙে পড়েছি। পালিয়ে বাঁচতে চাই। ইংল্যান্ডের

লোকদের কথা ভাবো, ওরা তো দিনরাত বোমা খেয়েও বেঁচে আছে। আমরা এবার স্বাধীন হবো—তখন দেশকে ছেড়ে কি পালাবো?

নসুদা বলে—তোরা ইয়ংম্যান, তোদের কথা আলাদা। আমরা তো আধবুড়ো হয়ে গেছি তাই এসব ভাবি।

সমীর বলে—ওসব ভাবনাচিন্তা এবার বদলাও।

—তাহলে থাকি যতদিন পারি। খোঁজখবর নিবি। বোস—চা করি।

সমীর বলে—তাই করো। পাড়ায় চায়ের দোকানওয়ালারাও সব পালিয়েছে। চাও জোটে নি।

..ইতিহাস থেমে থাকে না। সে তার নিজস্বগতিতে ঘটনা প্রবাহ রচনা করে এগিয়ে চলে। ভারতের ইতিহাসে এই চার এর দশকের ইতিহাস একটি স্মরণীয় অধ্যায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের এই হানাদারির পরই ইংরেজ সরকারের টনক পড়লো।

এতদিন ভারতকে তারা বুটের নীচে দাবিয়ে রেখেছিল। যুদ্ধের অনেক খবরই চেপে রেখেছিল তারা। ভারতের সেনাবাহিনী যারা এতদিন ইংরেজের হয়েই বন্দুক ধরেছিল—সেই সেনাবাহিনীই যে বন্দুকের নল ইংরেজ সরকারের দিকেই তাক করেছিল আজাদ হিন্দ সেনা হয়ে। এটা দেশের মানুষদের জানতেও দেয় নি।

নেতাজীর ডাকে এই অভ্যুত্থান ঘটেছিল। সেই খবরটাও চেপে রেখেছিল ইংরেজ। তাদেরই তাঁবেদার কিছু মানুষ সেদিন ভারতীয়দের মুক্তিযুদ্ধের নায়ক সুভাষ চন্দ্রকেই জাপানীদের চর বলেছিল। কিছু আগমার্কা ইংরেজ পদলেহী আরও গলা চড়িয়ে নেতাজীকে বলেছিল তেজোর কুকুর।

কিন্তু সত্য যখন প্রকাশিত হলো তখন ভারতের মানুষ নতুন করে এই মহাযুদ্ধের মূল্যায়ন শুরু করলো ইংরেজ সরকারও বুঝেছিল ভারতের মানুষকে আর দাবিয়ে রাখা যাবে না। তাদের দুশো বছরের রাজ্যপাট ছেড়ে যেতেই হবে।

তাই চলে যাবার আগে এই ভারতবর্ষকে চরম আঘাতই দিয়ে যাবে। হিন্দু মুসলমান এতদিন যারা ভারতে সম্প্রীতির মধ্যে বাস করছে, সেই বাতাবরণকেই বিষিয়ে দিয়ে যেতে হবে। দেশকে ওই জাতের ধুয়ো তুলে দু টুকরো করে দিতে হবে।

অবশ্য এর আগেই যুদ্ধের সময়েই ইংরেজ সরকার জাপানীদের ভয়ে সারা দেশের খাদ্যশস্য নিজেদের ভাঁড়ারে তুলে ফেলে দেশকে শস্যহীন হতদরিদ্র করে রেখেছিল। যদি জাপানীরা সত্যিই বাংলাদেশে এসে পড়ে একমুঠো রসদ পাবে না।

জাপানীদের ভাতেই মারার পরিকল্পনা করেছিল। কিন্তু জাপানীরা আসেনি। সারা দেশের মানুষই বঞ্চিত হলো এক মুঠো অন্ন থেকে। দেশের সর্বত্র শুরু হলো হাহাকার।

বাংলার সবুজ শ্যামল প্রান্তরে সুরু হলো বুভুক্ষু মানুষের আর্তনাদ। গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে ক্ষুধার্ত মানুষ একমুঠো অন্ন—একটু ফ্যানের আশাতেই শহরের ফুটপাথ ভরিয়ে তুললো। কঙ্কালসার হতদরিদ্র মানুষের ভিড়ে ভরে গেল শহর-জনপদ।

সমীর দেখেছে শহরের থেকে পলায়মান জনতার ভিড়। তারা আবার বসন্তের কোকিলের মত মহানগরীতে ফিরে এসেছে। আর এসেছে ওই বুভুক্ষু জনতার দল।

এখন সমীর সকালে ডিউটি করে। মর্নিং সিফ্‌টে তার ডিউটি। সকাল ছটায় মেস থেকে বের হয়—অফিস কাছেই। ভোরে নির্জন পথে দেখে দু একজন মানুষ মরে পড়ে আছে ফুটপাথে। শীর্ণ দেহ দেখেছে মা মরে পড়ে আছে অনাহারে, তবু শীর্ণ বাচ্চাটা মরা মায়ের শূন্য স্তন থেকে তখনও আহার্য সংগ্রহের ব্যর্থ চেষ্টা করে কাঁদছে।

শহরেই নয়। এই হাহাকার উঠেছে সারা বাংলার সবুজ প্রান্তরে, গ্রাম গঞ্জেও।

সমীর ক'দিনের জন্য বাড়ি এসেছে। মেজভাই প্রবীর স্কুল বোর্ডিংএ। দেশের বাড়িতে তাদের জমির ধানে সারা বছর খাবারটা জোটে।

কিন্তু এমনিতে তাদের জমি সমতল নয় এখানের ভূ প্রকৃতি অসমতল : কাছিমের পিঠের মত। তাই উপরের দিকে জমিগুলোয় প্রচুর বর্ষা না হলে চাষ ঠিকমত হয় না। নীচের দিকের সামান্য কিছু জমিই উর্বর। তার পরিমাণ বেশি নয়।

গতবার বর্ষাও তেমন হয়নি। তাই ধানও ভালো হয়নি। সেই উৎপন্ন ধানে বছর ভোর খাওয়া চলবে না এবার।

সমীরের মাও বলে—সমী, ধান তো কিছু চাই বাবা। গ্রামে অন্যসময় অনেকের ঘরেই ধানএর সঞ্চয় থাকতো। সমীরের মনে পড়ে ছেলেবেলায় সেইই দেখেছে তাদের বাড়ির উঠানে তিন চারটে বড় বড় ধানভর্তি মরাই থাকতো। এমন ধানের মরাই ছিলো গ্রামে অনেকের ঘরেই। তার থেকে ধান নিত অনেকেই আবার ধান উঠলে মণকরা কিছু ধান সুদ বাবদ দিত।

গ্রামের অর্থনীতিতে এই লেনদেনের রেওয়াজ ছিল। ধানের সঞ্চয়ও ছিল গ্রামেঘরে। কিন্তু যুদ্ধের সময় ইংরেজ সরকার আইন করে দিল—বেশি ধান কেউ রাখতে পারবে না, থাকলে সরকার তা দখল করে নেবে। ফলে গৃহস্থ ভয়ের জন্যই সেই সব ধান বিক্রি করে দিতে বাধ্য হলো। সারা গ্রামাঞ্চল থেকেও সরকার এইভাবে ধান বের করে নিয়ে একটা দেশের মানুষকে উপবাসের মুখে ফেলে দিল।

গ্রামেও ধান নেই। ধরণী চাটুয্যে গ্রামের সঙ্গতিপন্ন জোরদার। জমি-জমা স্বনামে, বেনামে তার অনেক। প্রভা দেবী বলে—ধরণীবাবুর ওখানে কিছু ধান আছে।

সমীর বলে—ওকেই বল না মা, যদি কিছু ধান দেন। ধান উঠলেই শোধ দিয়ে দোব।

প্রভা দেবী বলে—দেখছি বলে। মন দশেক ধান হলেই চলবে। গ্রামের এসব ব্যাপারে সমীর খুব ওয়াকিবহাল নয়। তাই প্রভা দেবীই গেছে ধরণীবাবুর ওখানে কথাটা বলতে। প্রভা দেবীও আগে সংসার নির্বাহের কথা ভাবতো না, ভাবতে হতো না। স্বামী বেঁচে থাকতে এসব কথা তাকে কোনদিনই ভাবতে হতো না।

স্বামী মারা যাবার পর ছেলে মেয়েকে নিয়ে গ্রামে এসে শুধুমাত্র বাঁচার তাগিদেই প্রভা দেবীও এসব হিসাবপত্র শিখে গেছে।

ধরণীধরবাবুও সাবধানী চতুর ব্যক্তি। ও জানতো সরকার সব ধান গ্রামাঞ্চল থেকে তুলে নেবার পর ধানের দর হবে আকাশছোঁয়া। সে তাই গোপনে বেশ কিছু ধান সরিয়ে রেখেছিল। এখন ধানের দর বেড়েছে পাঁচগুণ—সেও নগদ বেশ কামাচ্ছে। তাই সন্ধ্যার পরই দরজা বন্ধ করে ঘরে বসে থাকে ডাকাতির ভয়ে।

দোতলা থেকে প্রভাদেবীকে দেখে এবার নেমে আসে ধরণী নীচের ঘরে। এখন তার

হাতে অনেক টাকাই এসেছে তাই তার দিব্যদৃষ্টিও খুলেছে। ধরণীধর তাই জানতে পারে এখন মানুষ তার কাছে কেন আসে।

ধরণী তবু শুধোয়—কি ব্যাপার খুড়িমা? এই রাতে?

প্রভাদেবী কথাটা বলতে সঙ্কোচ বোধ করে। কখনও কারো কাছে তাকে হাত পাততে হয়নি। আজ ছেলেমেয়েদের জন্য তাকে এই কাজ করতে হচ্ছে। প্রভা দেবী বলে,—তোমার কাছে এসেছিলাম বাবা, কিছু ধানের দরকার।

ওই দরকারে এখন অনেকেই তার কাছে আসে। ধরণীর মুখটা গম্ভীর হয়ে ওঠে। বলে,—ধান তো আর নাই খুড়িমা।

প্রভাদেবী হতাশই হয়। সারা এলাকায় ধান নেই। কিনতেও পাবে না এই অঞ্চলে। তবে কি অনাহারেই মরতে হবে তাদের। নিজের জন্য নয়—ছোট ছেলে মেয়েদের মুখে একমুঠো অন্ন তুলে দিতে পারবে না এই কথাটা ভেবেই সে চমকে ওঠে। তবু বলে—মণ দশেক ধান দিতেই হবে বাবা।

ধরণীধর বলে—এত করে বলছেন কোনমতে দোব ধান তবে খুড়িমা ওই ধানের সুদ দিলেই হবে না।

—তবে?

ধরণীধর জানে কোনসময় কোনদিকে কি ভাবে প্যাঁচ মারতে হয়। এই বুদ্ধির জোরেই ধরণী আজ নিজের জমি টাকা বাড়িয়েছে। এই সময় গরিব চাষীদের অনেককেই সে ধান দিয়েছে তার সঙ্গে একটা বন্ধকী দলিলও করিয়ে নিয়েছে। জানে তারা সুদই দিতে পারবে না—ফলে দুচার বছর ওই জমির দখল নেবে ধরণী। তাই বলে সে—খুড়িমা, সমীরকে আসতে বলবেন, ধান দেব। তবে জমি বন্ধকী দলিল করে দিতে হবে। জানেন তো বাজারের অবস্থা।

প্রভাদেবী অবাক হয়। বলে—ধান ফেরত দেব সুদ সমেত—তবে বন্ধকী দলিল কেন?

—ওটা দিতে হবে খুড়িমা। ওছাড়া ধান দিতে পারবো না।

প্রভাদেবী বের হয়ে আসে। বাড়িতে সমীর অপেক্ষা করছিল। এবার মাকে ফিরতে দেখে শুধোয়—কি বল্লে ধরণীদা।

সব শুনে সমীর চমকে ওঠে—একেবারে পিশাচ মা। জমি বন্ধকী দলিল করে জমিটাই গ্রাস করতে চায়।

—তাহলে কি হবে সমী? প্রভাদেবীও কোন পথ পায় না। সমীরও ভাবছে কথাটা। এমন নগ্ন অভাবের মুখোমুখি সে হয়নি। বলে—অফিস থেকে লোন যদি পাই দেখছি মা। টাকা পাঠাবো।

—কিন্তু ধান কোথায় পাবো রে? ধান তো কথায় বিক্রী হচ্ছে না। ধান চাল দেশ থেকে হরে গেছে।

সমীর দেখেছে শহরে সেই বুভুক্ষু জনতাকে। আজ তার মা-ভাই-বোনদেরও যেন সেই মিছিলে সামিল হতে দেখে সে।

পৃথিবীটা কল্পনা করে শিউরে ওঠে সে। ধান তাদের দরকার। ঘরে খাবারও নাই।

রাত হয়েছে। কালই ফিরে যাবে সমীর। সভ্য শহরে সে দুমুঠো খেতে পাবে, কিন্তু এরা গ্রামে কি উপবাসে থাকবে? ঘুম আসে না সমীরের।

বাইরের ঘরে শুয়ে আছে সে। রাত কত জানে না। হঠাৎ দরজার কড়াটা যেন আলতোভাবে নড়ে ওঠে। উঠে বসে সমীর। এত রাতে কেউ ডাকবে ভাবতে পারে না। কড়াটা আবার নড়ে ওঠে।

সমীর জানলা খুলে দেখে বাইরে রমেনদা দাঁড়িয়ে আছে। ওকে দেখে বলে—দরজাটা খোল।

সমীর দরজা খুলে দিতে রমেন ভিতরে ঢোকে।

সমীর অবাক হয়—রমেনদা, এত রাতে?

তারপরই দেখা যায় একটা গরুর গাড়ি কালো লোহার আর রমেনদা দুজনে টেনে এনেছে। বলদও জোড়েনি। নিজেরাই টেনে এনেছে।

কালো লোহার গাড়িটা থেকে কয়েকটা বস্তা ধান নামিয়ে কোমরে চাপিয়ে এনে ঘরের এককোণে টান দেয়।

রমেন বলে—খুড়িমা ধরণীদার ওখানে গেছল ধানের জন্য। ওই ব্যাটা কসাই গলা কাটছে এখন। দশমন ধানই আছে। বলে কাউকে বলবি না। ধান উঠলে ওটা আমাকেই দিবি। আমার মাও যেন জানতে পারে না। করালীটাকেও কিছু বলবি না। নে, শুয়ে পড়।

রমেনদা আর দাঁড়ায় না। কালো এখন একাই শূন্যগাড়িটাকে টেনে নিয়ে ওদিকে খামারের পাশে রেখে সেও চলে যায়।

সমীর অবাক হয়ে গেছে। রমেনদা বরাবরই অন্য রকম। ওই জেঠিমা করালী দিদির মত নয়, সে, ওরা ব্যাপারটা জানতে পারলে রমেনদাকে ছাড়বে না, মই ওর ভাই দেবেন ও দাদাকে যা তা বলবে।

রমেনদা সংসারে থেকেও অন্যধাতের মানুষ। গান বাজনা নাটক এসব নিয়েই থাকে। কিন্তু তার মনের এই উদারতার খবরটা আজ জেনেছে সমীর।

সকাল হয়। প্রভাদেবীও ধান দেখে অবাক।

—কোথায় পেলি এই ধান!

সমীর বলে—পেয়েছো, ধান উঠলে তাকে শোধ দিতে হবে। তারপর সমীর বলে আসল খবরটা। সাবধান করে—রমেনদা বলে গেছে এখবর যেন কেউ না জানে। প্রভাদেবী বলে—ছেলেটা সত্যিই মানুষের মত মানুষ রে।

কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়েছে সমীর। সকালে শ্যামলীর সঙ্গে দেখা। শ্যামলী এই গ্রামের অঞ্চলপ্রধান শ্রদ্ধেয় লোক বিভূতিবাবুর মেয়ে। সমীর যেদিন সব হারিয়ে গ্রামে ফিরছিল ওই বিভূতিবাবুই তাকে নানা ভাবে সাহায্য করেছিলেন। নাহলে জেঠিমার কবল থেকে সমীররা তাদের জমিজমা উদ্ধার করতে পারত না, তাদের থাকার জাগাও পেত না এই গ্রামে।

ওই মানুষটিই সমীরের চরম দুর্দশার দিনে পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। তাকে উৎসাহিত করেছিলেন এগিয়ে যেতে।

শ্যামলী অজানতেই কবে তার কাছে এসেছিল। ম্যাট্রিক পাশ করে শ্যামলী কলেজে পড়ছে। সুন্দরী মেয়েটি। গ্রাম্য সংকীর্ণতার উর্ধ্বে সে। তাই সমীরেরও ভালো লেগেছিল।

শ্যামলীও দেখেছে সমীরদের অবস্থা। শ্যামলীদের উদ্বৃত্তান কিছু আছে। শ্যামলী এসেছে সেদিন কথাটা বলতে।

জানে সমীর প্রভাদেবী মুখ ফুটে কিছু বলবে না।

তাই শ্যামলীই এসেছে বলতে।

সমীর কথাটা শুনে অবাক হয়। বলে—

আজকাল ধান-চালের বিজনেস করছ নাকি শ্যামলী। তা সুদ দিতে হবে না জমি বন্ধকী দলিলও করে দিতে হবে?

শ্যামলী ধরণীধরের এই প্রথার কথাটাও শুনেছে। বলে সে,

—ধরণীবাবু শুনছি তাই করছে। ওঁর কাছে গেছলে নাকি?

সমীর বলে না। তোমার এই প্রস্তাবের জন্য ধন্যবাদ দিয়ে তোমাকে ছোট করবো না শ্যামলী। জানতাম—আর কেউ পাশে না থাকে, তুমি থাকবেই।

চুপ করে যায় শ্যামলী।

এ যেন তার মনের কথাই। শ্যামলীও স্বপ্ন দেখে এখানের কলেজে বি-এ পাশ করে সে কলকাতায় পড়তে যাবে। সমীরকেও বলে,

—এম-এটা কলকাতাতেই করতে হবে। লেডিজ হোস্টেলে সিট পাবো তো? সমীর বলে—ও হয়ে যাবে। সত্যি—দারুণ হবে। কলকাতায় থাকবে তুমি। এম-এ করবে। ওসব তো হল না আর এ জীবনে।

শ্যমলী বলে—অন্যভাবেও বড় হওয়া যায় সমীর।

সমীর বলে চাকরি চাকরি করে? দু এক ধাপ উপরে হয়তো ওঠা যাবে। মাইনেও বাড়বে। পদমর্যাদাও। কিন্তু কি তার দাম শ্যামলী? অবশ্য খাওয়া পরা জুটবে-সংসার ধর্মও পালন করা যাবে। কিন্তু লাখো কেরানির একজন এই হবে পরিচয়। এটাই কি জীবনের সব? আর কি কিছু করার নাই?

শ্যামলী বলে—সমী এই কিছু করার ইচ্ছাটা যদি থাকে নিশ্চয়ই কিছু করা যাবেই। তোমার লেখার অভ্যাসটা ছেড় না। কলকাতায় গিয়ে পড়েছো। ওখানে নিজেকে প্রকাশ করার পথ পাবে।

বাইরের সব কিছু দেখে ভুলে না গিয়ে সেই কর্মব্যস্ততার মাঝেও নিজেকে খোঁজার চেষ্টা করো। দেখবে তোমার অন্তরের থেকেই এগিয়ে যাবার পথ পাবে।

সমীর শুনছে ওর কথাটা। আজ শ্যামলীর কথাগুলো তার মনে যেন নতুন এক পথসন্ধান আনে। শ্যামলী বলে,

—আমি জানি সমীর তুমি ভিড়ে হারিয়ে যাবে না। অপরিচিতের মত ওই শহরে গেছো। ওই শহরই একদিন তোমাকে চিনবে যদি তুমি নিষ্ঠার সঙ্গে কিছু করার চেষ্টা করো।

সমীরের মনে পড়ে কাজলীর কথা। মেয়েদের মধ্যে এত পার্থক্য তা জানা ছিল না। কাজলীও তাকে পেতে চেয়েছিল। সেই পাওয়ার মধ্যে ছিল একটা চরম স্বার্থপরতা। সাপ যেন ব্যাংকে গ্রাস করে আত্মস্থ করে নেয়। কাজলীও তাইই চেয়েছিল।

কিন্তু শ্যামলী যেন একেবারেই স্বতন্ত্র। সে চায় সমীরকে আরও বড় দেখতে শ্যামলী অনুপ্রেরণা দিতে পারে। তার ভালোবাসার রূপে রংও স্বতন্ত্র। একটা স্নিগ্ধ জ্যোতিতে সে

বর্ণময়-কামনার অন্ধাকার তমসা সেখানে নাই। সমীর বলে—বি-এ টা পাশ করে চলে এসো কলকাতায় শ্যামলী। শ্যামলী বলে—আমি তো তাই চাই সমী। কিন্তু মানুষ যা চায় তা কি সব পায়? কে জানে?

সমীর কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে কলকাতায় ফেরে। মা বোনভাই তবু খেতে পাবে। সে বিষয়ে সে রমেনদার কাছে অসীম ঋণী।

ওই কয়েকবছর বাঙালীর জীবনে এসেছে শুধু ঝড় আর বিপর্যয়। কলকাতাই নয়, এই ঝড় সারা বাংলাদেশের ভিতকে নড়িয়ে দিয়েছে।

মহাযুদ্ধ—সেই বোমাতঙ্ক, পথে পথে বুভুক্ষু জনতার মৃত্যুমিছিলের পরও বাংলা তথা ভারতের বুকে শান্তির ছায়া নামেনি। এবার বাংলার বুকে ইংরেজ আনলো চরম বিপর্যয়। যেদিন জানলো ইংরেজ যে এদেশে আর থাকা যাবে না-সেই দিন সে ....শুরু করেছিল আঘাতের পর আঘাত।

এর মধ্যে সমীর কলকাতায় ফিরেছে। এখন তার মর্নিং ডিউটি। সকাল ছ'টায় অফিসে হাজিরা দিতে হয়, অবশ্য অফিস কাছেই। কলেজ স্ট্রিট থেকে ডালহৌসীতে পৌঁছে যায়। মহাযুদ্ধের ছায়া কেটে গেছে, কিন্তু তার চিহ্ন রয়ে গেছে ক্ষতবিক্ষত।

ডালহৌসীর বড় বড় পাম গাছ গুলোর দু'একটা গাছ মরে গেছে। বাকি দু' একটা সেই ক্ষতে কুঁকড়ে গেছে, সেই ক্ষতের দাগ মিলোয়নি। ওরাও মহাযুদ্ধে আহত পঙ্গু সৈনিক-সেই নির্মমতার সাক্ষী হয়ে রয়েছে।

বেলা একটা নাগাদ মেসে ফিরে স্নান খাওয়া করে সমীর।

মেস তখন ফাঁকা। ঠাকুর চাকরও ঘুমুচ্ছে। বাবুরা অফিসে। এত বড় বাড়িতে সেই একা জেগে আছে। সময় কাটে না।

তাই পাড়ার সাধারণ পাঠাগারের সভ্যও হয়েছে। বই আনে বাংলা উপন্যাস-ইংরাজি সাহিত্যর বইও। ক্রমশ সে এবার বিদেশী লেখকদের বইও পড়তে শুরু করেছে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের লেখকদের বই ও হাতে আসছে। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, ইতালি, সুইডেন, স্পেন, জার্মানির নামী লেখকদের বই মন দিয়ে পড়ে। পড়ে তারাশঙ্করের বইও। বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালী, দৃষ্টি প্রদীপ, আরণ্যক তার মনকে নাড়া দেয়। প্রকৃতি-অরণ্য নানা ধরনের মানুষ যেন তার দৃষ্টিতে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

ক্রমশ সমীর এই কলকাতায় বাস করে নিজের সংসারের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য চাকরি করে ও তার মনে একটা স্বতন্ত্র উপলব্ধির জগৎ গড়ে তুলতে চায়।

বিশেষ করে তারাশঙ্করের সাহিত্য তাকে নাড়া দেয়। সে ওই লেখকের পটভূমিকা লাভপুরের কাছাকাছিই ছিল। সমীরের মনে পড়ে তার ছেলেবেলার সেই পাঁচপুরের দিনগুলোর কথা। শস্যরিক্ত মাঠে মেলা বসতো আমবাগানে।

চাষীরা সেরা ফসল প্রদর্শন করতে । বিশাল কুমড়ো-কলার কাদি-ডাবের কাদি-আখ-নানা কিছু । সার্কাস-ম্যাজিকের তাঁবু পড়তো।

একদিকে আসতো ঝুমুরের দল। তারা রাতের বেলায় আমবাগানে হেসাক জ্বেলে নাচ গানের আসর বসাতো-ওদিকে আলো ভরা প্যান্ডেলে বসতো কবিগান, যাত্রাগানের আসর, কদিন শূন্যমাঠ ভরে উঠতো মানুষের মিলনমেলার আনন্দ কলরবে।

আবার মেলা ভেঙে চলে যেত তারা অন্য মেলায়-পড়ে থাকতো শূন্য নিঃস্ব প্রান্তর, নির্জন আমবাগান। সেই ঝুমুরদলের মেয়ে-কবিয়ালদের দেখেছে সমীর।

দেখেছে বৈষ্ণবদের আখড়া-সেখানের বৈষ্ণবীদের জীবনচর্যা-সেই দিনের স্মৃতি গুলোকেই যেন বর্ণময় করে তুলেছেন তারাশঙ্কর তার সাহিত্যকর্মে তাদের না বলা কথাই বলেছেন।

সমীরও যেন এক নতুন পথের সন্ধান পায়। সেও দেখেছে বহু মানুষকে, সেদিন কৈশোর যৌবনে বনে প্রান্তরে ঘুরেছে যাযাবরের মত।

সেও ময়ূরাক্ষীর বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে বাস করেছে। সে দেখেছে তারিণী মাঝিকেও, সেই অনুটিয়ার নীচে ময়ূরাক্ষী পার হয়ে বালুচর ভেঙে, দেখেছে বর্ষার মত্ত ময়ূরাক্ষীকে।

সমীর সেই জগতে ফিরে গেছে। খুঁজে পায় এক নতুন সত্তাকে যাকে অনেক দিন থেকেই খুঁজছে সে। সেই সত্তাই তাকে এক নতুন জগতের সন্ধান দেয়।

ক্লান্ত নিস্তব্ধ দুপুর। গলির এক প্রান্তে বাড়িটা এখন স্তব্ধ। একা সমীর। সে আর একা নয়। কলকাতা থেকে, আজকের জগৎ থেকে সে ফিরে গেছে অতীতে। লিখছে সেই দিনের দেখা এক বিচিত্র মানুষের কথা। কান্দী থেকে বাস যাতায়াত করতো সদর শহরের দিকে। সেই বাস ডিপোর সে টিকিট বাবুর কথাই যে অতীতে এই কাজ শুরু করেছিল। তারপর দীর্ঘদিন কেটে গেছে। দিনবদলের পালায় শহরের রূপ বদলেছে। সেই মুড়ির টিনের বাক্সের মত ছোট ছোট বাস আর নাই। সে সব বাতিল হয়ে গেছে, বাতিল হয়ে গেছে সেই টিকিট বাবুও। আজ এই ঝকমকে শহরের মানুষ তাকে চেনে না।

সেই দিনবদলের পালার নির্মম আঘাতে সে আজ পরাজিত।

গল্পটা লিখে ফেলে কি যেন ঘোরের মধ্যে সেও কিছু বলতে চায়, মহাকালের পৃষ্ঠায় যেন স্বাক্ষর রাখতে চায়।

পত্রপত্রিকা সে পড়ে, এর মধ্যে সাহিত্যর পাঠক সে হয়ে উঠেছে, এই অভ্যাসটা ছিল তার দীর্ঘদিনের। পাঁচপুরের লাইব্রেরি থেকে বই এনে লুকিয়ে পড়েছে আগে। সেইপড়ার অভ্যাসটা ক্রমশ বেড়েই ছিল স্কুল কলেজের পড়া ছাড়াও সে সাহিত্যের পাঠ নিয়েছে।

আজ সে নিজেই লিখেছে গল্পটা। লিখলেই হবে না-প্রকাশের পথ চাই। আরও দু একটা গল্প লেখে সে। নির্জন নিঃসঙ্গ দুপুরে সে লেখে। এই সময় সে যেন ফেলে আসা জগতেই ফিরে যায়।

তার গ্রাম, লাল মাটি শালবন মহুয়ার সৌরভ মাখা পরিবেশেই সে ফিরে যায়। ফিরে পায় সেই দেখা চেনা মানুষগুলোকে, সেই পরিবেশকে। এযেন এক অসীম তৃপ্তিরই স্পর্শ পায় সে।

প্রথম গল্পটা সে ডাকে পাঠিয়ে দেয় এক নামী সপ্তাহিক সাহিত্য পত্রিকায় আর একটা গল্প পাঠায় সে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায়।

তখন বাংলা সাহিত্যের জগতে প্রবাসী, ভারতবর্ষ বসুমতী, বঙ্গশ্রী—অনেক পত্র-পত্রিকা বের হয়ে চলেছে।

সমীর এখন সাহিত্যের মাঝেই তার নিঃসঙ্গতাকে ভোলার চেষ্টা করে। অফিসে সময়টা কোন দিকে কেটে যায় হই চই করে। রোহিণী কবিতা, গান লিখছে। এর কবিতার হাত বেশ মিষ্টি।

রোহিণী ইদানীং গানও লিখছে। সুন্দর লেখে রোহিণী—গান এর জগতে তখন অনেক দিকপালই রয়েছেন। প্রণব রায়, শৈলেন রায়, অজয় ভট্টাচার্য, আর অনেক নামী গীতকার রয়েছেন। রোহিণী ক্যানটিনে তার লেখা গান শোনায়। সমীর বলে—এসব গান গ্রামাফোন কোম্পানিকে দেখাও। ওরা তো কবিদের গান রেকর্ড করে। তোমার গানও ঠিক নেবে তারা।

রোহিণীও কবি। সেও চায় তার গান লোকের মুখে মুখে ফিরুক। তাই সেও বলে—বলছো তুমি?

—হ্যাঁ। দারুণ লেখো তুমি। তোমার গানে একটা রোমান্টিক ভাব আছে, এ গান লোক নেবেই।

রোহিণীও ভাবছে কথাটা।

পরদিনই দুজনে গিয়ে হাজির হয়। খুঁজে খুঁজে শ্যামবাজারে হাতিবাগানের পাশের গলি দিয়ে গিয়ে একটা বাড়িতে। ওইটা তখন গ্রামাফোন কোম্পানির অফিস। ওখানে অতীতে আধিপত্য করেছেন কবি নজরুল ইসলাম। আরও অনেক গীতকার, গায়ক গায়িকারা. সমীরের জগৎ এটা নয়, তবু রোহিণীর সঙ্গে এসেছে। এক কেশ্বিদর্শন ভদ্রলোক বলেন,

—গান কিছু রেখে যান। পরে জানাবো।

রোহিণীর চেহারাও সুন্দর। ফর্সা রং বুদ্ধিদৃপ্ত মুখ চোখ। হাতের লেখাটাও খুবই সুন্দর। একটা গানের খাতা রেখে দিয়ে আসে।

রোহিণী বলে—দেখবে তো?

সমীর বলে—তোমার হাতের লেখা যা সুন্দর—লেখাটা নিশ্চয়ই দেখবে।

সমীর সেদিন দুপুরে লিখছে। ক্রমশ লেখাটাকে যেন সঙ্গীই করে নিয়েছে। ঠাকুর চাকরও নিদ্রামগ্ন। এমন সময় বাইরে সাইকেলের বেল বাজতে সে বাইরে আসে। একটি সাইকেল পিওন চিঠি দেয়। চিঠিটা তার নামেই সেই সাপ্তাহিক পত্রিকার অফিস থেকে এসেছে।

সমীর উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ে—বার বার পড়ে। বিশ্বাসই করতে পারে না—ওই নামী পত্রিকা তার গল্পটি মনোনীত করেছে যথাসময়ে ছাপা হবে। এত বড় খবরে আজ সমীর অবাক হয়ে যায়। তবু চুপ করেই থাকে।

মেসের নিবারণবাবু-সনৎবাবুরা অনেকেই অফিস ফেরত রাধাবাজার, চিনেবাজারে কোন কোম্পানির দোকানের হিসাবপত্র রাখার কাজ করে, টুক টাক চিঠি চাপাটি টাইপ করে মাসে কিছু উপরি রোজগার করেন।

নিশীথ-মদন আরও অনেকে টুইশানিও করে সকাল সন্ধ্যায়, মদন তো টিউশানির অনেক খবরই রাখে। তখন স্কুলের মাষ্টার মশায়রা বাইরে কোচিংক্লাশের হাট বসাননি। স্কুলেই মন দিয়ে পড়াতেন। নিজেরা মাষ্টারির ব্যবসা চালু করেন নি। তাই তখন শিক্ষিত বেকার-সামান্য চাকুরেরাই সকাল সন্ধ্যা ছাত্রদের বাড়ি গিয়ে পড়াতো। তাদেরও কিছু রোজকার হতো।

মদন বলে সমীরকে—দু একটা টুইশানিই কর। কি হাবিজাবি বই পড়িস। ছাতার গল্প লিখিস।

সনৎবাবু বলে—তাই করো হে ছোকরা, টু পাইস আর্ন করো। তা নয় কি সব ছাই ভস্ম লেখো। কী হবে ওতে?

সমীর চুপ করেই থাকে। মাঝে মাঝে ভাবে তবু দুটো পয়সা আসবে। পয়সার তার দরকার। প্রবীরকে কলেজে পড়াতে হবে। মিনারও বয়স বাড়ছে। বিয়ে-থা দিতে হবে। মদনকে বলে—দ্যাখ, সন্ধায় করা যেতে পারে টুইশানি।

অফিসে তার বয়সী অনেক তরুণই রয়েছে।

তাদের মধ্যে অনেক বিচিত্র ধরনের তরুণকেই দেখেছে। কলকাতার বাইরে থেকে এসেছে সে। এখনও মহানগরে সে অপাংক্তেয়। এখানেই বসবাস করে এমন অনেককে দেখেছে সমীর। তাদের পোশাক-আদব কায়দা একটু আলাদা। সমীর তাদের সঙ্গে মেশে। তবে একটা পার্থক্য থেকে যায়।

দীপক মিত্র, নীলকান্ত সুজিতদের দেখে সে।

দীপক মিত্র নাকি দারুণ অভিনয় করে। মঞ্চে সে সাজাহান-এর চরিত্র করে একেবারে অহীন চৌধুরির মত। অন্যরোলও দারুণ করে। নীলকান্তও বড় মাপের অভিনেতা। লম্বাচওড়া চেহারা—আর সুজিত তাদের তুলনায় একটু ছোটখাটো মাপের। সেও অভিনয় করে-তবে আসলে সে নাট্যকার।

এরমধ্যে খান পাঁচেক নাটক নাকি লিখেছে। এখন ওরা তিনজনে হরিহর আত্মা। একসঙ্গে ক্যানটিনে বসে এবার নাট্যসংস্থা গড়ার পরিকল্পনা করছে।

নাট্যনিকেতন তখন কলকাতার নাটকের রমরমা। স্টার-রংমহল, মিনার্ভা-জোর চলছে। হ্যারিসন রোড কলেজ স্ট্রিটের মোড়ে চলছে নাট্যভারতী। শিশির ভাদুড়ি রয়েছেন নাট্য নিকেতনে, অহীনবাবু, নরেশ মিত্র, রবি রায়, ভূমেন রায়, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, সন্তোষ সিংহ- আরও অনেকে বিরাজমান। সবে আসছেন কমলমিত্র, মেয়েদের মধে সরযূবালা, রেবাদেবী, প্রভাদেবী-আরও অনেকে রয়েছেন।

বাংলা সিনেমাও তখন সগৌরবে চলেছে। সারা কলকাতায় দক্ষিণে তখন নিউথিয়েটার্স -ক্যালকাটা মুভিটোন, কালী ফিল্মস, ইদ্রপুরী, ইন্দরলোক রাধা ফিল্মস। উত্তরে এম-পি স্টুডিও নারাং স্টুডিও ইস্টার্ন টকিজ বেশ কিছু স্টুডিওতে কাজ চলেছে।

নাটক-ছবির জগতের সঙ্গে সাহিত্য জগতও চলেছে সমানতালে। পাড়ায় পাড়ায় বহু নাট্যসংস্থা গড়ে উঠেছে। তারাও নাটক লিখছে অভিনয় করছে। সেই সব অপেশাদার নাট্যংস্থা থেকে অনেক প্রতিভাবান শিল্পী বের হয়ে এসে পেশাদার মঞ্চে-সিনেমায় ঠাঁই করে নিচ্ছে।

এবার দীপকরাও নাট্যসংস্থা গড়ছে। গোলদিঘীর ওদিকে একটা রিহার্সেল রুম কাম অফিসঘরও ভাড়া নিয়েছে। সুজিত মনপ্রাণ ঢেলে নাটক লিখছে। সেই নাটকই মঞ্চস্থ করবে তারা। নিজেরা তাই নিয়েই বড় বড় কথা বলে। দীপক বলে।

—দেখবি অভিনয় কাকে বলে দেখিয়ে দেবো। ভাদুড়ি মশাই-এর ছাত্র আমি।

নীলু বলে—আরে নাটক করেন দুর্গাদাস দা—তাঁর কাছে শিক্ষা আমার, উড়িয়ে দোব।

ওদের মুগ্ধও জোটে অনেকে। তারাও মিনি অহীন চৌধুরী, দুর্গাদাস হবার স্বপ্ন দেখে। নীলু বলে,

—কইরে ললিত, সিগ্রেট ছাড়। শুধু শুধু অভিনয় শিখবি? ললিত সিগ্রেট বের করে দেয়। কে ওদের জন্য চায়ের অর্ডারও দেয়। সুজিত তখন নাটক কি হবে-তারই গল্প ফেঁদেছে।

রোহিণী সমীর দেখে ওদের ব্যাপার। দীপক বলে

—কবিবর, এবার নতুন অ্যাকখান কবিতা ছাড়ো গুরু। বেশ গরম কবিতা। ওসব প্যানপ্যানানি চাঁদ-ফুল মার্কা কবিতায় আর জনগণকে ভোলাতে পারবে না। এসো বন্ধু- ধরো হাতিয়ার। এইসা কুছ বানাও। সুজিত যা নাটক লিখছে একেবারে হাতে গরম, পাতে পড়তে পাবে না, উবে যাবে।

সমীর শোনে এদের কথা। তাকে অবশ্য কেউ কিছুই বলে না, সে যেন ওদের কৃপার পাত্রই। রোহিণী বলে

--চলো সমী।

সমীরের লেখা প্রকাশিত হয়েছে সেই সাপ্তাহিকে। সমীরের মেসের বাবুরা পত্র-পত্রিকার ধার ধারে না। মেসে খবরের কাগজও সবদিন আসে না। তারা কঠিন জীবন সংগ্রামে ব্যস্ত। কাব্য-ফাব্যের ধার ধারে না। তবে নাটক সিনেমা কেউ কেউ নতুনদের মধ্যে দেখে। তাই সমীর যথাপূর্বং অবস্থাতেই থেকে যায়।

সমীর সেদিন অফিসে পত্রিকার একটা কপি এসেছে। ছুটির পর বাইরে এসে রোহিণীকেই পত্রিকাটা দিতে রোহিণী বলে কী ব্যাপার?

—দ্যাখো।

রোহিণী সূচিপত্রে ওর নাম দেখে চাইল। খুশিই হয়েছে সে।

—এ্যা। তুমি যে দেখছি ছুপা রুস্তম হে। তলে তলে এতসব? এই পত্রিকায় লেখা বের হয়েছে তোমার?

সমীর বলে—কাউকে বলো না। ওরা এ নিয়ে টিটকারিই দেবে। লেখাটা তুমি পড়বে—কেমন লাগে জানাবে।

রোহিণী বলে নিশ্চয়ই পড়বো।

সমীর বাড়ির চিঠি পায়। ক্রমশ সংসারের খরচ বাড়ছে। মা লেখে যদি আরও কিছু টাকা পাঠাতে পারে ভালো হয়। সমীর এবার টিউশানিই নিয়েছে সন্ধ্যায়। মদনই ঠিক করে দেয়। কলুটোলার দিকে কোন বনেদী বাড়িতে একটি ছেলেকে পড়াতে হবে। ভদ্রলোকের বেশ গোলগাল নধর চেহারা। কিসের ব্যবসাপত্র আছে।

বাড়িতে ভদ্রালোক সন্ধ্যায় একটা গামছা পরে সমাসীন, গলায় সোনার হার। নধর ভুড়ি। সমীরকে দেখে বলে,

—পড়াবেন তো। ছেলে আমার খুবই বুদ্ধিমান।

—ছেলে কোথায়?

—ওই যে আসছে।

ছেলের চেহারা দেখে সমীর থ। গোলাকার একটি পিপের উপর যেন পাকাতাল বসানো। হাতে চেনে বাধা একটা কুকুর। সান্ধ্যভ্রমণ সেরে ফিরছে। বাবা বলে—ফিঙে ম্যাস্টার মশাই এসেছেন—ছেলে বলে এটো ব্যাস্টো হচ্ছো কেন? একটু বসটে বলো—আসছি। ছেলে ভিতরে চলে গেল। বাবা বলে,

—ক্লাশ সেভেনে পড়ে। হ্যাঁ—মাসে পনেরো টাকা করে দেবো। আগে দশই দিতাম। শুনলাম বি-এ পাশ তাই মাইনে বাড়িয়ে দিলাম। রোজ সন্ধ্যা সাতটায় আসবেন নটা অবধি পড়াতে হবে। ছেলের রেজাল্ট যেন ভালো হয়।

সমীর বলে—ছেলে পড়লে রেজাল্ট ভালোই হবে।

—আপনিই তো পড়াবেন মশায়। সেটা তো আপনারই কাজ।

সমীর শুনে থ হয়ে গেল।

সেদিন সমীর অফিসে গেছে সকালে। শহরের পরিবেশ কেমন থমথমে।

দুপুর নাগাদই খবর আসতে থাকে কলকাতায় গোলমাল হানাহানি শুরু হয়ে গেছে। খুন - জখম - চলছে। ডালহৌসি স্কোয়ার এর অফিসগুলোও বন্ধ হয়ে যায়। ভীত ত্রস্ত কেরানিকুল পথে বের হয়েছে।

বৌবাজার ফিয়ার্স লেন এলাকায় চাপা উত্তেজনা। পুলিশের গাড়ি দৌড়াদৌড়ি করছে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য। লোকজন দৌড়চ্ছে এদিক-ওদিকে। বাস ট্রামও নাই। দু' একটা রুটের বাসও ঝুলন্ত যাত্রীদের নিয়ে প্রাণপণে দৌড়চ্ছে। থামার সাহস তাদের নাই।

সমীররা কয়েকজন দলবেঁধে হেটেই চলেছে, এদিক ওদিকে দেখা যায় গলির মুখে জটলা, সবাই যেন সর্বনাশের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে।

কোনমতে ওই এলাকা পার হয়ে সমীর কলেজ স্ট্রিটের গলি দিয়ে ঢুকে নিজের মেসে এলো। এর মধে সনৎবাবু, দিবাকর, হরিদাসবাবুরাও একে একে ফেরে ভীত ত্রস্ত অবস্থায়। গলির মুখে তখন ভিড় জমেছে। বৈকাল হয়েছে। খবর আসে চলমান মানুষের মুখে মুখে।

—রক্তগঙ্গা বইছে মশায়। পার্ক সার্কাস-খিদিরপুর রাজাবাজারে ও যুদ্ধ শুরু হয়েছে।

কে বলে-কলাবাগান বস্তি থেকে ফাইড হানড্রেড ধরে তরোয়াল নিয়ে আসছে অ্যাটাক করতে। রেডি থাকুন মশায়।

খবর হাওয়াতে উড়ছে।

সন্ধ্যা নামে। হাওয়ায় ভেসে আসে জনতার গর্জন—নারে তকদীর। এদিক থেকেও এবার আওয়াজ ওঠে—বন্দে মাতরম।

ছাদ থেকে দেখা যায় এদিক-ওদিকে আগুন জ্বলছে আর মানুষ এতদিন পাশাপাশি বাস করে থাকার পর পরস্পরের শত্রুতেই পরিণত হয়েছে। শুরু করেছে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম নিজেদের মধ্যে। সেই মহাযুদ্ধের আতঙ্ক যেন ফিরে এসেছে আরও ব্যাপক রূপ নিয়ে। সেদিন শত্রুছিল বাইরের একটা জাত।

আজ শত্রু হচ্ছে নিজের প্রতিবেশী ভাই। এ সংঘাত আরও ভয়াবহ। এর পরিণাম আরও শোচনীয়।

পাড়ার বেশ কিছু ছেলেও বের হয়ে পড়েছে। কলকাতার সাধারণ মধ্যবিত্তের ঘরে অস্ত্র বলতে বটি বড়জোর দরজার হুড়কো। তা দিয়ে বিড়াল কুকুর তাড়ানো যায়। শত্রুকে তাড়ানো যায় না। তাই পাড়ার উৎসাহী যুবকরা এবার কলেজ স্কোয়ার-আশপাশেব পার্কের রেলিং ভেঙে সেই রডগুলোকে অস্ত্র করে পাড়ার পথে বের হয়েছে।

ওদিকে একটা বস্তিতেই হানা দিয়েছে তারা। টালির চাল, বাঁশের খুটি, ঘরের ছেঁড়া কাঁথা বের করেই আগুন দিয়েছে। আর্তনাদ ওঠে।

পাড়ার কিছু বয়স্ক মানুষ নিষেধ করেও ওদের থামাতে পারে না। তরুণরাও যেন খেপে উঠেছে।

সকাল হয়। তখনও সরকারের তরফ থেকে এই সর্বনাশা দাঙ্গা থামানোর কোন প্রচেষ্টাই দেখা যায় না। গলির মোড়ও নিরাপদ নয়। ওদিকে দূরে অন্যপক্ষ গর্জাচ্ছে। এদিকে এরা মাঝে মাঝে ঢিল পাটকেলের লড়াইও শুরু হয়।

তখনও বোমার এত প্রচলন হয়নি। তবে এর মধ্যে বোমার প্রয়োজনীয়তাও এবার এসে গেছে। সোডার বোতল দুচারটে ফাটছে।

বাজারহাট বন্ধ। কর্মব্যস্ত কলেজ স্ট্রিটও শুনশান। শহরের কর্মব্যস্ততা থেমে গেছে। এক মহানগর যেন যুধ্যমান জনক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।

নানা খবরও আসছে। সমীর দেখে মানুষের হিংস্রতাকে। জাতির জীবনে এ এক চরম কলঙ্কিত অধ্যায় ইতিহাসের পাতায়।

মেসে তিনচার দিনের রসদ থাকে। পাড়ার মধ্যে দু'একটা মুদির দোকানে লাইন লেগেছে। চাল, ডাল আলু পেয়াঁজ এর স্টক তাদের সীমিত। পাড়ার লোকেদের চাহিদা মেটানোর মত সঞ্চয় বেশি নাই। দেখতে দেখতে ডিম আলু পেয়াঁজ ফুরিয়ে আসছে।

শিয়ালদা-কলেজ স্ট্রিট বাজারও বন্ধ। বড় বাজার যাবার পথও নাই। এবার সকলেই ভাবনায় পড়ে। এ যেন এক অবরুদ্ধ নগরী। মহাযুদ্ধের সময় এই অনাহারের দুশ্চিন্তায় পড়ে নি মানুষ, এই ভ্রাতৃযুদ্ধের দিন তারা এবার প্রামাদ গোনে।

একদিন দুদিন তিনদিন কেটে গেল। এবার সম্বল কিছু চাল আর গোটা দুয়েক কুমড়ো। নুন ও নাই। কুমড়োসেদ্ধ আর ভাত এই মেসবাসীর খাদ্য।

ততদিনে পুলিশ মিলিটারি নেমেছে বিপুল রক্তক্ষয়ের পর। তৎকালীন কর্তপক্ষ হয়তো ইচ্ছে করেই দু'একদিন সময় দিয়েছিল যাতে হানাহানিটা চলতে পারে।

তারপর তারা এবার যে কোন কারণেই হোক শহরে শান্তি ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ শুরু করে।

তিনদিন পর সমীর, জগন্নাথরা মিলে বন্দীদশা থেকে বের হয়। অফিস যাবার উপায়ও নাই। এ যেন যুদ্ধের ধ্বংসাবশেষ ছড়ানো সর্বত্র।

এতকাল হিন্দু-মুসলমান একই এলাকায় পাশাপাশি বাস করেছে। ব্যবসা-বাণিজ্য করেছে। একই মহল্লায় হিন্দু-মুসলমানের পাশাপাশি দোকানও রয়েছে।

আজ সেই চেহারাই বদলে গেছে। মির্জাপুর-কলেজ স্কোয়ার আমহার্স্ট স্ট্রিট এলাকার পথে পথে ছড়ানো বিশেষ সম্প্রদায়ের দোকানের মাল, কলেজ স্কোয়ার অঞ্চলে বইএর দোকানও বাদ যায়নি। পথে পোড়ানো হয়েছে, প্রচুর বই-দোকানের মালপত্র লুট হয়ে গেছে। এদিক ওদিকে ধ্বংসস্তুপের মধ্যে পড়ে আছে দু চারটে নিরীহ মানুষের বিকৃত পচাগলা শব। বাতাসে ওঠে দুর্গন্ধ। শহর যেন শ্মশানে পরিণত হয়েছে। দোকানে মাল নাই-অনাজপত্রের দোকান বন্ধ।

অনেকে বলে—এখানে কি দেখছেন মশাই। বেকবাগান-খিদিরপুর, মেটিয়াবুরুজে যান লাশের পাহাড় দেখবেন। এ যেন খুনের প্রতিযোগিতা চলেছে।

মেসের বাবুদের মধ্যে এবার শহর ছেড়ে যাবার হিড়িক পড়ে যায়। সনৎবাবু কাটোয়ার ওদিকের মানুষ, দিবাকরও। সনৎবাবু তার ভুড়িতে একটা দশহাত ধুতিকে জম্পেশ করে জড়াচ্ছে।

সমীর শুধোয়—কি হবে ওতে?

এরা দলবেঁধে কলেজ স্ট্রিট থেকে হাওড়া ষ্টেশনে যাবার আয়োজন করছে। দিবাকর বলে-চাকরি মাথায় থাক, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরেই যাবো। গিন্নীর শাঁখা সিন্দুর তবু বজায় থাকবে।

সমীরেরও মনে হয় কলকাতা শহর স্বাভাবিক হতে পাঁচসাতদিন নিশ্চয়ই লাগবে। ততদিন এখানে থাকা যাবে না। খেতেও পাবে না, হোটেলও বন্ধ। মেসের ঠাকুরও পলাতক।

সমীরও কদিনের জন্য দেশের বাড়িতেই চলে যাবে।

সে চলেছে ওদের সঙ্গে। সনৎবাবু ভাইপোকে বলে।

—কাপড়টা টেনে বাঁধ। তুইও পেটে গামছা বাঁধ পুরু করে।

—কেন?

সমীরের কথায় সনৎবাবু বলে

—ছুরি ছোরা যদি কেউ মারে পেটেই মারবে। কাপড় বাঁধা থাকলে তবু জানে বেঁচে যাবে। তুমিও একখানা কাপড় বেঁধে নাও সমীর। রাস্তাঘাটের যা অবস্থা।

সমীর বলে দিনরাত ওইভাবে পেটে কাপড় বেঁধে থাকা যাবে না। বলুন তো।

সনৎবাবু, দিবাকর, নন্দদা, হরিদাস বাবুরাই কলেজ স্ট্রিট থেকে হাওড়া যাবার নিরাপদ পথ ধরে। এদিকে কলাবাগান বসতি কলুটোলা। ওসব এড়িয়ে নবীন কুণ্ডু লেন দিয়ে ঝামাপুকুর ধরে ঠনঠনিয়া হয়ে তারক প্রামানিক রোড—গিরিশপার্ক হয়ে পোস্তা দিয়েই চলেছে হাওড়ার দিকে।

পথে ঘাটে আবর্জনার স্তূপ, পচাগলা গন্ধ উঠছে শহরের মধ্যে এ এক বিজাতীয় পরিবেশ। ধ্বংসস্তূপ আর পূতিগন্ধে ভরা পরিত্যক্ত শহর।

ভোরবেলায় সমীর নামে তাদের ছোট্ট স্টেশনে ওই ট্রেনে কলকাতা ছেড়ে আসা অনেক মানুষই নেমেছে, কোনমতে সব ফেলে পালিয়ে এসেছে তারা এক বস্ত্রে। ক'দিনের আতঙ্কিত চেহারা। টিকিট তো কেউ চায়নি।

ভোরের আলো ফোটে শালবনে—দামোদরের বুকে 'শান্তসবুজ শালবন-লালমাটি গ্রামসীমা। এখানে সেই ছায়াছবির কোন চিহ্নই নাই। পাখিডাকা এক জগৎ। সমীরের ক'দিন ঘুম-খাওয়া দাওয়াও হয়নি। একটা দুঃসহ আতঙ্কের মধ্যে কেটেছে দিনরাত। ময়লা জামাকাপড়ে কোনমতে বসে এসেছে বাধ্য হয়ে।

এখান থেকে তার গ্রাম কয়েক মাইল পথ, দামোদর নদী পার হতে হবে। সকালে এসে দামোদরের কাঁচ ধার জলে হাতমুখ ধোয়। আকণ্ঠ জলপান করে যেন শক্তি ফিরে পায়। পথ চলতে শুরু করে।

গ্রামেও কলকাতায় হানাহানির খবর পৌঁছে গেছে রেডিও মারফত। বেশ কিছু লোক কলকাতায় থাকে। তারা রান্নাবান্না পূজাপাঠ একাজই করে।

তারা আগেই ফিরে এসেছে। তারাও যেসব কাহিনী গ্রামাঞ্চলে প্রচার করেছে তাতে মনে হয় কলকাতায় মানুষ আর বেঁচে নেই।

একেবারে পাড়াশুদ্ধ মানুষকে কচুকাটা করেছে, পথে শুধু মড়ার স্তূপ। তারাই বহু কৌশলে সাহসের সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে ফিরেছে।

প্রভাবতীর খবরগুলো শোন—প্রবীর মাধ্যমিক দিয়ে এখন বাড়িতেই রয়েছে। শহরে পড়ছে সে। সেও শহরে নানা খবর শুনে বাড়ি এসেছে।

প্রভার চোখে জল। সমীর কলকাতায় রয়েছে, তাদের একমাত্র উপার্জনক্ষম ছেলে। তার কোন খবরই নাই। এইমাত্র খবর আনে পুরুণের উদ্ধব দাস, গদারডিহির নানু কামাররা ফিরে এসেছে। হাটতলায় ওরা বলছিল সাংঘাতিক খবর মা।

প্রভাদেবীর চোখে জল নামে।

শ্যামলীও এসেছে এ বাড়িতে। সেই বলে—

—এত ভাবছো কেন কাকীমা, কলকাতা শহর, সেখানে পুলিশ মিলিটারি নেমেছে, গুজবে কান দিও না। এখন ডাকও বন্ধ। তাই চিঠি আসেনি। দেখবে খবর ঠিকই আসবে।

বড় জা মালতী আর তস্য সুকন্যা করালী ও এইসব খবরে খুশীই হয়েছে' রমেনই সেদিন বলে।

—সমী কলকাতায়, তার খবর নাই।

মালতী ছেলের কথায়—বলে খুব যে দরদ রে তোর ওই শক্রর জন্যে রমেন বলে— মা, হাজার হোক নিজের কাকার ছেলে। কাকা এই সংসারের জন্য কম করেনি। এত বিষয় আশয় তার জন্যই। মালতী এইবার তোলেবেগুনে জ্বলে ওঠে। সে আজ ও ভুলতে পারেনি সমীরদের বাবা মারা যাবার পর এখানে ফিরে আসর কথাটা। এতদিন মালতীরাই এসব বিষয় আশয় বাগান পুকুর সব একাই ভোগ করেছিল, তাদের যে কোন শরিক আছে তা ভাবে নি। সমীরের বাবা বিদেশেই থাকতেন। দেশের সম্পত্তির কিছুই নিতেন না। দাদাকে বেশ ভালো টাকাই পাঠাতেন, তাতেই বিষয় সম্পত্তি কেনা হয়েছিল।

বাবা মারা যেতে সমীররা দেশে ফিরতেই মালতীর টনক নড়ে। এবাড়ির বড়ছেলে রমেন চেয়েছিল একত্রেই থাকবে তারা। সমীর কৃতী ছাত্র। চাকরীও পাবে। একত্রেই থাকতে পারবে তারা। রমেনের স্ত্রী পারুল গ্রামের মেয়ে। সেও প্রভার সেবাযত্ন করে।

কিন্তু মালতী আর তার মেয়ে কারালী প্রভাকে সহ্য করতে পারে না। তাদের ওপর অত্যাচার অবহেলাও শুরু হয়। রমেন বলেও মাকে সামলাতে পারে না।

শেষ অবধি প্রভাও অতিষ্ঠ হয়ে পৃথক হাতে চায়, তাদের সম্পত্তি বুঝে নিতে চায়, বাড়ি ঘর এর অংশ। মালতী, করালী এবার মারমুখী হয়ে উঠে। মালতী না না কৌশলে তাদের উৎখাত করতে চায়।

কিন্তু সমীরকে গ্রামের আনেকেই ভালোবাসে। অঞ্চল প্রধান বিভূতিবাবুও এবার নিজেই গ্রামের পাঁচজনকে ডেকে এনে সমীরদের অংশ বের করতে সাহায্য করেন।

মালতী সেই জ্বালাটাকে আজও ভুলতে পারেনি। সমীরের কোন খবর নাই, মালতী খুশিই হয়।

পাঁচিলের ওদিক থেকে গলা তুলে বলে,

—হবে না? এর বিচার হবে না? ধরম দেখবেক আমার সর্বস্ব লুটে নিলি, উড়ে এসে জুড়ে বসলি, খুব গরম দেখালি, সরকারি চাকরি, বোঝ এবার। তাই বলে অতি বড় হয়ো না, ঝড়ে ভেঙে যাবে' গেল তো?

প্রভা শোনে তার জায়ের ওই শাপ শাপান্ত গুলো।

শ্যামলী বলে এই নিয়ে কোন কথা বলবেন না কাকীমা। দেখবেন সমীরদা ভালোই আছে।

প্রভার মন সান্ত্বনা মানে না।

বাড়িতে রান্নাবান্না হয় না। সুবীর চুপ করে গেছে, মিনাই কোনমতে ভাতে ভাত করে। প্রবীর এখানে ওখানে ঘুরছে যদি কেউ কোন খবর আনে।

নসুদারা আগেই চলে এসেছে। নসুদার বৌ প্রমীলা বলে,--ওরে বাবা, সমীরদের পাড়াতে তো শুনি খুব হামলা হয়েছে' প্রমীলা এখন কাজলীকে নিয়ে গ্রামেই এসেছে এখানেও তার পোষাচ্ছে না। কলকাতায় ফিরবে। কিন্তু নসুদাই বলে,

ভাগ্যিস ছুটি নিয়েছিলাম অফিস থেকে ক'দিন থেকেই যাই।

প্রভা কোন খবরই পায় না সমীরের। মনটা ভেঙে পড়েছে।

হঠাৎ সেদিন সকালে সুবীর খেলছে বাগানে, সেইই দাদাকে মাঠের পথে আনতে দেখে ছুটে বাড়িতে আসে।

---মা মা। দাদা এসেছে, বড়দা।

প্রভা চমকে উঠে। সেকি রে?

সুবীর বলে দেখলাম মাঠ দিয়ে আসছে, দৌড়ে খবর দিতে এলাম।

প্রভা উঠে আসে, সমীর ঢুকছে।

প্রভা সমীরকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ে। ওর কান্নার শব্দ শুনে এদিক থেকে মালতী করালী খুশিই হয়। করালী বলে

—কাঁদছে কেন গো, তাহলে ছোঁড়াটার খারাপ খবর এসেছে মা? মালতী ওদিক থেকে উঁকি মেরেই চমকে ওঠে সমীরকে দেখে। বলে, ওমা! ছোঁড়া কি যমের অরুচিরে। এত মার দাঙ্গার মধ্যেও ফিরে এসেছে।

করালীও বলে তাই তো গো!

ওরা হতাশই হয়।

প্রভাদেবী ছেলেকে জড়িয়ে ধরে বলে ফিরে এলি বাবা?

সুবীর প্রবীরও এসে গেছে। মিনার চোখে জল। সমীর দেখছে ওদের। এই মানুষগুলো তার পথ চেয়েই ছিল। এরাই তার একান্ত আপনার জন। সমীর বলে, কাঁদছ কেন মা?

প্রভা বলে—একি হাল হয়েছে রে?

সমীর মাকে কলকাতার সেই আতঙ্কিত পরিবেশ ক'দিনের দুশ্চিন্তা, দুর্ভাগ্যের কথা বলতে পারে না। বলে।

—ট্রেনের রাত জাগার ধকল ও কিছু না।

মিনা চা করে এনেছে, প্রভা বলে, চা টা খেয়ে চান কর বাবা। আমি রান্না করছি খেয়ে একটু ঘুমো।

ক'দিন পর শান্তিতে ঘুমোয় আজ সমীর।

ঘুম ভাঙে শ্যামলীর ডাকে। উঠে চাইল সমীর। মনে হয় সেই আতঙ্কের কথা। কলকাতাতেই রয়েছে। কানে আসে সেই রাতের অন্ধকারের করুণ আর্তনাদ, আগুন

জ্বলছে কোথায়।

শ্যামলী বলে—এযে কুম্ভকর্ণের ঘুম। ক'দিন ঘুমোওনি নাকি?

সমীর বলে—তাই।

প্রভা বলে, আর ওই শহরের নরকে যেতে হবে না বাবা প্রাণটা দিতে, এখানেই থাকো। যে কোন ভাবে হোক আমাদের দিন ঠিকই চলে যাবে। সমীর বলে—মা, চিরকাল কি এসব চলবে? চলবে না। আবার সব ঠিক হয়ে যাবে।

—ছাই হবে। প্রভাদেবী মন্তব্য করে, আগুন যখন জ্বলছে তখন সব কিছুকে পুড়িয়ে ছাই না করে থামবে না রে।

বৈকাল নামছে শান্ত গ্রামসীমানায়। শরতের প্রারম্ভে বর্ষা এবার ভালোই হয়েছে। দিঘীর পর থেকে ক্রমনিম্ন সবুজ ধানখেত আদিগন্ত বিস্তৃত, কাশফুলও ফুটতে শুরু করেছে। সবুজ ধান ক্ষেতের আলে কাশের গুচ্ছ, অস্তগামী সূর্যের শেষ আলোয় সবুজ যেন আরও মোহময় হয়ে উঠেছে। এদিকে শালবনে এসেছে মঞ্জরী। বৃষ্টিধোয়া বনে সুবাসের স্নিগ্ধতা। মাঠের কাজ সেরে ফিরছে মজুররা।

এই শান্ত সবুজ প্রকৃতির বুকে কোথাও কোন মালিন্য নেই, অশান্তির ছায়া নেই। সভ্যতা রাজনীতি উপরতলার মানুষের লোভী চক্রান্তই এই শান্ত সবুজ জীবনকে মহানগরের পরিবেশে বিকৃত করে তুলেছে।

একটা শ্রেণী মাথা তুলছে যারা ভারতের এতদিনের স্বাধীনতা সংগ্রাম, বাংলার বীর শহীদদের স্বপ্নকে বিকৃত করে আজ স্বাধীনতাকে পাকা ফলের মত নিজেদের কুক্ষিগত কবতে চায়।

শ্যামলী বলে—এই হানাহানির শেষ কোথায়? ব্রিটিশ কি স্বাধীনতা দেবে আমাদের?

সমীর বলে, কি পাবো জানি না। যারা স্বাধীনতা পাবার জন্য দেশকে দু'টুকরো করতে চায়, মানুষকে হিংস্র জানোয়ারে পরিণত করতে পারে, তাদের কাছে কি প্রত্যাশা করবে মানুষ?

—তবে?

—মনে হয়, লোভ-হানাহানির মধ্যে যার শুরু তার পরিণতি এই হানাহানির মধ্যেই। আগামী প্রজন্মের অদৃষ্টে আছে শুধু অভিশাপই।

শ্যামলী বলে, এত হতাশ হচ্ছ কেন? দেখবে দেশ স্বাধীন হলে দেশের চেহারাই বদলে যাবে। যুদ্ধের পরই আসে শান্তি।

সমীর চুপ করে থাকে। শ্যামলী জীবনকে ভালবাসে। এই মত্ততাকে দেখেনি, তাই এখনও ও সুখী জীবনের স্বপ্নই দেখে।

প্রমীলা অবশ্য এখনও আশা ছাড়েনি। কদিন এদিকে আসেনি। সমীর ফিরতে এবার এসেছে কাজলীকে নিয়ে। কাজলী গ্রামে এসে হাঁপিয়ে উঠেছে। সাজগোজ করার উপায় নাই। নসুদার বাবা মা এখনও বর্তমান। ওর বাবা শরৎ গ্রামের মাতব্বর, এখনও পূজা আশা করে।

বলে সে—নসু, কাজলীর বিয়ের চেষ্টা কর। গ্রামে ঘরে ওই বয়সের মেয়েদের বিয়ে হয়ে যায় আগেই, বলতো সপ্তগাঁয়ে চৌধুরী বাড়ির ছেলেটাকেই দেখি—ম্যাট্রিক পাশ

করে শিক্ষকতা করছে। বাড়িতে দুখান হালের চাষ, দাবি-দাওয়া অবশ্য করবে—

প্রমীলা আড়ালে বলে, চাষ করবে ছেলে? ওখানে বিয়ে দেবো না।

নসু ভটচায বলে—তবে কি শহুরে বড় চাকুরে জামাই পাবে?

প্রমীলা খবর পেয়েছে সমীর ফিরেছে, তাই এবার কাজলীকে নিয়েই আগে প্রভাদের বাড়িতে আসে। কথাটা আজই পাড়বে সে। তাই বলে প্রমীলা।

—এলাম খুড়িমা। বলিনি সমীরদের পাড়ায় কোন গোলমাল হয়নি, ও ফিরে আসবেই।

প্রভা দেখছে কাজলীকে। মিনাও এসেছে সে বলে।

—কত সেজেছে। কাজলীদি?

কাজলী চুপ করে থাকে। প্রমীলা এবার কথাটা পাড়বে কি করে তাই ভাবছে, এমন সময় সমীর আর শ্যামলীকে ফিরতে দেখে চাইল।

বিভূতিবাবুর মেয়েকে সে চেনে। কিন্তু সমীরের সঙ্গে তার এমনি মেলামশা, শ্যামলীর ও এই পরিবারে এত প্রতিপত্তি তা জানা ছিল না প্রমীলার।

শ্যামলী বলে কাজলীকে—এযে সিনেমার নায়িকাদের মত সেজেছিস রে। সমীর কাজলীকে এখানে দেখবে ভাবেনি এই মেয়েটিকে চেনে সে। বলে সমীর—কলকাতার মেয়ে।

শ্যামলী বলে, তা সত্যি আমরা তো গাঁইয়া। ওসব জানি না। প্রভা বলে, সাজগোজের এত কি দরকার? মেয়েদের পরিচয় তাদের কাজে। তুই তো এবার এম-এ পড়বি।

প্রমীলা যেন এসব কথা আশা করেনি, কালজীও বেশ রেগে গেছে।

প্রমীলাও বুঝেছে প্রভার কাজলীকে পছন্দ হয়নি। হবেও না। তাই বলে, চলি দিদি।

কাজলীও উঠে পড়েছে। প্রভা বলে।

—চা খেয়ে যাও। বোস শ্যামলী, প্রমীলা এল কথা বল, কলকাতায় যাবি, সেখানের হালচাল জেনে নে কাজলীর কাছে, ওতো কলেজে পড়ে।

কাজলী কলেজে পড়ে না সমীর তা জানে। প্রমীলা বোধ হয় গ্রামে এসে এটাই রটিয়েছে। সমীর বলে।

—কাজলী কলেজে ভর্তি হল কবে?

প্রমীলা ততক্ষণ উঠে পড়েছে। প্রভার কথার জবাবে বলে

—চলি দিদি কাজ আছে, চলরে কাজলী।

শ্যামলী বলে সমীরকে

—ও কেন এসেছিল জানো?

সমীর চাইল। শ্যামলী শুধায়

—তোমার কিছু জানা নাই?

সমীর ও অনুমান করতে পারে তাদের আসার কারণটা, তবু চুপ করে থাকে। শ্যামলী শুধায়, তাদের বাসাতেই থাকতে তো?

—হ্যাঁ!

—শ্যামলী বলে ওর মা তোমাকে জামাই করতে চায়। কি রাজি? বলে সমীর, ওরে, বাবা ও মেয়ের স্নো পাউডার সেন্টের খরচা জোগাতেই দেউলিয়া হয়ে যাবো।

শ্যামলীও খুশী হয়।

—তাহলে এমন মেয়ে বিয়ে করবে যার পিছনে খর্চা করতে হবে না। সমীর দেখছে শ্যামলীকে। ডাগর কালো চোখে কি খুশির ঝলক! টিকলো নাক, মাথার চুলগুলো ওর পিঠ ছাপিয়ে পড়েছে, চাপা রং এর শাড়িটা যেন ওর গায়ের রং এ মিশে গেছে। ওযেন সমীরের একটি স্বপ্ন।

শ্যামলী বলে কি হল? জবাব দিচ্ছ না যে।

সমীর বলে বিয়ে? এখন ওসব অনেক দূরের স্বপ্ন শ্যামলী। জানো, এক একজনের জীবনটা ঠিক সোজা পথে চলে সহজেই তারা অনেক কিছু পায়। আবার এক একটা হতভাগা আসে তাদের বরাতে তাকে শুধু বঞ্চনাই। তারা খেটে মরে বোঝা বয়ে যায় জীবন ভোর। এতটুকু পেতে গেলেও তাদের সংগ্রাম করতে হয়। পাবার স্বপ্ন তাদের নাই। আমি তাদেরই দলে।

শ্যামলী শুনছে সমীরের কথাগুলো। ওকে চেনে শ্যামলী। জানে ওর দায়িত্বের কথা। সমীর যে এই দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলে কোনদিনই নিজের কথা ভাববে না তাও জানে।

তাই শ্যামলী শ্রদ্ধা করে সমীরকে। এমন একজনকে বিশ্বাস করা যায়। শ্যামলীর মনও স্বপ্ন দেখে। সে কলকাতায় যাবে। এম-এ করে নিজের পায়ে দাঁড়াবে আর সেদিন সে সমীরকে পাশে পেলে খুশিই হবে।

প্রভার ডাকে তাদের চমক ভাঙে।

—বেগুনী করেছি। আয় তোরা, ঠাণ্ডা হয়ে যাবে যে।

সমীর বলে—চলো। মা ডাকছে।

জীবন তবু থেমে থাকে না। কলকাতার জীবন ক'দিন স্তব্ধ হয়ে ছিল আবার ক্রমশ স্বাভাবিক হয়ে আসতে থাকে। আবার ট্রাম বাস চালু হয়। আপিস কাছারি কয়েকদিন বন্ধ থাকার পর আবার খোলে। হাটবাজারে আবার আনাজওয়ালার দল শাকসব্জী আনতে থাকে। পেটের তাগিদেই মানুষ আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে।

ফিরে আসছে পলাতকের দল, খবরটা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। কলকাতা আবার কলকাততেই ফিরে এসেছে। সমীরও ফিরে এসেছে মেসে।

তখনও অনেকে ফেরেনি। অবশ্য স্ত্রীর শাঁখা-সিঁদুর বজায় রাখার জন্য দিবাকর বাবু ফিরে এসেছে। রেলের চাকরি তার শিয়ালদহ স্টেশনে গেটে টিকিট কালেক্ট করার সঙ্গে সঙ্গে তার দৈনিক কালেকশনও কম নয়। ক'দিন সেটা না হতেই আবার ফিরে এসেছে।

দিবাকর বলে, সমীর এসেছে? বুঝলে ভায়া, আমি দুদিন পরই ফিরেছি। ভয় কী? এবার স্বাধীন হবোই। ভয় করলে চলে

সেই সন্ধ্যায় সনৎ বাবুও সদলবলে ফিরেছে? মেসের নরক গুলজার। আবার তাসের আসর বসে।

সমীর সেই দিনগুলোকে ভোলেনি।

তার জীবনে সেই স্মৃতিগুলো সব ভিড় করে আসে। ভারতছাড়ো আন্দোলন থেকেই শুরু হয়েছে এক নতুন অধ্যায়। গুলি বোমা যুদ্ধের আতঙ্ক মন্বন্তর তারপর এই রক্তক্ষয়ী

দাঙ্গা একটা জাতির জীবনে যেন ঝড় তুলেছে।

সমীর এই দিনগুলোর সাক্ষী। তাদের যুগ যেন যন্ত্রণারই যুগ। মানুষকে মনুষ্যত্ব ভুলিয়ে দেবার যুগ। অতীতে রাজপুত্র সিদ্ধার্থ একটি মৃত্যুকে দেখে জীবন সম্বন্ধে ভাবতে শুরু করেছিল নতুন করে। মানুষকে অমৃত মন্ত্র শোনাবার জন্যই সংসার ত্যাগ করেছিলেন।

একালে শুরু হয়েছে মৃত্যুর মিছিল। আজকের যুগে কোন সিদ্ধার্থই সেই মৃত্যুকে নিয়ে ভাবিত নয়, তারা নতুন করে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টাই করে। অন্যদের জন্য ভাবনাচিন্তা করার সময়, এতটুকুও তাদের নাই।

কলকাতা এখন জনরবে মুখর। কলকাতার দাঙ্গা থেমেছে, এবার দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ছে বিহারে আর পূর্ব বাংলায়। সেখানে মুসলমান প্রধান অঞ্চল।

এতকাল সেখানে সম্প্রীতি বজায় ছিল। পাশপাশি বাস করেছে হিন্দু মুসলমান, কিন্তু এবার সেখানেই দাঙ্গা বেধেছে। কিছু মুসলমান এটা চাননি, তাঁরা বাধা দিয়েছিল কিন্তু অন্ধকারের দানবদের থামাতে তারা পারেনি, ফলে শান্ত জনপদ হয়ে উঠেছে অগ্নিগর্ভ, সবুজ শান্ত প্রান্তরে রক্তের ধারা, ঘর বাড়ি সব গেছে। মারা গেছে বহুজন। সাতপুরুষের ভিটে ছেড়ে সর্বস্ব হারিয়ে মানুষ ও দেশ ছেড়ে এদিকের পানে রওনা হয়েছে বাঁচবার জন্য।

নেতারাও বিচলিত, জনতা ও উদ্বেল। ইংরেজ যা চেয়েছিল তাই হয়েছে। তাই এবার নেতাদের অনেকেই এগিয়ে আসেন, আলোচনাও শুরু হয়। ইংরেজ জানায়, মুসলমানদের জন্য পাকিস্তান দিতে হবে। দেশবিভাগকে মেনে নিতে হবে। পাঞ্জাব সিন্ধু আর বাংলাদেশ দিতে হবে ওদের।

এবার বাংলার মানুষ চমকে ওঠে। স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার অবদানই ছিল বেশি ভারতের অন্য প্রদেশের তুলনায়। বাংলার হাজার হাজার যুবক প্রাণ বির্সজন দিয়েছে স্বাধীনতার লড়াইয়ে। ক্ষুদিরাম থেকে শুরু করে বহুজন। বাংলার বুকেই ঘটেছিল চট্টগ্রামের সংগ্রাম-নেতাজীর মাতৃভূমি এই বাংলা—তাকেই বিকিয়ে দিতে রাজি ভারতের কিছু নেতা।

শ্যামাপ্রসাদই কণ্ঠস্বর তোলেন—এ দেশ বিভাগ হতে দেব না। শেষ অবধি রক্ষা হল না। অবশ্য সারা বাংলা গেল না পাকিস্তানে, গেল অর্ধেকের ও বেশি। এদিকের কিছু ভগ্নাংশ পড়ে রইল।

সমীর দেখে কলকাতা তখনও ঠিক শান্ত নয়। মাঝে মাঝে কোথাও চোরা গোপ্তা খুন খারাপি চলেছে। পাকিস্তানের কথাও এখন সবার মুখে।

স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখছে অনেকেই। শেষ অবধি ঘোষিত হল ইংরেজ এদেশ থেকে চলে যাচ্ছে। তবে পিছনে রেখে গেল এমন এক ভারতকে যার সামনে এক চিরবৈরী রেখে গেল যাতে ভারতবাসী আগামীকালও স্বাধীনতার ফসল পুরোপুরি ঘরে তুলতে না পারে।

সেই স্বাধীনতার দিন সমাগত। এদিকে শুরু হয়েছে ওপার থেকে আসা ছিন্নমূল জনস্রোত। শিয়ালদহ স্টেশন প্লাটফর্ম-আশেপাশে উপচে পড়া নিঃস্ব সর্বহারা মানুষের ভিড়। চোখে মুখে তাদের আত্মীয়স্বজন হারানো সর্বহারানোর বেদনা।

সমীর দেখেছে এই অবস্থাকে। অতীতে সেও দাঙ্গা-মৃত্যুর মিছিল দেখেছে। সব ফেলে

নিঃস্ব অবস্থাতে সেও প্রাণ নিয়ে পালিয়েছিল তবু তার দেশ ঘর, মা ভাই বোন ছিল। সেখানে আশ্রয় পেয়েছিল, পেয়েছিল আশ্বাস।

কিন্তু এরা সব হারিয়ে এসেছে কোনমতে এক নতুন দেশে, যে দেশ তার অচেনা অজানা, কেউ একাই এসেছে আপনজনদের হারিয়ে। কেউ হারিয়েছে তার স্ত্রী-মা-বাবা, সেই মানুষগুলো আসছে কাতারে কাতারে।

স্বাধীনতার উৎসব শুরু হতে চলেছে। ঘরে ঘরে আলো জ্বলবে, শহরে জ্বলবে রোষ নাই, বোম বাজি ফাটবে, কুচকাওয়াজ হবে, গাওয়া হবে দেশাত্মকবোধক সঙ্গীত, বর্ণাঢ্য মিছিল বের হবে।

অফিসে এ নিয়ে অনেক আলোচনা হয়। পূর্ববঙ্গের অনেকেই কাজ করে এখানে। তাদের অনেকেরই স্ত্রী ছেলে মেয়েরা কেউ ঢাকা, কেউ ফরিদপুর, কেউ বরিশালে থাকে। তারা বিব্রত, দেশের খবর জানে না। অবশ্য কাগজে দেখা যায় দেশবিভাগের পর দাঙ্গা কিছুটা থেমেছে তুব লোকের মুখে খবর আসে নানারকম। সেখানে হিন্দুদের বিষয় সম্পত্তি লুটপাট হচ্ছে, মেয়েদের ইজ্জৎও বিপন্ন। বিনোদবাবুর বাড়ি বরিশালের কোন প্রত্যন্ত গ্রামে। বিনোদবাবু ও চিন্তিত, স্ত্রী ছেলে মেয়েরা সেখানে রয়েছে।

হঠাৎ টেলিগ্রাম আসে বিনোদবাবুর দেশের বাড়ি থেকে। মাদারস্ ম্যারেজ সেটেলড কাম সুন।

বিনোদবাবু কেন সমীররাও অবাক। বিনোদবাবু তো দেশের এই টেলিগ্রাম পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে। কে জানে কোন অন্যসম্প্রদায়ের কেউ এবার তার স্ত্রীকেই তুলে নিয়ে গিয়ে জোর করে বিয়ে করার ব্যবস্থা করেছে। কান্নায় ভেঙে পড়ে বয়স্ক মানুষটা।

অফিসের অন্যরাই বিনোদবাবুর ছুটির ব্যবস্থা করে, তাকে দেশের ট্রেনে তুলে বাড়ি পাঠিয়ে দেয়। অফিসে তো নানা গুজব ওঠে। সেখানে মহিলাদের যে কোন নিরাপত্তা নাই এই নিয়েই আলোচনা শুরু হয়।

বিনোদবাবুর কোন খবর নাই। কে জানে স্ত্রীর শোকে লোকটা আত্মঘাতী হল কিনা। দিন পনেরো পর বিনোদনবাবু ফেরে হাসিমুখেই, অফিসে একটা মিষ্টির হাড়ি নিয়ে ঢোকে। সমীরও অবাক। সকলেই ঘিরে ফেলে বিনোদবাবুকে—কি ব্যাপার বিনোদদা?

বিনোদ বলে—শালা টেলিগ্রামওয়ালাদের খচরামি দেখো, আমার মেয়ের ডাকনাম মটর। হঠাৎ ওখানে মটরের বিয়ের সম্বন্ধ পাকা হয়ে যায়। ছেলে এদিকেই কোন ইস্কুলের মাস্টার। বাড়ি আমাদের পাশের গ্রামে। মেয়ের বিয়ের কথা পাকা হতে ছেলে টেলিগ্রাম করে মটরস ম্যারেজ সেটেলড্ শালা টরে টক্কা বাবুরা এই মটরের জায়গায় ভুল করে টক্কা বাজিয়ে মটরকে মাদার করে দিয়েছিল রে। যাক মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল, মেয়ে এদেশে চলে এসেছে স্বামীর থরে নিশ্চিন্তে নে, মিষ্টি খা।

—বিনোদ বলে—তবে কি জানিস ওদেশে আর থাকা যাবে না, সব এদিকেই নিয়ে আসবো ভাবছি।

বিনোদবাবুর তবু এখানে সরকারি চাকরি আছে, মাথা গোঁজার ঠাই খুজে নিতে পারবে। কিন্তু অধিকাংশের ওসব কিছু নাই।

হাজার ছাড়িয়ে লাখ লাখ মানুষের ঢল নেমেছে এবার এদেশের সর্বত্র। উপচে পড়ছে

নিঃস্ব ছিন্নমূল সর্বহারা মানুষের ভিড়।

শহর, শহরতলীর আশপাশে তখন অনেক পতিত জমি, আমবাগান, হোগলা বন, জলা পরিত্যক্ত জমি, বাঁশবন রয়ে গেছে। মাথা গোঁজার আশ্রয় নাই। সেইসব পতিত জলা বনভূমিতেই তারা আস্তানা গাড়ে।

কার জায়গা—কার জমি সে সব জানার দরকার নাই, ওরা দলবেঁধে এসেছে রাতের অন্ধকারে, বাঁশ দরমা টালি দিয়ে রাতারাতি ঝুপড়ির পর ঝুপড়ি বানিয়ে বসে পড়েছে, এই নিয়ে সংঘাত ও হচ্ছে।

এর মধ্যে শুরু হয়ে গেল একদল মানুষের রাজনীতির খেলা, কংগ্রেস তখন দেশের বড় দল তারা দেখছে স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন, আর এই নবাগতদের নিয়ে এখানের অন্যদল এবার প্রতিষ্ঠা পাবার জন্য এই দলের হয়েই শুরু করলো দরদী বন্ধুর অভিনয়। দেশছেড়ে এসেছে এরা, এদের দাবী মানতে হবে। শুরু হল এক নতুন রীতি কানুন, আর দেশের চিরাচরিত আইনকে ভাঙার প্রবণতারই পত্তন শুরু হল 'দিতে হবে', বাজীর সূত্রপাত।

মানুষ বাঁচার জন্য মরীয়া হয়ে উঠতে বাধ্য হয়, কিন্তু তাদের সাহস যোগাতে শুরু হলো।

এর আগে মহাযুদ্ধের আতঙ্ক দেখেছে সমীর। সেদিন বিদেশী সৈন্যদের কাছে অর্থের লোভে অনেক মেয়েই সমাজের চোখকে ফাঁকি দিয়ে আত্ম বিক্রয় করেছিল। করতে বাধ্য হয়েছিল। কিছু লজ্জা সঙ্কোচ সমাজের অনুশাসনকে এড়িয়ে সেটা ঘটেছিল। ভাঙ্গন ধরেছিল সমাজের বুকে—সঙ্গোপনে।

এল মহামন্বন্তর। সেদিন হাজারো বুভুক্ষ মানুষ সামনে প্রচুর খাবার সাজানো দোকানের সামনের ফুটপাথে ওই খাবারের দিকে চেয়ে চেয়ে কাতর আর্তনাদ করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিল। তবু সেই দোকানের কাঁচে একটা ঢিল মেরে খাবার কাড়ার চেষ্টা করেনি।

কিন্তু সেই মন্বন্তর একটা দুঃসহ জ্বালা রেখে গেছল মানুষের বুকে—ভাঙন এর প্রয়োজনীতা অনুভব করেছিল। কিন্তু সেটা করতে পারেনি।

কিন্তু এই দেশ বিভাগ এনে দিল সেই ভাঙনকে। সমাজের রীতি—দেশের আইনকে নাড়া দিল ভিত্তিমূলে। এতদিনের আদর্শ, সামাজিক মূল্যাবোধকেও গুড়িয়ে দিল বাঙালীর জীবন থেকে।

এসব কথা. সমস্যা, হারানোর হিসাব নিয়ে কেউই সেদিন মাথা ঘামায় নি। একদল তখন স্বাধীনতার নামে দেশের কর্তৃত্ব পাবার স্বপ্নই দেখতে শুরু করেছে।

ব্রিটিশও তাদের হাতে দুটুকরো করে দু দলের হাতে ভারতবর্ষকে তুলে দেবে। তাতে বাংলাদেশ-পাঞ্জাব চলে যাবে পাকিস্তানে। বাঙালী জাতের ভবিষ্যত নিয়ে কেউ মাথায় ঘামাতে রাজি নয় দিল্লীর নেতারা।

কিন্তু শ্যামাপ্রসাদের কণ্ঠস্বরই গর্জে উঠেছিল। এই বিভাজনে তিনি তাঁর দল রাজি নয়। শেষ অবধি বাংলা-পাঞ্জাবকেই টুকরো করা হলো এই স্বাধীনতার জন্য।

সেই স্বাধীনতার উৎসব এগিয়ে আসছে। কলকাতায় তখন ওই ছিন্নমূলদের ভিড়। পাঞ্জাবে চলেছে রক্তস্নান। ভীত আর্ত মানুষ পালিয়ে আসছে।

তবু স্বাধীনতা পাবার আনন্দে তখন ভারত উদ্বেল। সারা শহরের মানুষ সেই মধ্যরাত্রির স্বাধীনতার প্রতীক্ষারত। সমীর-জগন্নাথ-মৃগেনরাও মেস থেকে বের হয়েছে। কলকাতার

মানুষ সেই রাতের আতঙ্ক ভুলেছে—ভুলেছে মন্বন্তরের মৃত্যুর মিছিল—ভুলছে ছিন্নমূলদের কথা।

সারা শহর অতীতের সব দুঃখ-আতঙ্ককে ভুলে আলোর মালায় সেজে উঠেছে। এতকাল রাজভবনে ছিল সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। লালমুখ ইংরেজ প্রতিনিধির আস্তানা। মাথায় উড়তো ইউনিয়ন জ্যাক।

সরকারি ভবনগুলোকেও আলোকমালায় সাজানো হয়েছে। রাত বারোটার জন্য রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষা করছে জনতা। তারপরেই আসবে আকাশ থেকে সেই এতদিনের আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা।

সমীর এসেছে বৌবাজারের ওদিকে একটা বাড়ির চিলেঘরে মহাদেববাবুর কাছে। ওই চিলেকোঠার ঘরেই তার আস্তানা। অতীতের অগ্নিযুগের পদাতিক তিনি। হিজলীর জেলে থাকার সময় পুলিশের গুলিতে একটা হাতে ক্ষত হয়ে হাত কেটে বাদ দিতে হয়েছিল।

সেই বিপ্লবী এখন একটা ছোট বই-এর দোকান, দপ্তরীখানা করে কোনমতে দিন চালায় কষ্টে-সৃষ্টে। মানুষটাকে শ্রদ্ধা করে সমীর।

মহাদেববাবু ছাদে বসে আছেন চুপ করে। সমীর বলে,—চুপচাপ কেন মহাদেবদা?

মহাদেবদা বলেন—এই রক্তাক্ত খণ্ডিত ভারতবর্ষকে তো দেখতে চাইনি সমীর। এই দরদাম করে এত কিছু হারিয়ে স্বাধীনতা পাবার জন্য তো লড়িনি। একি হলো?

সমীর বলে—এতে খুশি নন?

—না। মহাদেবদা বলেন—একদল নেতা নিজেদের স্বার্থে এটাকে মেনে নিলেন, কিন্তু এর কি বিষময় ফল ভুগতে হবে পরে যারা আসছে তাদের, এটা আমি দেখবো না। তোমরা দেখবে। এই দেশ বিভাগকে মেনে নেওয়ার কি সর্বনাশা ফল হবে বাঙালির তা জানি না।

...নীরব নিস্তব্ধ আকাশে জয়ধ্বনি ওঠে। মাঝরাতে সারা শহরের জনতা জয়ধ্বনি দেয়—বন্দে মাতরম। জয়ধ্বনি ওঠে। আকাশ ভরে বাজির রোশনিতে। সরকারি অফিসের মাথা থেকে নামছে ইউনিয়ন জ্যাক। ধীরে ধীরে তুমুল আনন্দধ্বনির মধ্যে উঠছে জাতীয় পতাকা।

রাজভবনের পতাকাও নেমে গিয়ে উঠেছে ভারতের জাতীয় পতাকা। জনতা সেদিন রাজ্যজয়ের নেশায় স্রোতের মত ঢুকেছে সেই রাজভবনে। সারা কলকাতা উত্তাল।

সমীর দেখে স্তব্ধ পাথরের মত বসে আছে মহাদেবদা,—যে স্বাধীনতার স্বপ্ন তারা দেখেছিল যার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করেছিল সেই কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতার সঙ্গে এর মিল নেই।

সমীর, জগন্নাথরা নেমে আসে পথে। স্টেশনের চত্বরে তখন ছিন্নমূল মানুষের ভিড়। ছায়ামূর্তির মত এদিক সেদিকে বসে আছে তারা, এই উৎসবে তাদের যেন কোন ভূমিকা নেই।

—বাবু গ!

কার ডাকে চাইল সমীর। ওদিকটায় আলো তত নেই। একটা বৃদ্ধা আর কয়েকজন বসে আছে। কেউ ওই পথের ধুলোতেই শুয়ে আছে পুটুলি মাথায়।

বৃদ্ধা বলে,—দুইটা টাকা দিবা বাবা। কাল থিকা ওগর মুখে কিছু দিতি পারি নি। এত বাদ্যি বাজি ফুটছে ক্যান? আমাগোর জন্যি তো চাট্টি চাউল দিতি পারতো! ফ্যানে ভাতে খাইতাম। দিবা বাবু?

সমীর থমকে দাঁড়ায়।

ওই স্বাধীনতা উৎসব যে আজ এদের কাছে অর্থহীন, ওই উৎসবের জন্যই এরা সর্বস্ব হারিয়েছে একথাও কেউ ভাবেনি। মহাদেবদার কথা মনে পড়ে-কিসের মূল্যে এই দয়ার দান পেলাম তা দেশের মানুষ বুঝবে পরে।

সমীর ওদের কিছু দিয়ে যেন এড়িয়ে চলে এল। পথে তখন জনস্রোত, জেগে আছে সারা মহানগর, এক যুগ পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণে কালরাত্রির প্রহর গণনা করছে সমীর।

কথাটা ভুলতে পারে না সমীর। তখন এখানের পত্র-পত্রিকায় ছোটগল্প প্রকাশিত হচ্ছে। টুইশানি আর করেনি। অবশ্য একটা ঘটনা তার মনকে খুবই বিচলিত করেছিল।

সেই দাঙ্গার কয়েকদিন পর মেসে ফিরেছে। রক্তাক্ত কলকাতার স্বাভাবিক রূপটা ক্রমশ ফিরে আসছে। জগন্নাথ, মৃগেন-সনৎবাবু, দিবাকররাও ফিরেছে মেসে।

সেদিন বৈকালে সমীর চলেছে কলুটোলায় তার সেই ছাত্রের বাড়ির দিকে। এদিকটা কেমন শুনশান। মুসলমান প্রধান এলাকা-তবে আবার কিছু হিন্দুর দোকানও খুলেছে। লোক চলাচল শুরু হয়েছে। তবে সকলের চোখে কেমন যেন অবিশ্বাসের সাবধানী চাহনি।

সমীর তার ছাত্র ফিঙেদের বাড়ির সামনে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়। বাড়ির সদর দরজাটা ভাঙা, দোতলার কাঠের খড়খড়ি দেওয়া পাল্লাগুলোয় আগুনের দাগ, কিছুটা পুড়েছে, কিছুটা ঝুলছে। দেখেই মনে হয় এই বাড়িটাই নয়। পাশাপাশি কয়েকটা বাড়িতেই হামলা হয়েছিল। এখনও তার চিহ্ন রয়ে গেছে।

হঠাৎ ফিঙের বাবাকে ওদিক থেকে আসতে দেখে চাইল সমীর। সেই নধর নাদুশ নুদুশ চেহারা আর নাই, শুকিয়ে গেছে। গলায় সোনার হারটাও নেই। পরনে একটা ময়লা ধুতি আর ফতুয়া। সমীরকে দেখেই ভদ্রলোক গর্জে ওঠে—অ্যাই পেয়েছি। আমার ফিঙেকে তুমিই মেরেছো? ব্যাটা শয়তান।

চমকে ওঠে সমীর। ভদ্রলোক গর্জায়।

—দলবল নে হামলা করবে? ঘরে আগুন দিয়ে লুটপাট করবে? গুষ্ঠীসুদ্ধকে কাটবে? চলো থানায়—অ্যাই পুলিশ—

লোকজন জুটে যায়। সমীর অবাক ওর ওই আচরণে।

একজন ভদ্রলোক এসে ফিঙের মারমুখী বাবাকে ধরেছে। বলে,—চলো অনিলদা, আমরা দেখছি। চলো।

অনিলবাবু বলে খবরদার ছাড়বি না ওকে। ওইই সেই খুনী-আগুন দিয়ে লুটপাঠ করেছিল। থানায় দে ওকে।

সেই ভদ্রলোকই সমীরকে বলে—আপনি শোনেননি কিছু মাস্টারমশাই?

—না তো! সমীর অবাক।

ভদ্রলোক বলে—ফিঙেদের বাড়িতে সেই দাঙ্গার সময় আক্রমণ হয়। বাড়িতে আগুন ধরিয়ে সব লুটপাট করে দাঙ্গার সময়। ফিঙেকেও তারা খুন করে যায়।

সমীর চমকে ওঠে—তাই নাকি!

—এরপর থেকেই অনিলদার মাথাটাই খারাপ হয়ে গেছে।

সমীর চলে আসে। তার মনে পড়ে গোলগাল ছেলেটার কথা। নিরীহ কত প্রাণ যে দাঙ্গায় এভাবে চলে গেছে তার খবরও কেউ জানে না।

..তারপর থেকে টুইশনিই আর করেনি সমীর। মাসে পনেরো টাকার জন্য প্রতিটি সন্ধ্যা তিন ঘণ্টার ওই যন্ত্রণাকে মেনে নিতে পারেনি সে। পড়াশোনা লেখালেখিই করে।

ক্রমশ ভারতবর্ষ-দেশ-এসব কাগজেও তার লেখা বের হচ্ছে। বৌবাজার স্ট্রিটে বসুমতী পত্রিকার অফিস। দেশ আনন্দবাজার পত্রিকার অফিস মেছুয়া বাজারের ঘিঞ্জি এলাকা বর্মন স্ট্রিটে।

সাগরময় ঘোষ তখন দেশ পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। সদালাপী একটি সজ্জন ব্যক্তি। তিনিই সমীরকে প্রথম ছাপার পৃষ্ঠায় এনেছেন, তাকে উৎসাহিত করেছেন আরও লিখতে। রবিবাসরীয় বিভাগের দেখাশোনা করেন মন্মথবাবু। তিনিও সমীরের লেখা ছাপছেন। ভারতবর্ষে রয়েছেন ফণীবাবু, তাঁর সহকারী দেবনারাণ গুপ্ত সমীরকে খুবই স্নেহ করেন। এখন ভারতবর্ষ সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত। শরৎচন্দ্রের পর তখন বাংলা সাহিত্যে তারাশঙ্করবাবু একজন সুপ্রতিষ্ঠিত লেখক। তিনি ভারতবর্ষে নিয়মিত লিখছেন।

প্রবাসী মাসিক পত্রিকার সুনামও প্রতিষ্ঠিত। এর আগে সম্পাদক ছিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। বিদগ্ধ গুণী মানুষ। রবীন্দ্রনাথ নিয়মিত লিখেছেন প্রবাসীতে। এই প্রবাসী পত্রিকায় ধারাবাহিক রূপে প্রকাশিত হয়েছে আরণ্যক, দৃষ্টিপ্রদীপ, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর লেখাও গোগ্রাসে পড়েছে সমীর।

মাঝে মাঝে শ্যামাচরণ দে স্ট্রিটের মিত্র ঘোষ-এর দোকানে দেখেছে অনেক রথী মহারথীদের। সকলেই সাহিত্য জগতের এক একজন সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্ব। দূর হতেই দেখেছে তাঁদের। তাদের মধ্যে সৌম্য প্রশান্ত চেহারার বিভূতিবাবুকেও দেখেছে। প্রণামও করেছে সমীর।

—কী নাম তোমার? কী করো?

সমীর জবাব দিতে স্নিগ্ধ হাসিতে প্রসন্নতা ছড়িয়ে বলেন বিভূতিবাবু—সাহিত্য সাধনা করার ইচ্ছা। খুব ভালো কথা। পড়াশোনা করো? এখানে কোথায় রয়েছো?

—সমীর বলে—কাছেই। একটা মেসে।

—মেসে আমিও ছিলাম হে। বেশ আনন্দেই দিনগুলো কেটেছিল। মির্জাপুরের ওদিকে একটা মেসে ছিলাম অনেকদিন।

—একদিন আসবেন আমার ওখানে? কাছেই।

বিভূতিবাবু বলেন—আসবো। দেখবে ঠিক আসবো। কাজকর্ম করো, আর অবসর তো অনেক। সাহিত্য পড়ো—শেখার চেষ্টা করো দেখবে ঠিক এগিয়ে যাবে।

বিভূতিবাবু তার মেসের একতলার ঘরে এসেছিলেন। সমীর ভাবতেই পারেনি এতবড় মাপের মানুষ আসবেন তার সেই একতলার ঘরে।

সেই পত্রিকায় প্রথম গল্পটা প্রকাশিত হয়েছে। সমীর হঠাৎ সেদিন ঘাটশিলা থেকে একটা চিঠি পায় বিভূতিবাবুর কাছ থেকে। সেই গল্পটি তিনি পড়েছেন আর পড়ে ভালো লেগেছে। মনে হয় সমীরের এযেন তার পরম পাওয়া। সাহিত্যগুরুর আশীর্বাদ।

সমীর লিখে চলেছে। প্রবাসীতে লিখতে হবে। একদিন গেছে প্রবাসী অফিসে। সার্কুলার রোডে একটা ইংরেজি ক্যাসেলের মিনি সংস্করণ এই বাড়িটা। গাছ-গাছালি ঘেরা সাহিত্যের এক তীর্থ। দোতলার বড় ঘরে এক ভদ্রলোক বসে কপি দেখছেন।

বেশ গোলগাল চেহারা, চোখে সেল ফ্রেমের চশমা। তরুণ সমীরকে ঢুকতে দেখে চাইলেন। সমীর বলে,

—একটা ছোট গল্পের পাণ্ডুলিপি এনেছিলাম—এটা দেখে ছাপার যোগ্য বিবেচনা করে যদি আপনাদের পত্রিকায় ছাপেন।

ভদ্রলোক সমীরকে আপাদমস্তক জরিপ করে দেখে বলেন,

—আমরা তো তরুণদের গল্প ছাপি না।

অর্থাৎ উঠতি সাহিত্যিকদের ঠাঁই ওখানে নেই। সমীর বের হয়ে আসছে। হঠাৎ কি ভেবে ভদ্রলোককে বলে—একটা কথা বলবো?

—কী? গম্ভীর স্বরে বলেন তিনি।

সমীর বলে—তাহলে কি দশ-পনেরো বছর পর প্রবাসী তুলে দেবেন?

ভদ্রলোক বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করেন—কেন?

আজ যাঁরা লিখছেন তাঁদের তো বয়স হয়েছে। সকলেই প্রবীণ। দশ-পনেরো বছর পর তা'দের অনেকেই থাকবেন না, তখন কাদের লেখা ছাপাবেন পত্রিকায়?

ভদ্রলোক সমীরের কথায় গুম হয়ে বসেন।

—হুম। ঠিক আছে লেখাটা রেখে যান। দেখবো।

সমীর লেখাটা জমা দিয়ে বের হয়ে আসে। এটা যেন তার কাছে একটা চ্যালেঞ্জই। এখানেও লেখা তাকে ছাপাতেই হবে নিজের যোগ্যতায়।

শ্যামলীর বাবার চিঠি আসে, শ্যামলীও লিখেছে সমীরকে। সে কলকাতায় এম-এ করতে আসবে। এখানে লেডিস মেসে একটা ঠাঁই দরকার।

শ্যামলীর এক দাদা সদর শহরের ডাক্তার। ওখানেই থাকে, বিয়ে-থা করে সেখানেই বাড়ি করেছে। প্রাকটিশও বেশ জমেছে।

শ্যামলী বি-এ পাশ করেছে অনার্স নিয়ে। পড়াশোনায় সে ভালোই। বিভূতিবাবুর স্ত্রী অনেকদিন থেকেই শ্যামলীর বিয়ের কথা ভাবছিল।

এমনিতে সাধারণ ঘরের মহিলা। গ্রামেই থাকে ঘর সংসার নিয়ে। মা বলে বিভূতি ভটচায মশায়কে,

—এবার মেয়ের বিয়ে দাও ভালো পাত্র দেখে, নিজের ঘর সংসার করুক। মেয়ে ছেলের এত পড়ে কী হবে?

শ্যামলী তখন শহরে দাদার কাছে থেকে বি-এ পড়ে। সুন্দরী—বাবার অবস্থাও ভালো। তাই সহরের দু' একজন তরুণও চায় শ্যামলীকে বিয়ে করতে।

সেই যুবকদের একজন নিখিল। তার বাবার লোহা সিমেন্টের বড় কারবার। নিখিলের বাবা গোবিন্দবাবু শহরের নামী লোক। কংগ্রেসের নামে দেশসেবা করে টরে।

আর এখন দেশ স্বাধীন হতে গোবিন্দবাবুর রমরমাও বেড়েছে। শহরের লোকের কাছে

গোবিন্দবাবু জাহির করেন যেন তাঁর জন্যই এই শহরে ব্রিটিশ রাজ্যের অবসান ঘটেছে।

এবার ভোটেও দাঁড়াতে চান তিনি। তার জন্য কলকাতাতেও দরবার করছেন। তস্য সুপুত্র নিখিল কোনরকমে টুকে মাধ্যমিক পাশ করেছিল। এখন বাবার দৌলতে জেলার নামী কনট্রাকটার।

বড় বড় রাস্তা—বাঁধের কাজ, সরকারি অনেক ব্যাঙ্কে ছাতার মত অফিস গজিয়ে উঠছে, সেইসব বিভাগের অস্তিত্বই ছিল না। তারজন্য বাড়ি-গুদাম-সাহেবদের কোয়ার্টার এসব গড়া হচ্ছে—নিখিল এর কোম্পানিই লাখ লাখ টাকার এইসব গড়ার কার্য করছে।

একটা জিপ নিয়ে নিখিল শহর দাবড়ে ফেরে। ফুল ফুটলে যেমন মধুর লোভে ভ্রমর আসে-তেমনি হঠাৎ গজিয়ে ওঠা সমাজের এই নতুন প্রভুদের আশপাশেও মৌমাছির মত স্তাবকের দল জুটতে দেরি হয় না।

নিখিলের জিপেই তারা ঘোরে। সন্ধ্যায় কোন হোটেলের ঘরে মদের আসরও বসে। নিখিলের হাতে এখন অনেক বেহিসেবী টাকা আসছে। তার থেকে কিছুটা এই বন্ধুদের জন্যই খরচ করে।

নিখিলের নজর পড়ে শ্যামলীর উপর।

কলেজ থেকে ফেরে শ্যামলী দাদার বাসায়। সামান্য পথই।

শহরের এদিকটা নির্জনই। কাল কপিশ প্রান্তর এককালে ছিল শাল মহুয়ার বেশ কিছু প্রাচীন গাছ।

স্বাধীনতা উৎসাহ শহরেও হয়েছিল। গোবিন্দবাবুর উদ্যোগে বিরাট মিছিলে পটা-ঘটা-হারু-নারুব দলও শামিল হয়ে স্বাধীন ভারতের জয়ধ্বনি দিয়ে গোবিন্দবাবুকে বাধিত করেছিল।

তার কদিন পরই ওই হারু বাবুর দলই মজুরি বাবদ কয়েকটা শালগাছই রাতারাতি সাফ করে দেয়। ক্রমশ তারাই ওই গোবিন্দবাবুর ভোটে কাজ করে দেশসেবা করার মজুরি বাবদ ওদিকে দামী গাছগুলোকে শেষ করেছে।

নিখিলও বলে—খুঁটে খাচ্ছিস খা। তবে বাবার ভোটে যেন জিত্ হয়।

পটু বলে—ওর জন্য ভেব না। ভোটের কাছ অবধি কাউকে এগোতে দেব না। সব ভোট দেব আমরাই।

নিখিল সেদিন দেখে শ্যামলীকে কলেজ থেকে ফিরছে। পরনে ধানি রং-এর শাড়ি। সুন্দর ফর্সা রং। রোদে রঙিন ছাতা মাথায় দিয়ে চলেছে। সেই ছাতার আভা পড়ে ওর মুখে। আরও স্বপ্নময়ী করে তুলেছে শ্যামলীকে।

নিখিল বলে—মালটি কে রে?

পটু সব বিষয়েই পটু। সেইই বলে ওই যে শান্তি ডাক্তারের বোন গো।

নিখিল দেখছে ওকে। শ্যামলী ঘামছে চড়া রোদে। নিখিল জিপ থামিয়ে বলে,

—এত রোদে ফিরছো, চল পৌঁছে দিই।

শ্যামলী দেখছে নিখিলকে। ছেলেটাকে চেনে সেও তার ওই কুখ্যাত দলবলকেও, ইদানীং শহরের ধনী ব্যক্তির সন্তান, নিজেও কি সব করে। মুখে চোখে একটা কাঠিন্য।

শ্যামলীর প্রথম নজরেই ভালো লাগে না ওকে। বলে সে

—থাক। ওই তো বাড়ি। চলে যেতে পারবো।

এগিয়ে যায় সে। নিখিল দেখছে। পটুও বুঝেছে ব্যাপারটা। বলে সে,

—মজে গেলে নাকি বস্? ভয় নাই। দ্যাখো না যদি হাতে আনতে পারো। সব খোঁজ খবর আমি এনে দোব।

. সেইসব খোঁজখবর নিয়ে সে গোবিন্দবাবুকেই দেয়। পরীক্ষা হয়ে গেছে শ্যামলীর। শ্যামলী দেশের বাড়িতে এসে রয়েছে। এর মধ্যে সমীর গ্রামে এসেছে। শ্যামলীও পড়েছে সমীরের কিছু লেখা। তাদের বাড়িতেই কিছু পত্র-পত্রিকা আসে। সেদিন ক্লান্ত দুপুর। এসময় গ্রামে একটা স্তব্ধতা নামে। জেগে ওঠে বাগানের ছায়ায় ঘুঘুর ডাক।

শ্যামলী পড়ছে সমীরেব গল্পটা। সেও খুশি হয়েছে নামী পত্র-পত্রিকায় সমীরের লেখা প্রকাশিত হচ্ছে মাঝে মাঝে এই চরিত্র দুটোকে সে চেনে। পাশের গ্রামের দুটো ছেলে। অসহায় অনাথ দুটো ভাই জীবনের যুদ্ধে তারাও এখন থেকেই শামিল হয়েছে। গল্পটা শ্যামলীর মনকে স্পর্শ করে। ভারতবর্ষে প্রকাশিত হয়েছে একটি নির্যাতিত বিধবার কাহিনী।

চরিত্রটা তার খুব চেনা। ভাদুবৌদির কথাই লিখেছে সমীর। এই ভাদুবৌদি অকালে বিধবা হয়ে দেওরের দয়ায় পড়ে আছে। একটি নারীর মর্মবেদনাকে নিপুণভাবে বিবৃত করেছে সমীর।

ভাদুবৌদিকেই সেদিন শ্যামলী দুপুরে ডেকে এনে গল্পটা শোনায়। ভাদুবৌদির কোন ছেলেপুলে নেই। দেওরের ছেলেকেই সে একান্তে কাছে পেতে চায়। সেখানেই সংঘাত-বেদনা।

ব্যর্থ মাতৃত্বের বেদনাকে তুলে ধরেছে সমীর। ভাদুবৌদি বলেন,

—সমীর এসব কথা জানলো কেমন করে রে?

চোখের জল বাধা মানে না ভাদুবৌদির। শ্যামলী বলে,

—লেখকরা মানুষের মনটাকে জানতে পারে।

ভাদুবৌদি বলে,—ওর সোনার দোয়াত কলম হোক রে।

সমীর ক'দিনের জন্য গ্রামে এসেছে। শ্যামলীও এসেছে ওদের বাড়িতে। বলে—তোমার পাঠক এখন বেড়েছে সমীদা? দারুণ লিখছো। বলিনি—একদিন নাম করবেই।

সমীর বলে—চেষ্টা করছি মাত্র।

শ্যামলী বলে—মানুষের কথাই বলবে সমীদা—যাদের কথা কেউ বলেনি। তাদেরও মন প্রাণ মানবিকতা আছে।

সমীর বলে সাহিত্যেব কচকচি থামাও তো। তোমার পরীক্ষা কেমন হলো? অনার্স থাকবে তো?

শ্যামলী বলে—থাকবে আশা করি। আর কলকাতায় যেতেই হবে। এম-এটা করবো। তারপর রিসার্চ করার চেষ্টাও করবো। পরীক্ষার ফল বের হলেই জানাবো।

গ্রামের বিভূতি ভটচাযের স্ত্রী কিন্তু মেয়ের এসব কথা শুনে অবাক হয়। বলে,

—সে কিরে কলকাতায় যাবি পড়তে? ওই শহরে একা মেয়েছেলে থাকবি কোথায়? না-না বাপু। এসব কথা বাপের জম্মে শুনিনি। ওসব মতলব ছাড়। স্বামীকেও বলে,

—মেয়ের ঘাড়ে ভূত চেপেছে। ওর বিয়ে-থা দিয়ে এবার সংসারী করো বাপু।

ভালো পাত্র দ্যাখো। এম-এ পাশ করলে তখন ওই মেকদারের পাত্রও পাবে না সহজে। ওই বি-এ পাশ দেবে, এই ঢের। বিয়ের কথা ভাবো।

শ্যামলীর বাবা বিভূতি ভটচায মশায় মেয়েকে স্নেহ করেন। তিনি বাইরের জগতটাকে দেখেছেন তাই বলেন, পড়তে চায় পড়ুক না। আজকাল মেয়েরাও পড়াশোনা করছে ছেলেদের মতই।

শ্যামলীর মা বলে—মেয়েকে তুমিই মাথায় তুলেছো।

এমনি দিনে গোবিন্দবাবুই শহর থেকে খোঁজ খবর নিয়ে এসেছে। অবশ্য গোবিন্দবাবু এখন ভোটে দাঁড়িয়েছে। এদিকে বিভূতিবাবুর জনপ্রিয়তা খুব। তাই গোবিন্দবাবু হিসাব করে দেখেছে বিভূতিবাবুকে হাতে পেলে এদিকের সব ভোট সেইই পাবে।

তাই গোবিন্দবাবু ও তস্যপুত্র নিখিলের দেখা এই মেয়েটিকেই তার ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে বিভূতিবাবুকে হাতে পেতে চায়। শ্যামলীর মাও খুশি হয়। এত বড় ঘরে মেয়ের বিয়ে হবে। মালক্ষী গোবিন্দবাবুর ঘরে বাঁধা। আর ছেলেও বড় ব্যবসা করছে। গোবিন্দবাবু ভবিষ্যতে মন্ত্রীও হতে পারে।

তাই গিন্নী বলে—ওগো এখানেই কথা দাও। মেয়ে সুখে থাকবে। ওর ছেলেও বড় কনট্রাকটার।

শ্যামলীই বলে—ওখানে বিয়ে হতে পারে না মা। ওই ছেলেটা একনম্বর পাজি। শহরে ওর অনেক বদনাম। তাছাড়া ওতো শুনেছি টি. টি.-এম-পি।

—মানে? মা অবাক হয়।

শ্যামলী বলে—টুকেটাকে ম্যাট্রিক পাশ। ওখানে বিয়ে করতে হবে?

বিভূতিবাবু অবশ্য গোবিন্দবাবুকে বলেন—এতো সুখের কথা গোবিন্দবাবু। তবু আজকালের মেয়ে। তার মতামত নিতে হবে। বাড়িতেও আলোচনা করে জানাবো আপনাকে।

গোবিন্দবাবু বলে—ঠিক আছে। তাই জানাবেন। পরে খবর নোব। এবার মা-ই বলে শ্যামলীকে—বিয়ে করবি না ওখানে? কেন? শ্যামলী বলে—টাকা আছে বলেই কি একটা অমানুষকে বিয়ে করতে হবে? যেমন বাপ—তেমনি ছেলে। আমার জন্য ভাবতে হবে না। বিয়েতে যেটা খরচ করবে তার কিছুটা আমার পড়ার জন্য খরচ করো। তারপর আর তোমাদের আমার জন্য ভাবতে হবে না। নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবো।

এমনি দিনে শহর থেকে শ্যামলীর পাশের খবরটাও আসে। ফার্স্টক্লাস অনার্স নিয়েই পাশ করেছে শ্যামলী। শ্যামলীর যেন এবার কথা বলার অধিকারও এসেছে। বলে সে।

—বাবা। কলকাতাতেই পড়বো। ওখানে লেডিজ মেসে থাকার ব্যবস্থাও হয়ে যাবে।

মা বলে—তোমাদের যা ইচ্ছা করো।

শ্যামলীর বাবা বিভূতিবাবু বলেন অমত করো না শ্যামলীর মা। ওকে ওর পক্ষেই যেতে দাও। ভালো-মন্দ বোঝার ক্ষমতা ওর হয়েছে।

সমীর রোহিণীকেই এখন প্রকৃত বন্ধু বলে মানে। ওর বাড়িতেও যায়। কলকাতার

একপ্রান্তে এখনও এখানে বাঁশবন—আশশেওড়ার জঙ্গল, নারকেল কলা গাছের ভিড় আছে। শহরতলি এতদিন একেবারে ফাঁকাই ছিল। এখন পূর্ববঙ্গ থেকে আসা মানুষদের অনেকেই এদিকে জায়গা কিনেছে।

তবু এখনও সবুজ কিছু আছে। রয়েছে কয়েকটা শিউলি ফুলের গাছ। এখনও বিদায়ী শরতে সেখানে শিউলির সুবাস ওঠে— অনেক স্মৃতি জড়ানো রয়েছে ওই সুবাসে। গাঁচপুরের দিনগুলোকে ভোলেনি আজও মনে পড়ে সেখানে শরতের সকালে ছোট্ট সমীর শিউলি ফুল কুড়োতে যেতো দিদির সঙ্গে।

ঢাকের বাদ্যি বাজতো—নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলা। সেই দিনগুলো—সেই পাঁচপুর থেকে একদিন তাদের বিদায় নিতে হয়েছিল। সব হারিয়ে ছিন্নমূল হয়ে যাত্রা শুরু করেছিল সে এক নতুন দিগন্তের সন্ধানে।

রোহিণীর গানও গ্রামোফোন কোম্পানি নির্বাচিত করেছে। কিছু রেকর্ডও করেছে তারা। তখনকার বিখ্যাত গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে সেই গান গেয়েছেন তার গান শুনে শচীন দেববর্মণও ডেকে পাঠিয়েছেন রোহিণীকে। রোহিণীও থেমে নই।

সমীরও ওর কৃতিত্বে অনুপ্রাণিত হয়। রোহিণী বলে,

—লড়ে যাও সমীর। থামবে না। হার-জিত থাকবেই—তবু থামবে না।

অফিসেও তাদের আলোচনা হয়। ক্যানটিনে দীপক মিত্র, নীলু সুজিতেরও আলোচনা করে। এর মধ্যে তারাও জেনেছে সমীর রোহিণীদের লেখা-গানের কথা। নাট্যকার-গীতিকার কাম অভিনেতা সুজিত বলে,

—নাটকে তিন খানা গান যা লিখেছি। কি রে দীপক?

দীপক এখন নাটকের দল গড়ে নাটক এবং রিহার্সেল নিয়েই ব্যস্ত। বলে সে,

—দেখবি এই গান এর কি প্রয়োগ করেছি। কানাকেষ্ট কি গাইবে—? তোর গান ফাটিয়ে দেবে সুজিত।

এরা দুজনে শোনে এদের কথা। সেদিন দীপক এদের দুখানা কার্ড দিয়ে বলে—পাঁচ টাকা করে ডোনেশন দে। যাবি কিন্তু নাটক দেখতে বিশ্বরূপায়।

সমীর বলে—পাঁচটাকা দিতে হবে?

নীলু বলে—আরে বোর্ডের নাটককে টেক্কা দেবার মত নাটক। অভিনয়ও যা হবে। পাঁচটাকা তার তুলনায় নাথিং।

রোহিণী সমীর ওদের নাটক দেখতে গেছে। পর্দা আর ওঠে না। হলে নিজেদের চেনা জানা—আত্মীয়স্বজনদেরই এনেছে সদলবলে। সমীর দেখে. মনে হয় সুজিত, দীপকরা সত্যিই ভাগ্যবান। তাদের কাজে উৎসাহ দেবার লোকের অভাব নাই।

সমীর সেখানে তার সৃষ্টির জগতে নিঃসঙ্গ একাই। সেখানে তার কাজের তারিফ করার কেউ নাই। অন্তরের তাগিদেই মেসের এক এঁদো ঘরে সে সাহিত্যকর্ম করে একান্তে। তার তুলনায় এরা কত ভাগ্যবান।

কর্মকর্তারা ব্যাচ লাগিয়ে ছুটোছুটি করছে। শেষ অবধি আধঘণ্টা পর পর্দা ওঠে। এদের

নাটক শুরু হয়। দীপক-নীলু-সুজিতও অভিনয় করছে আর প্রতি দৃশ্যে হাততালির শেষ নাই। এর মধ্যে দু' একজন সুজিত-দীপক এর নামে মেডেল দেবার প্রতিশ্রুতি দেয়।

রোহিণী বলে—সমী চল বাইরে চল। সমীরও ছটফট করছে। নাটকের গতিও নাই। চরিত্রের কোন সম্পূর্ণতাও নাই। পার্টও ভুলে যাচ্ছে—

ওরা বের হয়ে আসে। রোহিণী বলে.

—এর নাম শিল্প? নিষ্ঠা নাই—প্রচারই সর্বস্ব।

সমীরেরও মনে হয় এর চেয়ে ভালো নাটক সে লিখতে পারে। কিন্তু তার প্রকাশ পথ সে চেনে না। রোহিণী বলে.

—গল্প লিখছিস—তাই লেখ। উপন্যাস লেখ। দেখবি ভালো গল্প হলে ঠিক সিনেমাতে যাবে। বড় ক্ষেত্রে যাবার কথা ভাববি-আমিও সিনেমাতেই গান লিখবোই একদিন। এত অল্পে থেমে যাবি না।

তারপরদিন অফিসে ঢোকে সুজিত, দীপকরা বিজয়ীর মত। ক্যানটিনে শুধোয়—ক্যামন নাটক দেখলি রে সমী?

দীপক বলে---অভিনয়? একেবারে শিশির ভাদুড়ির স্টাইলেই অভিনয় করেছি।

সিগ্রেট টানছে সে। নীলু বলে—সিগ্রেট দে।

দীপক প্যাকেটটা টেবিলের নীচে ফেলে দিয়ে বলে,

—সরি, সিগ্রেট আর নাইরে।

ওদের আলোচনা চলে। কালকের নাটক দারুণ হয়েছে। সুজিত বলে,

—এবার নাটক যা লিখছি দারুণ। কোথায় লাগে শচীন সেনগুপ্ত, বিধায়ক ভটচার্য।

দীপক বলে—এনাউন্স করে দে এবার রিহার্সেল শুরু করি। নীলু চলে যায়। সমীর দেখে নীলু চলে যেতে এবার দীপক টেবিলের তলে ফেলে দেওয়া সিগ্রেটের প্যাকেটটা তোলে। ওতে বেশ কয়েকটা সিগ্রেট রয়েছে। সমীর অবাক হয়।

—তখন নেই বলে ফেলে দিলে যে।

হাসে দীপক—ওরে বাবা ওকে দেখালে সব কটা খেয়ে ফেলতো। গোল্ড ফ্লেক সিগ্রেটের দাম জানো?

সমীর চুপ করে থাকে।

এর ক'দিন পরই অফিসের গেটে এক জবরদস্ত কাবুলিওয়ালাকে দেখা যায়। পরণে পায়জামা কুর্তা আর মাথায় পাগড়ি, হাতে ইয়া লাঠি নিয়ে গেটে দণ্ডায়মান।

দীপক ঢুকছে—কাবুলিওয়ালা তাকেই ধরেছে।

—এ দীপকবাবু, মেরে আসলি তো দিল না, সুদভি নেহি দিয়া। দাও সুদ নেহিতো নেহি ছোড়েগা।

সুজিত ঢুকছিল। সে দুর থেকেই কাবুলিওয়ালাকে লাঠি ঠুকতে দেখে এ্যাবাউট টার্ন করে পালায়। ধরা পড়েছে নীলুও। দাও সুদ।

দীপক নীলুরা কদিন থেকেই মেন গেটে কাবুলিওয়ালাকে মজুত থাকতে দেখে পিছনের গেট দিয়ে ঢুকেছে। আজ কাবুলিওয়ালা ধরেছে তাদের ক'দিন চেষ্টার পর।

কোনরকমে রেহাই পেতে চায়।

সমীর, রোহিণীও ঢুকছে দেখে ব্যাপারটা। কাবুলিওয়ালাও গর্জায়।

উধার সে ঘুসতা হ্যায়। ইধার সে নিকালতা হ্যায়। আজ পাকড়া। নেহি ছোড়েগা।

সেদিন পকেটে যা ছিল তাই দিয়ে পরে দেবার কথা দিয়ে অফিসে এসে দীপক, নীলু এবার সুজিতকে ধরে।

তখন বললি তোর নাটক করলে পাঁচশো টাকা দিবি, তাই ছাতার নাটক করলাম কাবুলিওয়ালার কাছে টাকা নিয়ে। এখন বলছিস টাকা দিবি না? ইয়ার্কি। টাকা দে।

সুজিত বলে—এত দোব বলিনি। তোরাও তো অভিনয় করলি? টাকা দিবি না?

ওদের মধ্যেই এবার বাধে। নাটকের দমের এ পরিসমাপ্তি ঘটবে এবার। দীপক বলে—তোর মত নাট্যকারের ইয়ে করি।

সুজিতও গর্জে ওঠে— ভারি আমার 'লটসূর্য'রে?

রোহিণী বলে সমীরকে—কিছু বুঝলে?

সমীর বলে—কিছুটা বুঝেছি। তাই ভাবছি সস্তা হাততালির দরকার নাই।

রোহিণীর এক আত্মীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভালো পোস্টেই কাজ করেন। সমীর সেদিন শ্যামলীর পাস করার চিঠি পেয়েছে। শ্যামলী ইংরাজিতে অনার্স পেয়েছে। এবার এম-এ তে ভর্তি হতে চায়। তার ব্যবস্থা করতে হবে। লেডিজ হোস্টেলেও সিট চাই।

রোহিণীই বলে—ভুবনদার ওখানে চলো, একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

সমীর এসেছে ভুবনবাবুর কাছে। বিশ্ববিদ্যালয় আশপাশেই তার অফিস। তিনিই শ্যামলীর মার্কশিট, ইত্যাদি দেখে ফর্মও আনিয়ে দেন ভর্তি হবার জন্য আর আশা দেন লেডিজ হোস্টেলে সিটও পাবে।

সমীর আজ রোহিণীর কাছে কৃতজ্ঞ। সে না থাকলে এসব কাজ এত সহজে হতো না। সমীর তেমন কাউকে চেনেও না। তবু রোহিণীর জন্যই এসব সম্ভব হয়েছে।

আজ সমীর দেশের বাড়িতে শ্যামলীকে ফর্মটাও পাঠিয়ে দেয়। জানায় তার থাকার ব্যবস্থাও হয়ে যাবে লেডিজ হোস্টেলে। শ্যামলী কলকাতায় আসবে। সমীরের কথাটা ভাবতেও ভালো লাগে। তার গ্রাম থেকে এই প্রথম একটি মেয়ে এতদিনের অচলায়তনকে ভেঙে বের হয়ে আসছে বাইরের জগতে।

সমীর এর মধ্যে বরণ্য কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণের আরও সান্নিধ্যে এসেছে। কলকাতায় এসে সে এবার এতদিন ধরে যাদের গল্প-উপন্যাস পড়ে মুগ্ধ হয়েছে সেই সৃজনশীল সাহিত্যিকদের অনেকের সঙ্গে অযাচিতভাবে দেখা করেছে।

সাহিত্যিক সুবোধ ঘোষকে দেখেছে দেশ পত্রিকার অফিসে। তখন ওই পত্রিকার অফিস মেছুয়াবাজারের ঘিঞ্জি জলপট্টির একটা পুরনো বাড়িতে। ওরই একদিকের দোতালায় ওরা বসেন। 'ফসিল' এর লেখককে সেখানেই দেখে।

গিয়েছে তারাশংকরবাবুর বাড়িতে। তখন বাগবাজারে আনন্দ চ্যাটার্জি স্ট্রিটের একটা বাড়িতে থাকেন তিনি। ওদিকেই থাকেন প্রখ্যাত শিল্পী যামিনী রায়।

রোহিণীর গান সাহিত্যিক চিত্রপরিচালক শৈলজানন্দ তাঁর ছবিতে নিচ্ছেন। সেই সুবাদে

রোহিণীর সঙ্গে তাঁর বাড়িতেও গেছে। মহাপ্রস্থানের পথের লেখক প্রবোধ সান্যাল থাকেন তখন বেলগাছিয়ার খালের কাছাকাছি একটা বাড়িতে।

সাহিত্যকে ভালোবাসার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যিকদেরও সে শ্রদ্ধা করে। এসেছে কথা সাহিত্যিক বিভূতিভূষণের সান্নিধ্যে। সবুজ সরল প্রাণখোলা একটি মানুষ। সহজেই আপন করে নিতে পারেন।

তারাশঙ্করবাবুর পরিবেশে মানুষ হয়েছিল সমীর। সেই পাঁচপুরের কাছেই তারাশঙ্কর বাবুর গ্রাম লাভপুর। ওরা ময়ূরাক্ষী নদী পার হয়ে ট্রেন ধরতো ওই লাভপুরেই। সেই লাল মাটি, ছোট স্টেশন, গ্রীষ্মে ফুটতো কৃষ্ণচূড়ার লাল ফুল—সেই জগৎ, ওখানের ওই মানুষটির সঙ্গে যেন একটা আন্তরিক মেলবন্ধনই ছিল তার। সেই রাঢ় বাংলার মানুষের সুখ-দুখের কথাই তিনি লিখেছেন যে মানুষ যে জীবন একদিন ছিল সমীরের জীবনের সঙ্গে জড়িত। সমীরকে তিনি মানুষকে দেখতে শিখিয়েছেন। মানুষটির বাইরে কঠিন, অন্তর স্নেহপ্রবণ।

বিভূতিভূষণবাবুর স্নেহ প্রীতি অন্তর ছাপিয়ে বাইরে প্রসারিত তাই শিক্ষক হিসাবে তিনি ছাত্রদেরও খুব কাছের মানুষ।

সেদিন চৈত্রের শেষ। দেশ বিভাগ তখনও হয়নি। তবে তার উদ্যোগ চলছে। তখন শিয়ালদহ থেকে খুলনা মেল ছাড়তো দুপুরে।

সেই ট্রেনে চলেছে সমীর। বারাসাত পার হয়ে লাইনের দুদিকে বন—বেতবনও রয়েছে। পরিত্যক্ত জলা-বনভূমি গোমো হাবড়ার ওখানে মহাযুদ্ধের স্মৃতি হিসাবে রয়েছে পরিত্যক্ত এয়ার স্ট্রিপ। কিছুদিন আগেও ছিল আমেরিকান সেনাদের ছাউনি। এখন স্তব্ধতা নেমেছে। ওই শূন্য প্রান্তরে কিছু মানুষ এসে ঝুপড়ি বাঁধছে।

বনগা থেকে রানাঘাট এর একটা লাইন গেছে। পরের স্টেশন গোপালনগর। ছোট্ট স্টেশন, ফাল্গুনের শেষ, বসন্তকাল। বাঁশবনে ঝরাপাতার গৈরিক, গাবগাছগুলো ভেলভেট রংএর পাতায় সেজে উঠেছে। বাতাসে আমের বোলের সুবাস।

সমীর স্টেশনে নেমে লোককে শুধোয় চাল্‌কে বারাকপুরের পথের হদিস. এপথ যেন তার খুবই চেনা।

টানা ধূসর সড়ক বেঁকে গেছে, বাঁ দিকে বাওড়ের কালো জল। দু' একটা অশত্থগাছ নতুন পাতায় সেজে উঠেছে। পথটা থেকে একটা পায়েচলা পথ ডানদিকে ঢুকেছে আমবাগানে। বাতাস সেখানে মুকুলের সৌরভে আমন্থর, মৌমাছির গুনজনে মুখরিত। আশশেওড়া-গাবভেগুার জঙ্গলের মধ্যে পায়ে চলা পথটা গেছে।

সমীরের মনে হয় যেন পথের পাঁচালীর দেশেই এসেছে সে। হয়তো কোন বাঁশবনের ওদিকে দেখা যাবে আজকের কোন অপুকে, দুর্গাদের। হয়তো দেখা যাবে জরা ভারাক্রান্ত কোন ইন্দির ঠাকরুণকে পুটুলি বগলে ক্লান্ত পদক্ষেপে চলেছে।

যেমন মনে হয়েছিল তার লাভপুর স্টেশনে—হয়তো পড়ন্ত রোদে দিঘীর পাশ দিয়ে দুধের ঘটি মাথায় আসবে ঠাকুরঝি—হয়তো শোনা যাবে নিতাই কবিয়ালের গান—জীবন এত ছোট ক্যানে।

....সমীরের মনে হয় চিরন্তন সাহিত্যের যোগ মাটি-প্রকৃতি আর মাটির মানুষের সঙ্গে।

এই প্রকৃতি সহজেই এসেছে বিভূতিবাবুর সৃষ্টিতে স্বমহিমায় রূপায়িত হয়ে।

একটা পুরনো একতলা বাড়ি। সামনে একটা বকুল গাছ—বিশাল বকুল। বয়স তার অনেক। নীচেটা বাঁধানো। চারিপাশ ঝরা বকুলের সৌরভে আমন্থর। আম-বকুল-কাঁঠাল ফুলের মো মো সুবাস। সামনের রকে বসেছিলেন সৌম্যদর্শন মানুষটি। সমীরকে দেখে খুশিতে ফেটে পড়েন-এসো, এসো সমীর। মনটা খুব খারাপ লাগছিল হে। ছেলেরা সব চলে গেল। একাই বসেছিলাম। তুমি এসেছো ভালোই হয়েছে।

তখনও তার সংসারে তার ভাগ্নী দুর্গা আর ভাগ্নে এবং বিভূতিভূষণবাবুর স্ত্রী এই ক'জনই। তাই সমীর বলে—ছেলেরা চলে গেল? কারা?

এবার বিভূতিভূষণবাবু বলেন—আরে স্কুলের ম্যাট্রিকের ব্যাচ। এদের ফাইনাল পরীক্ষা শুরু। রানাঘাটে সেন্টার পড়েছে। এতদিন এতগুলো বছর স্কুলে ছিল। এবার চলে গেল। এদের দুপুরে খেতে বলেছিলাম। এই গেল সব। বসো।

এর মধ্যে বিভূতিভূষণবাবুর স্ত্রীও এসেছেন। সমীর প্রণাম করে। স্নেহময়ী মহিলা বলেন—হাত-মুখ ধোও। চা জলখাবার আনি।

বৈকাল নামছে। বিভূতিভূষণবাবু বলেন,—চলো তোমাকে ইছামতীর ঘাট, নীলকুঠির মাঠ-বাঁওড়ের ধার দেখিয়ে আনি।

গ্রামে কোন অতিথি গেলে গৃহস্থ তাকে তার নিজের বাগান, খামার-জমি জারাত, পুকুর, এসবই দেখায়। তার ঐশ্বর্যের পরিচয়। কিন্তু বিভূতিবাবুর প্রিয় ঐশ্বর্য এই নদী-প্রান্তর-প্রসারিত বাঁওড়। তাঁর সাহিত্যে তারাই এসেছে বারবার।

সমীরের পড়েছে ওই সব জায়গাগুলোর কথা। আজ নিজের চোখে দেখছে সেই অমর সাহিত্য আর উপাদানকে। তারাশঙ্করবাবুর সাহিত্যের পটভূমিকা-তার চরিত্র এসব গুলোকে সে দেখেছে। আজ দেখছে তার এক স্রষ্টার জীবনচর্যা—তার সৃষ্টির পটভূমিকাকে এযেন তার কাছে এক পরম প্রাপ্তিই।

ঘনসবুজ বন, নানা লতা গুল্মের সমাবেশ। ইছামতীর কালোজলে পড়ন্ত রোদের আভা। একটা শিমুল গাছ ফুলে ভরে রয়েছে। ইছামতীর ধার থেকে বনের পথে এসে একটা প্রান্তরে দাঁড়ালেন তিনি। একটা কুলগাছ সুবর্ণলতার পুঞ্জে আবৃত হয়ে আছে নীচে অবধি, হলুদের স্তূপ। বিভূতিবাবু বলেন—সমীর ওর নীচে ক'খানা তালের বোগড়ো আছে-দুটো বের করো।

সমীর গ্রামের ছেলে-তাই অনায়াসেই হলুদলতার বেষ্টনী ভেদ করে গাছের নীচে রাখা দুখানা তালগাছের পাতার গোড়ার দিক-তাই বের করে। দুটো বোগড়ো দুজনে নিয়ে চলেছে। বাওড়ের জলে সূর্যের শেষ আলো পড়েছে। ওপরের গ্রামসীমার ঊর্ধ্বে ডুবন্ত লাল সূর্য-পাখিদের কলরব জাগে স্তব্ধ দিগন্তে—একটা তৈলহীন গরুর গাড়ির চাকার আর্তনাদ তুলে চলেছে।

স্তব্ধ দিগন্ত—বাঁওড়ের ধারে স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন বিভূতিবাবু, যেন ধ্যানমগ্ন কোন উপনিষদের কালের ঋষি। প্রকৃতির অনুপম রূপজগতের অসীমে তিনি আত্মবিস্মৃত, ধ্যানমগ্ন।

সমীরের সেই অনুভূতি নাই। মশার কামড়ে ছটফট করছে। অধৈর্য হয়ে উঠছে। সেই তন্ময়তা তার নেই।

কিছুক্ষণ পর বিভূতিভূষণবাবুর চমক ভাঙে। বলেন,—চলো. ওঠা যাক।

দুজনে আসছে। সেই তালের বোগড়ো দুটো যথাস্থানে রাখা হলো। ওগুলোর প্রয়োজন রোজই হয় তাঁর। দুজনে ফিরছে। সন্ধ্যা নেমেছে। গ্রামের কাছে বাঁশবনে ঝরাপাতার স্তূপে কে আগুন দিয়েছে। নীচের ঝোপ-জঙ্গল পুড়ছে। দেখেই বিভূতিবাবু থমকে দাঁড়িয়ে গলা তুলে হাঁক দেন।

—কানাই। কানাই।

ঝোপের ওদিকে একটা ঝুপড়ি থেকে একটা লোক বের হতেই তিনি বেশ রাগতভাবে বলেন,

—বাঁশঝোপে আগুন লাগালি কেন?

কানাই বলে—দা ঠাউর, ঝরাপাতাগুলো পুড়ে আপনার বাঁশবন আরও তেজী হবে। অনেক তেউড় বেরুবে—বাঁশ হবে।

বিভূতিভূষণবাবু বলেন।

—তুই তো সাংঘাতিক লোক রে। ক'টা বাঁশের জন্য নীচে কত সুন্দর ঘেঁটুফুল ফুটেছিল সেই ফুলগুলোকেই পুড়িয়ে দিলি। হতভাগা?

বাঁশ ভালো হবে সেটা তাঁর কাছে তুচ্ছ, তিনি ক্ষুব্ধ ঘেঁটুফুলের বনকে পোড়াবার জন্য। সমীর এক সত্যিকার প্রকৃতি প্রেমিককেই আবিষ্কার করে, এই প্রেম, এই আন্তরিকতাই তাঁর সাহিত্যকে কালজয়ী করেছে।

রাতটা ওখানেই কাটিয়ে ভোরে সেই মধুগন্ধেভরা পথ দিয়ে ফিরে আসে আবার কলকাতায়। আজ সে অনেক কিছুই পেয়েছে।

নিজের জীবনচর্যাকে সে যেন নতুন খাতে প্রবাহিত করার অনুপ্রেরণা পেয়েছে ওই বড় মাপের মানুষটির নিবিড় সান্নিধ্যে এসে।

গ্রাম থেকে শ্যামলী কলকাতায় আসছে। আগে থেকেই খবর দিয়েছিল সে সমীরকে। সমীর স্টেশনে গেছে! ভিড়ের মধ্যে দেখা যায় শ্যামলীকে।

সমীর দেখছে শ্যামলীকে।—তুমি এসেছো? সমীর এগিয়ে যায়। জনবহুল কোলাহল মুখর স্টেশনের এলাকায় বহুজনের মধ্যে সহজেই নজরে পড়ে শ্যামলীকে। পরনে ধানী রং শাড়ি, ট্রেনের ধকল ওর মুখে চোখে একটা ম্লান সৌন্দর্যের আভা আনে। শ্যামলী বলে—এলাম। বুঝলে মা তো আমাকে খরচার খাতাতেই লিখে দিয়েছে। আসার সময় কথাই বলেনি।

সমীর বলে—বিদ্রোহিণী কন্যা।

—শুধু তাই নয়। মা তো সুপাত্র খুঁজে ফেলেছিল এক দুনম্বরী বিজনেসম্যানের দশনম্বরী পুত্রকে।

—সেকি! এমন সুপাত্র ছেড়ে চলে এলে এই পোড়া শহরে? সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়?

সমীরের কথায় হাসছে শ্যামলী।

ট্যাক্সিটা এসে লেডিজ হোস্টেলের সামনে দাঁড়ায়। পাঁচিল ঘেরা পুরনো আমলের বাড়ি। এখনও বেশ কিছু গাছ-গাছালির ভিড় রয়েছে। বাগানও রয়েছে।

শ্যামলী জায়গাটাকে দেখে বলে—ভালোই মনে হচ্ছে।

ভুবনবাবুই এখানের চলতি সুপারকে বলে সব ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। সমীর শ্যামলীকে নিয়ে সুপারের ঘরে ঢোকে।

বেশ গোলগাল ভরাটি চেহারা, চোখের চশমাটায় তার গাম্ভীর্য বেড়েছে। শ্যামলীকে আপাদমস্তক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জরিপ করে বলে,—তুমিই শ্যামলী ভট্টাচার্য?

কাগজপত্র দেখায় শ্যামলী। সমীর ওদিকে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। মোটা খাতাটা এগিয়ে দিয়ে বলে—ফিল আপ করে এক মাসের চার্জ আগাম ক্যাসে জমা করে রসিদ নেবে। আর লোকাল গার্জেনের নাম ঠিকানাও লিখবে। তিনি এসেছেন?

শ্যামলী এবার সমীরকে দেখাতে ভদ্রমহিলা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সমীরকে দেখে বলে—ওই তোমার লোক্যাল গার্জেন?

গার্জেনের নমুনাটা তার যে আদৌ পছন্দ হয়নি তা ওর চাহনিতেই বোঝা যায়। সমীর বলে—আজ্ঞে হ্যাঁ।

ভদ্রমহিলা বলে—সপ্তাহে একদিন দেখা করতে পারবেন, ভিজিটিং রুমে চারটে থেকে ছ'টার মধ্যে।

সমীর বেশ বুঝেছে এই দিদিমণি বেশ কড়া ধাতেরই। তবু উপায় নাই। ওর কথাতেই মাথা নাড়ে। সমীর শ্যামলীকে তার অফিসের ফোন নাম্বার দিয়ে বলে—দরকার হলে ফোন করো। পরে দেখা হবে। আর কাল দুপুর আসবো—ইউনিভার্সিটিতে দেখা হবে।

ভুবনবাবুকে বলে ভর্তির ব্যাপারটা চুকিয়ে নিতে হবে। তারপর বইপত্রও কিনতে হবে।

সমীর মেসে ফেরে। অফিসের পর স্টেশন—সেখান থেকে শ্যামলীকে নিয়ে হোস্টেলে রেখে আসতে সন্ধ্যা হয়ে যায়। অবশ্য শ্যামলীর হোস্টেল-ইউনিভার্সিটির কাছেই ওর মেস।

গোলদিঘীতে সন্ধ্যা নামছে। ভ্রমণার্থীদের ভিড় তখনও কমেনি। হঠাৎ সমীর ওদের মাঝে কাজলী আর একটি ছেলেকে একটা গাছের নীচে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে থাকতে দেখে চাইল।

দারুণ সেজেছে কাজলী। পরনে ঝলমলে শাড়ি-মুখে চড়া রং এর কারিকুরি। চোখে ঘন কাজল রেখা। ছেলেটির পরনে জিনস্—হাতে বালা। মুখচোখে চোয়াড়ে ভাব। দেখলেই মনে হয় নতুন যুগের প্রতিভূ।

দাঙ্গার সময় পাড়ায় পাড়ায় কিছু মস্তান মাথা তুলেছে। তারা তখন এলাকার মানুষের রক্ষাকর্তার ভূমিকাই নিয়েছিল। পাড়ার লোক, নেতারাও সেদিন ওদের টাকা-পয়সা দিয়েছিল দাঙ্গা ঠেকাতে বোম-অস্ত্রশস্ত্র কেনার জন্য। তাদের সমীহও করতো। দাঙ্গার সময় তারা লড়েছিল এদের সঙ্গে। এলাকা দাপিয়ে বেড়াতো।

দাঙ্গা থেমে যাবার পর এবার তারা হাতে পেয়েছে অস্ত্র, বোমা। লড়বার সাহস পেয়েছে নেতা—কিছু মানুষের মদতে। টাকাও পেয়েছে অনায়াসে মস্তানি করে। পেয়েছে নেতাদের কাছে প্রতিষ্ঠা।

তারপর স্বাধীনতা এলো দেশে। সেই সঙ্গে একটা নতুন শ্রেণীরও জন্ম হলো। ফটিক

চাঁদ ছিল এই দিকের একটা বস্তিতে তার মাকে নিয়ে। বিধবা মা কোন বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করে। ফটিক এখানে ওখানে কাজের চেষ্টা করছে। পড়াশোনা আগেই ছেড়েছে। পাড়ার রকে বসে দুচার জনকে নিয়ে মস্তানি করে।

হঠাৎ দাঙ্গার আগুন জ্বলে ওঠে। ওদিকে একটা মুসলমান বস্তি। এদিকে হিন্দু এলাকা। ফটিকও এবার দলবল নিয়ে নেমে পড়লো সেই দাঙ্গায়। এপাড়ার লোকজন, মাতব্বররাও বলে,

—ফটিক একটা কিছু করো। দরকার হয় আমরা 'হেল্প' করবো।

ফটিকও এবার কাজের মত কাজ পেয়ে যায়। বলে.

—মেসোমশাই ওই ব্যাটারা তো আমাদের পাড়া অ্যাটাক করবেই।

ভীত জনতা বলে—সর্বনাশ হবে তাহলে? একটা কিছু করো বাবা।

ফটিক বলে—করা যায় মেসোমশাই, তবে বোম টোম চাই, কিছু খরচাপত্র—পাড়ার সকলেই বলে ওর জন্য ভেবো না ফটিক। টাকা পাবে—ওদের ঠেকাতে হবে। ফাইট করো।

টাকাও এসে যায়। ফটিকও এবার তৈরি হয়ে ওই বস্তির উপর রাতের অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আর্তনাদ ওঠে-- পালাচ্ছে ওরা। বোম ফাটছে—সারা পাড়া কেঁপে ওঠে। বস্তির ঘরের এই টে কাঠেতেই কেরাসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেয় ফটিকের দল।

আগুনের শিখা ওঠে, ফটিকের বিজয় ঘোষণা করে জনতা। বস্তির মালিক হরেকেষ্টবাবুও খুশি। তার তিনবিঘের বস্তির দখলই পাচ্ছিল না। ফটিকই সেই সমস্যাটা দূর করে দিয়েছে। হরেকেষ্টবাবুর সাধ এবার স্বাধীন হয়েছেন। ভোটে দাঁড়াবেন। এই ডামাডোলের বাজারে গুছিয়ে নিতে পারবেন। বড় বাজারে তার লোহার ব্যবসা। এক ছেলের ব্যবসা কলেজ স্ট্রিটে। জলের পাইপ, স্যানিটারি ফিটিংস এর কারখানা অন্যছেলের। এবার হরেকেষ্ট বাবু জননেতা হতে চান।

তাই বুঝেছেন তার ভোটের ব্যাপারে ফটিকের মত সাহসী কর্মীর দরকার। সেই জন্যই ওই বস্তির অক্ষত দুটো ঘর ফটিককেই দিয়েছেন। বাকিটায় এবার নিজস্ব গুদাম অফিসই হবে। বাড়িও তুলছে নতুন করে।

ফটিকদের মত একটা মস্তান শ্রেণী ক্রমশ দাঙ্গার পর কলকাতাতে তাঁবু গেড়ে বসলো এক শ্রেণীর স্বার্থপর মানুষের প্রয়োজনেই। ফটিক এখন হরেকেষ্টবাবুর কারখানায় কাজ করে। কাজ কী করে তা সেইই জানে। অবাধ্য শ্রমিককে ভয় দেখিয়ে ঠাণ্ডা করে—দরকার মত ডাণ্ডাও মারে। একটা পুরনো মোটরবাইক দাবড়ে ঘোরে।

সন্ধ্যার পর বস্তির ওদিকে ফটিক এখন চোলাই মদের কারবারও শুরু করেছে।

পাড়ার লোকেরা প্রতিবাদ করে—এসব ঠিক নয় ফটিক। পাড়ার নরেন মাষ্টার তাদের নেতা। দাঙ্গার সময় ওই নরেনবাবুও ফটিককে সাহস জুগিয়েছে, লড়ার সাহস। সেদিন ভাবেনি যে সমাজে ফ্র্যাঙ্কেস্টাইনদের জন্ম দিচ্ছে তারাই। দাঙ্গার পর এবার ফটিকরা এখন স্বাধীন। বলে সে,—বেশি গড়বড় করবেন না নরেনবাবু স্যার, বেকার ছেলেরা করেকম্মে খাচ্ছে। গোলমাল করলে কেলো হয়ে যাবে। চুপ মেরে থাকুন।

নরেনবাবুও হতবাক। জানেন তিনি ফটিকের রক্ষাকর্তা এখন হরেকেষ্টবাবু।

এহেন ফটিককে দরকার হয়েছিল নসুবাবুর। যুদ্ধ-দাঙ্গার সময় কলকাতা ছেড়ে-বাড়ি ঘর

ফেলে মানুষ পালিয়েছিল সেদিন বাড়িওয়ালারা বাড়ি আগলাবার জন্যই সিকি ভাগ টাকায় বাড়ি ভাড়া দিয়েছিল ভাড়াটেদের ডেকে এনে।

এখন ওপার বাংলা থেকে মানুষের ঢল নেমেছে। বাড়িভাড়ার দরও বেড়েছে অনেক। খালি বাড়ি আর নাই কলকাতা শহরে। এবার নসুদার বাড়িওয়ালা চায় নসুদাকে তুলে দিতে। একশো টাকার জায়গায় সে হাজার টাকা ভাড়া পাবে। এই নিয়েই শুরু হয় ঝামেলা। তারপর অত্যাচার। নসুদাই ফটিকদের বলে,

—একটা বিহিত করো তোমরা? এইভাবে তুলে দেবে বাড়ি থেকে? ফটিকরাও এখন পাড়ায় গেড়ে বসেছে। মাতব্বরী-সালিশী সবই করে। বাড়িওয়ালা ঘুঘু লোক। সেও ফটিকদের শ' পাঁচেক টাকা দিয়ে বলে—ওটাকে তাড়াও। তুলতে পারলে হাজার টাকা দেব।

ফটিক এসব কেস করে এখন ভালো রোজগার করছে। দলবল নিয়ে আসবে। ওদিকে নসুবাবুও ধরেছে তাকে। সেও ফটিকদের শ' পাঁচেক টাকা দেয়।

ফটিকের নজরে পড়ে নসুবাবুর কাজলীর দিকে।

পথেঘাটে দেখেছে মেয়েটাকে। এখন তার দেহে যৌবনের ঢল নেমেছে। প্রমীলাও জানে ফটিককে হাতে আনতে হবে। সেদিন বাড়িতে এনে চা সন্দেশও খাওয়ায় প্রমীলা। কাজলীই চা আনে। ফটিক কি ভাবছে, টাকা এখন ভালোই কামায় সে। এই এলাকার একজন কেউকেটা সে। এবার এই বস্তির মস্তান ফটিক চন্দ্র সত্য কিছু পাবার স্বপ্নই দেখে। বলে সে প্রমীলাকে।'

—কিছু ভাববেন না মাসীমা, আপনারা এখানেই থাকবেন। নসুদা বলে—কিন্তু বাড়িওয়ালা নাকি গুণ্ডা লাগাবে তোলার জন্য। ফটিক হাসে। ইতিমধ্যে ওখানেও টাকা সে পেয়েছে। কিন্তু কাজলীর আকর্ষণটাও কম নয়। ফটিক বলে,

—এ পাড়ায় আর কেউ এলে ফটিক তাকে ছেড়ে দেবে না।

আমি বলছি আপনারা এখানে থাকবেন। ব্যস—বাত খালাস।

প্রমীলাও সাহস পায়। বলে,

—তোমার উপর ভরসা করে রইলাম বাবা।

ফটিক এখন এবাড়িতে প্রায়ই আসে। চা টা খায়—মাসীমার জন্য বাজারের ফ্রেস সবজি কোনদিন বড় মাছও আনে ফটিকচন্দ্র।

প্রমীলা তাকে নেমন্তন্নও করে। যত্ন করে খাওয়ায়।

সমীর সেদিন এবাড়িতে এসেছে। ছুটির দিন। নসুদা চা খাচ্ছে—ফটিকও রয়েছে। নসুদা সমীরকে দেখে বলে,

—এসো সমীর।

সমীর দেখছে ফটিককে। পাড়ার ওই মস্তানকে সে দেখেছে আগে। বস্তির ওখানে বাজে ছেলেদের নিয়ে আড্ডা মারতো। সেই ফটিককে এখানে দেখে অবাক হয় সমীর।

বেশ বুঝেছে এখানে এখন ফটিকের কদর অনেক। প্রমীলা বৌদিও খাতির করছে ফটিককে। কাজলীও চা আনে। নসুদা বলে,

—ফটিক, এ সমীর। আমার গ্রামের ছেলে।

ফটিক চাইল মাত্র। ওদিকে তখন বড় মাছ কুটছে প্রমীলা। সমীর বলে—আজ চলি নসুদা।

—যাবে? প্রমীলাই এগিয়ে আসে। বলে-পরে একদিন এসো।

কাজলী কথাই বলে না। আজ সে প্রজাপতির মত সেজেছে। সমীর বের হয়ে আসে। বুঝেছিল ওখানে তার আর কোন প্রয়োজনই নাই।

হঠাৎ আজ কলেজ স্কোয়ারের গাছতলায় কাজলী আর ফটিককে দেখে তাই অবাক হয় না সমীর। মনে হয় নসুদা, প্রমীলা কলকাতার মোহে পড়েছে। আর কাজলী তাই মহানগরের অন্ধকার অতলের পথেই পা বাড়িয়েছে।

ওই ফটিকের মত ছেলের উপর নির্ভর করা যে কত বিপদজনক সেটা ভাবার মত মানসিক অবস্থাও তাদের নাই। মহানগরের মোহ তাদের গ্রাস করেছে। সব ভালো মন্দ বোধকেও ভুলিয়ে দিয়েছে।

গ্রাম সবুজ এক শান্ত সুখী জগৎ থেকে মহানগরে এসে নসুদা আজ যেন পথ হারিয়ে ফেলেছে শহরের মোহে।

সমীর সেদিন শহরের উপকণ্ঠে তাদের অফিসের বিনোদবাবুর সন্ধানে গেছে। স্টেশন থেকে নেমে চলেছে। কিছুদিন আগেও এখানে ছিল বাঁশবন। হোগলার জলা—মাঝে মাঝে কিছু পতিত জমি, ওদিক এদিকে দু' একজন চাষীর ছোট্ট বাড়ি।

এখন তার রূপই বদলে গেছে। সব জায়গাতেই মানুষ ভিড় করেছে। কেউ ত্রিপল, কেউ হোগলার বেড়া মাথায় টিনের চাল তুলে ওই বনজঙ্গল সাফ করে বাস করছে। কেউ জলার উপর বাশ পুঁতে তক্তা পেতে সেখানেই আস্তানা গেড়েছে।

তাদের অপিসের বিনোদবাবু স্ত্রী পরিবার নিয়ে দেশ ছেড়ে এখানেই এসে এখন দরমার ঘর করে রয়েছে। অন্তঃপুরের আব্রু কোথাও নাই। বিনোদবাবু বলে—কিভাবে আছি দেইখা যাও। মানুষে এভাবে থাকে? স্বাধীনতার গুঁতায় আমরাই মরতি বসেছি। দেশ ছাইড়া আইলাম, বাঁচুম ক্যামনে?

শত সহস্র মানুষের কাছে আজ বাঁচার প্রশ্নটাই বড় হয়ে উঠেছে। বিনোদবাবুর তিনটি মেয়ে, তাঁরও রিটায়ার করার সময় হয়েছে। একটা ছেলে সে পড়াশোনাও করে নি। দেশে গান-বাজনা নিয়ে থাকতো। এখানে এসেও সেই নেশা ছাড়তে পারেনি। শহরের কোন ওস্তাদের ওখানেই পড়ে থাকে। স্বপ্ন দেখে বড় গাইয়ে হবে।

বিনোদবাবুর স্ত্রী বলে—মাইয়াটা কলেজে পাশ দিছে, বিহাও দিতে পার না। দ্যাহ কাযকম্ম যদি কিছু পায় টায়। দিন তো চালাতি হইব।

এ সমস্যা একা ওই বিনোদবাবুরই নয়, আজ লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূল পরিবারের। আর এর ধাক্কাও সমাজের উপর আসবেই।

এতদিন রীতি ছিল মেয়েরা বড় হলে লেখাপড়া শিখুক না শিখুক বাবা মা তাদের বিয়ে থা দিতেন পাত্র দেখে। মেয়ে চলে যেতো নিজের ঘরে। অন্তঃপুরের একটা সীমানার মধ্যেই থাকতো তারা ঘর গৃহস্থালী নিয়ে। তার মধ্যে অনেক মেয়ে লেখাপড়া শিখে কিছু কাজ করতো। সেগুলোও ছিল মর্যাদার কাজ।

কিন্তু এবার এই সব পরিবারের মেয়েদেরও সামিল হতে হবে বাঁচার লড়াইয়ে পুরুষের পাশাপাশি। সেই লড়াইয়ে কেউ পায়ের তলে মাটি পাবে—ভালোভাবে বাঁচার পথ পাবে কিন্তু বৃহত্তর অংশটি সমাজের বুকে নানা সমস্যার কারণই হয়ে উঠবে। সমাজের রূপটাই বদলে যাবে।

এই পরিবর্তনের চেহারাটা কি হবে সঠিক জানে না সমীর। কিন্তু সমাজের রূপ বদলে যাবে সেটা সুনিশ্চিত।

..নিজের কথা মনে পড়ে। অতীতে এক ভোরে সেই আবছা অন্ধকারে গরুর গাড়িতে সর্বস্ব চাপিয়ে মাঠের পথে সমীর অশ্রুসজল চোখে পাঁচপুর থেকে বের হয়ে এসেছিল অজানা পথে। সেই দিনের বেদনাটা মনে পড়ে বার বার। এই ছিন্নমূল মানুষদেরই যেন একজন সে। আজও ঠিকানা পায়নি। একটা জাতি আজ এক সর্বনাশা ভাঙনের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে।

অফিসের চাকরিটা চালাতে হচ্ছে। সেইসঙ্গে লেখার কাজও। বিভূতিভূষণবাবু মাঝে মাঝে তার মেসে আসেন। তিনিই বলেন,

—অন্তত তিনচার বছর ছোটগল্প লেখো, দেশ বিদেশের সাহিত্য পড়ো, তারপর উপন্যাস লেখায় হাত দেবে।

তিনিই একটা খাতায় তাঁর প্রিয় বেশ কিছু বইএর নামও লিখে দেন। সমীর সে সব বই পড়ছে। বিভূতিবাবুর প্রিয় বই জন ক্রিস্টোফার সে কিনেই ফেলেছে। সামারসেট মম্ এর লেখাও পড়ছে। অফ হিউম্যান বন্ডেজ। বইটাও খুব ভালো লাগে। মন দিয়ে পড়ে ডিকেন্সের বই। রাশিয়ান সাহিত্যিকদের ছোটগল্প—উপন্যাসও পড়ে। পড়ে সুইডেনের লেখকদের গল্প, উপন্যাস। আমেরিকার আদিম আরণ্যক পরিবেশে পিলগ্রেমেজ-আজকের আন্দামান, দণ্ডকারণ্যের গড়ে ওঠা উদ্বাস্তু জীবনের কথারই যেন পুনরাবৃত্তি।

..সমীর এর মধ্যে একটা উপন্যাসও লিখেছে। তার সেই ফেলে আসা পাঁচপুরের স্মৃতিকে নিয়েই। সেই জগৎ-সেখানের মানুষ-সেই পরিবেশে তার বাবা-দিদিদের কথাই।

পাণ্ডুলিপি নিয়ে প্রকাশকদের কাছেও গেছে। সবে তার নাম বের হচ্ছে পত্র পত্রিকায় ছোট গল্পকার হিসাবে। তাই অনেক প্রকাশকই উপন্যাস ছাপতে রাজি নয়। সমীর যেন হতাশই হয়। তার সামনে বন্ধ দরজাটা খুলতে চায় না।

এর মধ্যে রোহিণীর বেশ কিছু গান সিনেমার ছবিতে গেছে। সেই সুবাদে রোহিণী ফিল্ম পাড়াতেও যাতায়াত করে পরিচালকদের কাছে।

ওর সঙ্গেই সমীরও যায়।

সাহিত্যজগৎ এর পাড়াতেই থাকে সে। বই পাড়া-প্রকাশকদের ব্যাপার খবরের কাগজের অফিসও দেখেছে সে। সেখানেও যাতায়াত করে। কিন্তু ছায়াছবির জগৎটাই আলাদা।

বিশাল পাঁচিল ঘেরা এলাকার মধ্যে গাছ-গাছালি-সুন্দর বাগান এসবও রয়েছে। রয়েছে পরিচালকদের বসার ঘর—অফিস। আর দু তিনটে বড় বড় বেশ উঁচু টিনের ছাদওয়ালা গুদাম ঘরের মত।

ওই বড় হলের মধ্যে ঘর-চালা-গ্রামের মাটির ঘর এসব তৈরি করে স্যুটিং করা হয়। আলো-ক্যামেরা-সাউন্ড রেকর্ডিং এসব অনেক যন্ত্রপাতির দরকার।

রূপালীপর্দায় যে ছবি দেখে তারা-সেগুলো কয়েক মাসের বহু জনের অক্লান্ত পরিশ্রমে গড়ে ওঠে। পর্দায় দেবদাস-সোনার হরিণ-মুক্তি-বিন্দুর ছেলে-এসব দেখেছে। সাহিত্য থেকেই সেদিন সিনেমার গল্প যেতো। শৈলজানন্দ তো মূলত সাহিত্যিকই। ছায়াছবিও সাহিত্যকে তুলে ধরার আর এক মাধ্যম ছিল তখন।

সমীরও স্বপ্ন দেখে তার গল্পের চিত্ররূপ হবে। তার ভাবনা-তার সৃষ্ট চরিত্রগুলো প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে ছায়াছবির পর্দায়। কিন্তু কিভাবে সেই স্বপ্ন সার্থক হবে জানে না সে।

..সেদিন বইপাড়ায় গেছে। প্রশান্তবাবুদের কাগজের ব্যবসা। সজ্জন লোক। সেদিন সমীরের একটা গল্প প্রবাসীতে পড়ে ভালো লাগে তার। সমীরও গিয়ে পড়েছে। সমীরই বলে,

—ছোটগল্প তো লিখছি। উপন্যাসও লিখেছি একখানা। আর একটাতেও হাত দিয়েছি।

প্রশান্তবাবু কি ভেবে বলেন—আপনার কপিটা দেখতে দেবেন? সমীরকে কোন প্রকাশক এভাবে কথা বলেনি। তারা অনেকেই বড় ব্যবসায়ী। ধারাপাত-বর্ণ পরিচয়-প্রথম ভাগ এসব বই গুনে নয়, টাল করে আঠারো ইঞ্চি বাই আঠারো ইঞ্চি, আর উচ্চতাতেও আঠারো ইঞ্চি এইভাবে টাল করে—টাল দরুনে বই বেচেন। আর কিছু গল্প, উপন্যাসও ছাপেন-তবে নামী দামী সাহিত্যিকদের বই।

সেখানে সমীরদের মত তরুণদের ঠাঁই নাই। এক প্রকাশক তো বলেন,

—অন্যরা দু' একখান বই ছাপুক, তারপর আসবেন। তাদের বই ক্যামন চলে দেখি।

সমীর ফিরে এসেছে হতাশ হয়ে। আজ প্রশান্ত বাবুর কথায় বলে,

—কপিটা কাল দিয়ে যাবো। পড়ুন।

সমীর শ্যামলীর হোস্টেলে মাঝে মাঝে আসে। শ্যামলী এই নতুন পরিবেশে এসে নিজেকে এর মধ্যে মানিয়ে নিয়েছে। হোস্টেলে কলকাতার বাইরের মেয়েরাই থাকে। মফস্বলের বিভিন্ন জেলা থেকে আসে তারা, হোস্টেলই তাদের ঘর-এখানের বাসিন্দারাই তাদের বন্ধু।

মিনতি এসেছে কোচবিহার থেকে—লতিকা এসেছে মালবাজার থেকে, সীমা জলপাইগুড়ির মেয়ে, এছাড়া বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদের মেয়েরাও আছে। শ্যামলী ইউনিভারসিটিতে ক্লাশ করতে যায়, সমীরের সঙ্গে দেখা হয় কলেজ স্কোয়ারে। বইপাড়ায় বই কিনতেও যায়। সমীরের প্রথম উপন্যাস ছাপা হয়েছে। প্রশান্তবাবুর কপিটা ভালো লেগেছিল। তিনিই বলেন,

—এই উপন্যাস আমরা ছাপবো। তবে কমিশন দেব টেন পার্সেন্ট। বই বের হলে কিছু দেব।

সমীরের কথাটা যেন বিশ্বাস হয় না। কি টাকা পাবে সে সম্বন্ধে তার বলার কিছু নাই। বলে সে—ছাপবেন?

প্রশান্তবাবু কথা রেখেছেন। বই ছাপা শুরু হয়। প্রুফ কপিও আসছে।

সমীরের স্বপ্ন যেন সফল হতে চলেছে।

সেদিন শ্যামলীর সঙ্গে দেখা কলেজস্কোয়ারে। সমীর বলে,—চলো এক জায়গায়।

শ্যামলী এখন সমীরের সঙ্গে মাঝে মাঝে বের হয়। মেট্রো, লাইটহাউসে সিনেমা দেখে

কার্জনপার্কে বসে সন্ধ্যার আগেই হোস্টেলে ফেরে। দুজনে যেন কিছুক্ষণের জন্য কর্মব্যস্ত শহরের কোলাহল থেকে তাদের ফেলে আসা সেই গ্রাম সবুজেই ফিরে গেছে।

হোস্টেলে সমীর বড় একটা যায় না।

শ্যামলীও দেখেছে মিনতি-সীমারাও বলে—ওটি কে রে? ছেলেটি কিন্তু মন্দ নয়। তা কতদিন চলছে তোদের ব্যাপার স্যাপার?

শ্যামলী বলে,—ওসব কিছু নয় রে। আমাদের গ্রামের ছেলে। ছোট থেকেই চেনা জানা—

কে মন্তব্য করে—দেবদাস পার্বতীও এক গাঁয়ের ছেলে মেয়ে ছিল।

সীমা বলে—দেখিস বাবা লয়লা মজনুর কেস যেন না হয়।

শ্যামলী এভাবে কথাটা কোনদিন ভাবেনি। সহজভাবেই মিশেছে সমীরের সঙ্গে। পরম বন্ধুর মতই। বন্ধুদের সে কথাটা বোঝাতে পারে না। অবশ্য এখানে দু' একজন মেয়ে বাড়ি থেকে দূরে এসে চুটিয়ে প্রেম করছে।

শ্যামলী নিজেকে ওই পর্যায়ে নামাতে পারবে না।

সমীর বলে—তোমার হোস্টেলে যাবো কি, যা একখান বুলডগ মার্কা সুপার আছে না?

—কণা দিদি? শ্যামলী বলে।

সমীর চোখ কপালে তুলে বলে—উনি কণা! কণা নয় বল পর্বত।

ওই বিশাল দেহ, নাম 'কণা'! বাপ্‌স্‌! বুলডগের মত চোখ পাকিয়ে ফুসে ওঠে— কাকে চাই? কেন? কী নাম আপনার? কথা বলার উপায় নেই। ওর ভয়েই যাই না হোস্টেলে।

হাসে শ্যামলী—এত ভয় তোমার?

—ওরে বাবা, একেবারে 'টাইগ্রেস'। রায়বাঘিনী। ওর ভয়েই ও পথ ছেড়ে এখানে দাঁড়িয়ে থাকি।

—তবু হোস্টেলের মেয়েরা দেখে। শ্যামলীই বলে—চলো।

সমীর ওকে প্রশান্তবাবুদের বই এর দোকানে আনে। ওদিকে প্রশান্তবাবুর বসার জায়গা। কয়েকটা চেয়ারও রাখা আছে। প্রশান্তবাবু বই ছেপে খুশিই হয়েছেন। রুচিবান মানুষ। বনেদী পরিবারের ছেলে। অন্য ব্যবসাপত্র আছে। তবু লেখকদের সম্বন্ধে শ্রদ্ধাশীল। তাই প্রকাশনার কাজে এসেছেন। নামীদামী লেখকদের বই এব সঙ্গে নতুন প্রতিভাবান লেখকদের সন্ধান করে তাদের বইও ছাপেন।

সমীরের বইটা এর মধ্যেই ভালো বিক্রি হচ্ছে। পাঠকরাও কিনেছে তার বই। কোন পত্রিকায় এর মধ্যে ভালো সমালোচনাও করেছে। বইটা ছেপে প্রশান্তবাবুও খুশি।

সমীরকে দেখে বলেন,

—এসো অথর। ক'দিন দেখাই নাই।

প্রশান্তবাবু সমীরের চেয়ে বড়ই। আসা যাওয়ার ফলে সম্পর্কটা এখন অনেক সহজ হয়ে উঠেছে। সমীর বলে,

—বই কেমন চলছে প্রশান্তদা?

প্রশান্তবাবু বলে—ভালোই। মনে হচ্ছে এক বছরেই এডিশন করতে পারবো।

সমীর খুশিই হয়। শ্যামলীর সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দেয়।

চা এসেছে।

শ্যামলীকে একখানা বইও দেয় সমীর। বলে সমীর,

—প্রশান্তদা, এ আমার সাহিত্যের প্রথম পাঠিকা। গাঁয়ে যখন লুকিয়ে ছাপিয়ে লিখতাম তখন ওইই পড়তো সেই লেখা।

শ্যামলীও খুশি হয়েছে বইটা দেখে।

প্রশান্তবাবু বলেন—নতুন কপি লিখছ?

সমীর বলে—হ্যাঁ। এবার অন্য পটভূমিকায় এক নতুন বিষয় নিয়ে লেখার চেষ্টা করছি।

প্রশান্তবাবু বলেন,

—কপিটা এখানেই দেবে।

সমীর আজ যেন স্বপ্নই দেখে। তার বই প্রকাশিত হচ্ছে, এবার আর তাকে অন্য প্রকাশকদের দরজায় দরজায় ঘুরতে হবে না। প্রশান্তবাবু একটা ভাউচারও সই করতে দেয়। সমীর দেখে পাঁচশো টাকা সে এর মধ্যে রয়্যালটি বাবদ পেয়েছে।

সমীর বের হয় খুশি মনে। বলে,

—শ্যামলী, তুমি সত্যি খুব পয়মন্ত। আজ তুমি সঙ্গে ছিলে তাই এতগুলো সুখবর শুনলাম, নগদ প্রাপ্তিযোগও ঘটলো। চলো, আজ তোমাকে খাওয়াবো। কী খাবে বলো?

শ্যামলীও খুশি হয়েছে সমীরের এই সংবাদে। শ্যামলীও চেয়েছিল সমীর আরও বড় হোক। তার লেখার সমাদর হোক। শ্যামলী বলে—কিন্তু চলার এই শুরু সমী। তোমাকে আরও এগিয়ে যেতে হবে। সারা দেশের লোক জানবে তোমার নাম।

—সেদিন পাশে থাকবে তো? সমীর বলে ওঠে।

হেদুয়ার জলে সন্ধার ছায়া নামছে। ঘাসের উপর বসে আছে ওরা। ওদিকে বাচ্চাদের কলরব ওঠে।

মেয়েরা ছেলেদের তুলনায় অনেক বাস্তববাদী হয়। জীবনকে তারা নানা দিক থেকে বিচার করে তবেই সিদ্ধান্ত নেয়। জানে শ্যামলী মানুষের স্বপ্ন সত্যি হয় না—সত্য আর বাস্তব দুটোর মধ্যে ফারাক অনেক।

শ্যামলী বলে—চলো ওঠা যাক।

যেন ওই প্রশ্নটাকে সে এড়িয়েই গেল।

মেসে ফিরেছে সমীর। সেদিন মেসের বাবুদের মধ্যে বেশ উত্তেজনাই দেখা দেয়। সনৎবাবু বলে,

—আপীল করবো হে। লোয়ার কোর্টে হেরেছি, হায়ার কোর্টে যাবো।

দিবাকরদার মন মেজাজ আজ ভালো নাই। শিয়ালদহের রেল গেটে টিকিট কলেক্টার সে। কিছু কামাই দিনই হয়। আজ এক ভদ্রলোক স্ত্রী-ছেলেমেয়ের বাহিনীকে নিয়ে ট্রেন থেকে নেমে গেট পার হচ্ছে। পতিদেবতা আগে, পিছনে জাঁদরেল গিন্নী কোলে একটা বাচ্চা—আর হাফডজন বিভিন্ন সাইজের ছেলে মেয়ে।

দিবাকর বলে—টিকিট।

পতিদেবতা ঘাড় নেড়ে জানায় পিছনে।

তার পরেই গিন্নীকেই ধরেছে—টিকিট।

গিন্নী একখান মাত্র টিকিট গছিয়ে দিতে দিবাকর বাকি পল্টনকে দেখিয়ে বলে—এদের টিকিট? টিকিট না দিলে ছাড়বো না। দিবাকরও হিসাব করে নেয় বেশ কিছু টাকাই মিলবে। তাই ওদেরই পথ আটকায়। এবার সেই গিন্নী সেই পল্টনকে ফেলে আর কোলেরটাকে দিবাকরের কোলে ধরিয়ে দিয়ে গেট পার হয়ে হন হন্ করে বেরিয়ে যায়। পতিদেবতা তো আগেই গেছেন।

সেই হাফডজন বিভিন্ন সাইজের পল্টন এবার আটকে পড়ে পরিত্রাহী চীৎকার জুড়েছে। সেই সঙ্গে দিবাকরের কোলের ধরানো বাচ্চাটাও গলা মেলায়। একেবারে সপ্তগ্রামে সপ্তসুর বেজে ওঠে সেই সঙ্গে দিবাকরের কোলের বাচ্চাটাও 'হিসি' করে দেয় দিবাকরের রেল কোম্পানীর প্রদত্ত কোটে। কোট 'হিসিতে' মাখামাখি-তার সঙ্গে চলছে ওই কোরাস। আর এদের জনক জননী তখন মেন গেটের বাইরে।

দিবাকর এইসব কচিমাল নিয়ে কি করবে জানে না।

এবার কোরাসমুখর পল্টন নিয়ে কোলে ওই বাচ্চা, চেকার সাহেব গেটের দিকে দাড়িয়ে সেই জনক জননীর সন্ধানে—

—ও মশাই, ও দিদি—নিয়ে যান এদের। ও দিদি—

মহিলার স্বামী ফিরে দাঁড়িয়েছে। গিন্নী হুকুম করে।

—চলো। দাঁড়ালে যে।

—ছেলেমেয়েগুলো—দিবাকর চেল্লাচ্ছে।

—থাকুক। ধরুক ওদের রেল কোম্পানী। মহিলাও সাফ জানিয়ে দেয়।

দিবাকর তখন বাহিনীকে নিয়ে এসে পড়েছে ওদের কাছে। এখন তার নাজেহাল অবস্থা। কোট ভিজে গেছে। দলবল সামলাতে ব্যস্ত। রেলপুলিশও এদের জিম্মায় নেবে না। সে ধরেছে—তাকেই সামলাতে হবে। বিপদের গুরুত্ব বুঝে দিবাকর বলে—এদের টিকিট লাগবে না দিদি। আপনার পল্টন নিয়ে যান।

ইস্—কোটটা কি করেছে দেখুন। একেবারে ভিজিয়ে দিয়েছে।

ভদ্রমহিলা এবার পল্টনের সবকটা মজুত আছে কিনা দেখে নিয়ে বাচ্চাটাকে নিয়ে বলে—চাকরি করছেন কদ্দিন?

দিবাকর বলে—অনেকদিন। তবে এমন শিক্ষা পাই নি।

দিবাকর আজ তাড়াতাড়িই ফিরেছে, ওই ভিজে কোট কেচে তবে নিশ্চিন্ত। মেসের বাড়িওয়ালা বেশ কিছুদিন থেকেই বাড়ি ছেড়ে দিতে বলছে। এখন তিনতলা বাড়ির ভাড়া কয়েক হাজার টাকা। কিন্তু এরা ছাড়েনি। তাই মামলা করেছিল। আর আজ লোয়ার কোর্টে এরা হেরে গেছে।

এতগুলো কেরাণী অফিসের কাছে এই বাড়িটাতে ছিল। হুট করে ছেড়ে সকলে যাবে কোথায়? তাই লোয়ার কোর্টে হেরে তারা আপীল করবে।

হরিদাসবাবু বলে—হায়ার কোর্ট তার পরও আছে হাইকোর্ট। চলুক মামলা—দশবছর বসে থাকবো। তবে সিট রেণ্ট বাড়াতে হবে হে। মামলার খরচটা ফি মাসেই তুলবো।

সকলেই রাজি হয়।

তবু সমীরের মনে হয় এই বাড়ি ছাড়তেই হবে একদিন। অর্থাৎ ছিন্নমূল তাদেরও হতে হবে আবার। সে ভাবার সময় পাওয়া যাবে।

এমনি সময় নসুদাকে হন্তদন্ত হয়ে আসতে দেখে চাইল সমীর।

—তুমি! নসুদা।

নসুদা বলে—শীগগীর একবার চল আমার সঙ্গে।

—কি ব্যাপার নসুদা? সমীর ওর উত্তেজিত মুখ দেখে প্রশ্ন করে।

নসুদা বলে—বাড়িতে চল। তোর বৌদি ডেকেছে। খুব জরুরী দরকার।

সমীর ওই রাতেই বের হয়। পাড়ার মধ্যেই ওদিকে ক'টা গলির পরই বাড়িটা। রাতের স্তব্ধতা নেমেছে। সমীর নসুদার সঙ্গে বাড়িতে ঢুকেছে।

ওকে দেখে প্রমীলা কান্নায় ভেঙে পড়ে।

—আমার সব্বোনাশ হয়েছে সমী! একি হলো আমার?

সমীর তখনও জানে না ব্যাপারটা। তাই শুধোয়। —কী হয়েছে বৌদি?

প্রমীলা এবার কপাল চাপড়ে বলে

—ওই মুখপুড়ি কুলমজানি বাড়িতে ঝগড়া করে ওই হারামজাদা ফটিকটার সঙ্গে বের হয়ে গেল? একি সব্বোনাশ হলোরে।

সমীর চমকে ওঠে—সেকি!

অবশ্য এর আগে সমীর কাজলীকে ফটিকের মোটরবাইকে চেপে ঘুরতে দেখেছে গড়ের মাঠে, চৌরঙ্গী-কলেজ স্কোয়ারে। সেদিন নিজেদের প্রয়োজনে নসুদা ফটিককে মাথায় তুলেছিল। এবার ফটিকও তার দাম কড়ায় গণ্ডায় আদায় করে নিয়েছে।

সমীর বলে—ফটিকের সঙ্গে কাজলী মিশল কী করে? একটা মস্তান-তোলাবাজ। তার পাল্লাতেই পড়লো।

নসুদা বলে—দোষ আমারই। তখন উপকারীর মত এলো ছোঁড়াটা কিন্তু তারপর এমনি সর্বনাশ করবে তা স্বপ্নেও ভাবিনি।

তখনই প্রমীলা বলে—তখনই পই পই করে বলেছিলাম মেয়েকে সামলাও। ডানা পালক গজাচ্ছে। তা শুনলে না। এখন বোঝো?

সমীর বলে—গেছে কোথায়?

যমের বাড়িতে। প্রমীলা ফুঁসে ওঠে।

নসুদা বলে—ওই বস্তির ওদিকে থাকে ফটিক।

সমীর বলে—ওখানেই চলুন। ভালো কথায় কাজ না হলে থানায় যেতে হবে।

নসুদা বলে—যা ভালো বুঝিস কর। আমার মাথায় কিছুই আসছে না।

সমীর এর মধ্যে মেসের জগন্নাথ, দিবাকরদেরও ডেকে আনে। সদলবলে খুঁজে খুঁজে ফটিকের সেই বস্তির বাড়িতেও যায়। কিন্তু পাশের লোকজন বলে—সে তো ফেরেনি। ফটিকের ফেরারও কোন ঠিক নাই। এরাও ফটিকের এই নতুন কীর্তির কথা কিছু জানে বলে মনে হয় না।

ওরা থানাতেই যায়।

রাত নেমেছে। থানাও সুনসান। ডিউটি অফিসার কয়েকটা বড় বড় খাতা এক করে বালিশ বানিয়ে টেবিলে চিৎপটাং হয়ে নিদ্রায় মগ্ন। এদের ডাকে উঠে বসে। চোখ কচলাতে কচলাতে শুধোয়।

—কী ব্যাপার। রাত দুপুরে ঝামেলা? কী হয়েছে?

সমীরই ব্যাপারটা জানাতে অফিসার বলে,

—ওই সব শালাদের নিয়ে হয়রান হয়ে গেলাম মশাই। এতদিন ব্যাটারা টাকা কড়ি মালপত্রই টানাটানি করতো। এবার বাড়ির মেয়েদের ইজ্জত নিয়েই টানাটানি শুরু করেছে?

নসুদা বলে—একটা কিছু করুন স্যার।

অফিসার বলে—আপনি ওর বাবা! তা এতদিন প্রেমপর্ব চলছিল দেখেননি? নাকে সর্ষের তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছিলেন? নিজেরা এসব দেখবেন না। দেখবে পুলিশ?

দিবাকর বলে—ব্যাটাকে অ্যারেস্ট করে আনুন স্যার। ফুঁসলানোর কেস। অফিসার জানে ফটিক হরেকেষ্টবাবুর দলের লোক। ইদানীং হরেকেষ্টবাবু ভোটে দাঁড়াচ্ছে। উপর মহলে তার প্রভাবও বেশি। ফটিককে ধরেও কায়দা করা যাবে না।

তাই বলে—কেস লিখে নিচ্ছি। তদন্ত হবে। দেখি কী করা যায়।

সমীররা মেসে ফেরে তখন অনেক রাত। এত খুঁজেও তারা ফটিক, কাজলীদের পায়নি। সমীরের মনে হয় কাজলীরও মত ছিল। নাহলে সে বাধা দিত। কিন্তু তেমন কিছুই ঘটেনি। কোথায় গেল মেয়েটা? ওর সম্বন্ধে সমীরের খুব ভালো ধারণা ছিল না। কিন্তু তাই বলে মেয়েটা এত নীচে নামবে তা ভাবেনি।

নসুদা স্বপ্ন দেখেছিল আর ক'বছর চাকরি। তার মধ্যে কাজলীর বিয়ে-থা দিয়ে দেবে ভালো ঘরে। মেয়ের দায়িত্বও মুক্ত হয়ে যাবে সে। তারপর চাকরি থেকে রিটায়ার করে নসুদা ভেবেছিল দেশেই ফিরে গিয়ে শান্তিতে বাস করবে।

কিন্তু এমনি একটা কাণ্ড ঘটে যাবে তা ভাবতেও পারেনি নসু ভটচার্য। সমীরের মনে হয় সভ্যতার মোহ—অনেক পাবার স্বপ্নই আজ মানুষকে এইভাবে হতাশার অন্ধকারেই ঠেলে দিয়েছে। সামান্য তাৎক্ষণিক কিছু পাবার লোভেই এবার মানুষ নিজেদের বিপদ ডেকে এনেছে।

কাজলী কিছুদিন ধরেই কথাটা ভাবছে। লেখাপড়া তার হবে না। ম্যাট্রিক দিয়ে ফেল করেছে। বাবা বলে—আবার দে পরীক্ষা। পড়াশোনা কর।

প্রমীলা বলে—বিয়ে-থা দাও মেয়ের।

এর মধ্যে ফটিকও এ বাড়িতে যাতায়াত শুরু করেছে। প্রমীলা বুঝেছে এর জন্যই বাড়িওয়ালা আর তাদের উপর ঝামেলা করেনি। সেদিন বাড়িওয়ালার বাড়ির সামনেই রাতের বেলায় দু-তিনটে বোমা ফাটে। বাড়িওয়ালা চুপ করে যায়।

ফটিকই অভয় দেয় এদের।

—কোন ভয় নাই মাসীমা।

প্রমীলা বলে—কাজলী তোর ফটিকদাকে চা এনে দে। বসো বাবা।

ক্রমশ ফটিক এখানে যাতায়াত করে। দামী পোশাক পরে মোটরবাইকে চড়ে। আর অনেক নামী লোকদের সঙ্গে তার পরিচয় সেটাও জানাতে ভোলে না।

কাজলীকে ও বলে—সিনেমার হিরোইনদের মত চেহারা তোমার। চলো তো বিমলদাকে বলে—নামিয়ে দিই ফিলিমে।

কাজলীও স্বপ্ন দেখে সেই রূপোলি জগতের। বলে সে-কে আমাকে সিনেমায় নামাবে?

ফটিক বলে—বলো তো আমিই চেষ্টা করতে পারি। চলো একদিন—

কাজলী এসব কথা বাড়িতেও জানায় না। জানে মা-বাবা রাজি হবে না কোন মতেই। তাই গোপনেই বের হয় সে। গোলদিঘীর ওখানে গিয়ে রোজ সেজেগুজে অপেক্ষা করে। ফটিকও আসে মটরবাইক নিয়ে।

কাজলী যেন কোন স্বপ্নের রাজকন্যার মতই পক্ষীরাজে চেপে এক স্বপ্নের জগতে উধাও হয় রাজপুত্রের সঙ্গে।

ফটিকের দু'একজন চেনাজানা আছে এখানে। তারা ছোটখাটো পার্ট এর জন্য স্টুডিওতে ঘোরাঘুরি করে। তাদের সঙ্গেই কথা হয়। কে বলে,

—তপনদা, তরুণদাকেই বলছি। নতুন প্রতিভা পেলে তারা লুফে নেবে। ফটিক বলে—তাহলে বলে রাখ। পরে খবর দিবি।

ফটিক ফেরে কাজলীকে নিয়ে। কাজলীও স্বপ্ন দেখে। চৌরঙ্গী এলাকার কোন দামী রেস্তরাঁয় এসে ঢুকলো। আলো ঝলমল এক জগৎ। সুন্দর সুন্দরী ছেলেমেয়েদের ভিড়। মেয়েদের পোশাকগুলোও দেখছে কাজলী। তারা জানে ওই উছল যৌবন কি করে পুরুষের দরবারে পেশ করতে হয়।

এই জগতের স্বপ্নই দেখে কাজলী। এই এঁদো ঘরে ওই পরিবেশে থাকতে চায় না সে। মা বাবার হাজারো বিধি নিষেধের বেড়া ভেঙে সে জীবনকে উপভোগ করতে চায়। আর তার জন্য দরকার ফটিককেই।

ফটিক প্যান্টের পকেট থেকে দামী সিগ্রেট আর এক তাড়া নোট বের করে। দুজনের খাবারের দামই শ' তিনেক টাকা। ফটিক এর মধ্যে এক বোতল বিয়ারও নেয়। দেখছে কাজলী।

—মদ! বলে সে।

হাসে ফটিক—ধ্যাৎ মদ কেন হবে। চিরতার জল। দ্যাখ না একটু টেস্ট করে। ভালো লাগবে। সবাই তো খায় এখানে। দেখছ না?

দেখে কাজলী অনেক ছেলেমেয়েরাই খাচ্ছে। এটা খাওয়া যেন এখানের রেওয়াজ। কাজলীও ভয়ে ভয়ে দু' একঢোক খেয়ে বলে—বিশ্রী। তেতো।

—উপকারী। খেয়ে নাও।

তারপর খাবার আসে। প্লেট ভর্তি একটা করে আস্ত মুরগীই। সঙ্গে স্যালাড সস। কাজলী খাচ্ছে। এসব খাবার আগে খায়নি। এই পরিবেশে আসেও নি সে।

আজ যেন নতুন এক জগতকে দেখছে সে।

ফটিক বলে—হিরোইন হতে গেলে হালচাল—আদব কায়দা সব জানতে হবে। ওর জন্য ভেব না—আমিই তালিম দিয়ে দেবো।

কাজলী আজ যেন তার পাশে একজনকে পেয়েছে।

ক্রমশ কাজলী ফটিকের অভিসার শুরু হয় বাড়ির অজানতেই। কাজলী বলে—পড়তে যাচ্ছি কোচিংএ।

..সেদিন ব্যাপারটা নসুদার নজরেই পড়ে যায়। নসুদা সেদিন পি-জিতে তাদের অফিসের কাকে দেখে ফিরছে। বাস ধরবে ভিক্টোরিয়ার ওদিকে চৌরঙ্গী রোডে। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মাঠ দিয়ে আসছে। হঠাৎ ওদিকে জলের ধারে একটা গাছের নীচে দৃশ্যটা দেখে চমকে ওঠে নসুবাবু।

ফটিকের বাহুবন্ধনে নিজেকে সঁপে দিয়েছে কাজলী। দুজনে যেন কোন এক স্বপ্নের জগতে হারিয়ে গেছে। নসু ভটচায এই দৃশ্য দেখবে স্বপ্নেও ভাবেনি। গ্রামের মানুষ সে, এখনও মেয়েদের দৈহিক শুচিতায় সে বিশ্বাসী। তার মেয়ে ওই বাজে ছেলেটার সঙ্গে প্রকাশ্যে এইসব নোংরামি করবে এটাকে মেনে নিতে পারবে না নসু ভটচায।

কোন রকমে রাগ চেপে বের হয়ে এল সে। বাড়িতে ফিরে গুম হয়ে থাকে। মেয়ে তখনও ফেরেনি। গর্জে ওঠে নসু ভটচায

—কোথায় কাজলী?

—পড়তে গেছে। প্রমীলা জানাতে নসু ভটচায বলে—যমের বাড়ি গেছে। আসুক।

কাজলীকে ফটিক নামাতে এসেছে। মোটরবাইকের শব্দ শুনেই নসু এসে পড়ে বাইরে। দেখে কাজলী নামছে। নসু এবার ফটিকের কলারটা ধরে।—ইতর ছোট লোক মস্তান, এত বড় সাহস তোমার, আমার মেয়ের সব্বোনাশ করবে। জুতিয়ে মুখ ভেঙে দোব—

এবার ফটিকের মাথাতেও রক্ত উঠে পড়ে। এক ঝটকায় নসুকে ছিটকে ফেলে স্বমূর্তি ধরে ফটিক। বলে—ফের কথা বললে উড়িয়ে দোব। তোমার'মেয়ের বাপের ভাগ্যি ফটিককে পেয়েছে। শোনো—ফটিক যা চায় তা পায়ই। পারো তবে আটকে রাখো মেয়েকে দেখি ক্যামন মরদ।

মটরবাইকের গর্জন তুলে চলে যায় সে। এবার নসুদা কাজলীর চুলের মুঠি ধরে টেনে ভিতরে নিয়ে গিয়ে গর্জাতে থাকে। প্রমীলাও দেখেছে ব্যাপারটা। সে ভীত কণ্ঠে বলে—ওমা—কি সর্বনাশ হবে গো!

এবার নসুদা প্রমীলাদের দেশের বাড়িতে পাঠাবার কথাই ভাবছে। বলে সে—সামনের সপ্তাহেই দেশে চলে যাও। কলকাতায় থেকে আর কাজ নাই। আমাদের গ্রামই ভালো। সেখানে কোন ছেলে দেখে মেয়ের বিয়ে দোব।

—তাই করো বাপু। প্রমীলা সায় দেয়। মেয়েকে শাসায়।

—ক'দিন ঘরের বাইরে গেলে পা খোঁড়া করে দেব।

কাজলী এখন নিজের জগৎকে চিনেছে। ফটিক তাকে নায়িকা করবেই। কলকাতায় এই প্রাচুর্যের জগতে সে থাকবেই। এখান থেকে যাবে না। তাই সেও এবার নিজের পথই দেখে নিতে চায়।

তাই ফটিককেও খবর পাঠায়। ফটিকই সব ব্যবস্থা করে এবার কাজলীকে নিয়ে কেটে পড়েছে।

কাজলীকে এনেছে ফটিক কালিঘাটের দিকে একটা বাড়িতে। ফটিকের এক চ্যালার

আস্তানা। সে এদিকের নামী মস্তান। গুল্টু বলে—খাসা মাল হাতিয়েছিস রে ফট্‌কে?

ফটিক বলে—ওর বাপটা থানা পুলিশ করেছে। ক'দিন এখানেই থাকবো গুরু। ওদিকের কেসটা কেষ্টদা ততদিনে সামলে নিতে পারবে, তখন ওকে নিয়ে যাবো।

গুল্টু বলে—ক'টা মেয়েকে এই করে ফাঁসাবি রে। এর আগেও দুটোর সব্বোনাশ করেছিস। বুঝলি ফট্‌কে, আমাদের টাকাকড়ির ধান্দা। কিচাইন লেগেই থাকে নিজেদের মধ্যে। এর মধ্যে মেয়েছেলের নফরা করা ঠিক নয় রে। ওসব ঝামেলায় যাস্‌ নে।

ফটিক বলে—একটু আধটু চেখে দেখতে তো সাধ যায় গুরু। থাকুক না যদ্দিন থাকে। তাড়াতে আর কতক্ষণ।

গুল্টু বলে—এসব ভালো কাজ নয় রে।

...ফটিকের পাত্তা নাই এদিকে। নসু ভটচায পাগলের মত ঘোরে। আজ তার সব হারিয়ে গেছে। এখানে মানুষের অনেক কিছুই হারিয়ে যায় সামান্য পাওয়ার স্বপ্নে।

...সমীর তার লেখার জগত নিয়েই রয়েছে। সেই ছিন্নমূল মানুষদের জীবন সংগ্রামকেও দেখেছে সে। শহরের পথেঘাটে। অফিস পাড়াতেও এখন শাড়িপরা মেয়েদের দেখা মিলছে। আগে ডালহৌসী-চৌরঙ্গী পাড়ায় কিছু মেমসাহেবদেরই দেখা মিলতো। তাদের পর দেখা যেতো কিছু অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মহিলাদের। তাদের অনেকে অফিসে কাজকর্ম করতো। বাঙালি মেয়েরা তখনও ছিল অন্তঃপুরের নিশ্চিন্ততার মধ্যে।

কিন্তু দেশবিভাগের পর অন্তঃপুরের সেই বেড়াটা ভেঙে গেল অর্থনৈতিক কারণেই। তারপর অবশ্য মেয়েরাও এগিয়ে এলো। এই পরিবর্তনকে সমাজও মেনে নিতে বাধ্য হলো।

কিন্তু দেশ বিভাগের ধাক্কাই এই পাঁচিলটাকে ভেঙে দিয়েছিল। সমীর লিখছে তাদের জীবন সংগ্রামের কাহিনী।

তখন বাংলা সাহিত্যের প্রচার, প্রসারও বেড়েছে। নতুন পত্র-পত্রিকাও হয়েছে অনেক। আগে সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটা গোঁড়ামি ছিল। সাহিত্যকে পথে নামাতে রাজি ছিলেন না অনেক সম্পাদক লেখকও।

সাহিত্যে শুচিতা বজায় রাখতেন তাঁরা।

প্রবাসীর সম্পাদক রামানন্দবাবু ছিলেন লেখার ব্যাপারে খুবই কড়া। কোন লেখার মানে তাঁর মাপকাঠিতে উন্নীত না হলে তিনি সে লেখা ছাপাতেন না।

শোনা যায় রামানন্দবাবু একবার বেনারসে বেড়াতে গেছেন। গঙ্গার দশাশ্বমেধ ঘাটে স্নান করতে নেমে পা পিছলে গভীর জলে পড়ে যান। বেকায়দায় গভীর জলে পড়ে ডুবছেন—সেই ডুবন্ত রামানন্দবাবুর পাশেই স্নান করছিল একটি স্থানীয় তরুণ, সেইই কোনমতে তুলে এনে প্রাণ বাঁচায়। রামানন্দবাবুও তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা জানান।

তারপর রামানন্দবাবু কলকাতা ফিরে এসেছেন। কয়েক মাস কেটে গেছে। তিনি অফিসে বসে কাজ করছেন। একটি তরুণ ঢোকে। তাঁকে একটা কবিতা ধরিয়ে দিয়ে বলে—এটা যদি ছাপেন আপনার কাগজে।

তারপরই তরুণটি বলে রামানন্দবাবুকে—চিনতে পারেন? বেনারসের গঙ্গার ঘাটে একদিন ডুবছিলেন—আমিই তুলেছিলাম আপনাকে।

রামানন্দবাবু দেখছেন তাঁর উদ্ধারকর্তাকে। তরুণটি বলে,

—যদি কবিতাটা ছাপতেন প্রবাসীতে—

এর মধ্যে রামানন্দবাবু কবিতাটা পড়ে ফেলেছেন। তার মনে হয় এটা অপাঠ্যই, কবিতা নামের যোগ্যও নয়।

গম্ভীরভাবে রামানন্দবাবু শুধোন—এখান থেকে বেনারসের ভাড়া কত হে?

—কেন?

—ওই দশাশ্বমেধ ঘাটে নিয়ে গিয়ে আমাকে গঙ্গাতেই ছেড়ে দিও বাবা। বরাতে থাকলে বাঁচবো, না থাকলে যা হবার হবে। তোমার কবিতা ছাপতে পারবো না।

ক্রমশ যুগ বদলের সঙ্গে সাহিত্যের রূপ বদল, মানবদলও শুরু হয়। সাহিত্য নির্ভর পত্রিকার পাশে এসে হাজির হলো সাহিত্য সিনেমার মিশ্রণে গড়ে ওঠা নতুন পত্র-পত্রিকা। সেগুলোও পাঠক সমাজে আদৃত হলো। সাহিত্যিকদের তখন ওইসব সাহিত্য পত্রিকা সম্মান দক্ষিণাও বিশেষ দিতে পারত না।

কিন্তু বহুল প্রচারের জন্য নতুন ধরনের এই পত্র-পত্রিকাগুলো সাহিত্যিকদের ভালো টাকাই দিতে থাকে। ক্রমশ বনেদী সাহিত্যিকরাও এবাব এসব কাগজে লিখতে শুরু করলেন।

একজন প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক বলেন—কেন এখানে লিখব না। এরা হাটের তোলা কুড়িয়ে মন্দিরে প্রণামী দেয়। এরাই সাহিত্যিকদের কিছু আর্থিক সাচ্ছলা এনেছেন। সমীরও লেখে ওই পত্রিকায়। সম্পাদকও তারই সমবয়সীর ফলে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সাহিত্যেরও রূপান্তর ঘটছে।

তখন পত্রিকায় পূজা সংখ্যা নিয়ে এত হই চই হতো না। ক্রমশ ওই সব পত্রিকার পূজা সংখ্যা হাজার হাজার কপি বিক্রি হতে লাগলো। ফলে সাহিত্য পত্রিকাগুলোও পূজা সংখ্যা বের করতে শুরু করলো।

তখন উপন্যাস ছিল পূর্ণাঙ্গ। একটা উপন্যাসই থাকতো পত্রিকায়। ক্রমশ উপন্যাস-এর আকারও ছোট হয়ে 'নভেলেট' এর প্রবর্তন হলো। আর প্রতি সংখ্যায় একটা করে 'নভেলেট'ও প্রকাশিত হতে শুরু করতে পাঠকরাও নতুন কিছু পেয়ে খুশিই হলো।

আর পূজা সংখ্যায় পাঁচ ছ জন প্রতিষ্ঠিত লেখকের ওই নভেলেট, অন্যদের ছোট গল্প সেই সঙ্গে কলকাতা বোম্বাই সিনেমার নানা খবর, ছবি এসব মিলিয়ে সেই পত্রিকা খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠলো।

তখন বাংলা ছায়াছবি ছিল রুচিবান সাহিত্যধর্মী। সাহিত্যিকদের গল্প-উপন্যাস থেকেই সেগুলো সিনেমায় রূপায়িত হতো। আর এই পত্রিকা থেকে নামী লেখকদের অনেক গল্প-উপন্যাস নিয়েও ছায়াছবি গড়ে উঠতে লাগলো।

সাহিত্যক্ষেত্রের এই প্রসার ঘটেছিল এইভাবেই সেই যুগে। সমীর তার সেই ছিন্নমূল জীবনের সংগ্রাম, প্রীতি ভালোবাসা হারানো জন্মভূমির মর্মবেদনা নিয়েই লিখেছিল উপন্যাসটা। ওই পত্রিকার সম্পাদক ভবেনবাবু লেখার মধ্যে সার্থকতার বীজ খুঁজে পেতো। ভবেনবাবু বলে,

—অথর, লেখাটা উৎরেছে হে। ছাপবো।

সমীর বলে—দেখুন। কেমন হয়।

কপিটা সম্পাদককে দিয়ে আসে।

রোহিণীর যাত্রা থামেনি। এগিয়ে চলেছে। এর মধ্যে রোহিণী বিয়েও করেছে। ঠিক করেনি। করতে বাধ্য হয়েছে বাবার চাপেই। মা নেই—বাবা অন্য ছেলেদের নিয়ে থাকেন। বাড়ির অবস্থা ভালোই। ছেলেরাও চাকরি করে।

রোহিণীর গান এখন প্রায়ই রেকর্ড হচ্ছে। গানের জগতে এখন সে সুপরিচিত। কয়েকটা ছবিতেও গান লিখেছে সে। সিনেমা জগতেও যাতায়াত করে এখন বেশি। সমীর বলে--রোহিণী, গান লিখছ লেখো। এত সিনেমা স্টুডিওতে ঘোরাঘুরির কি দরকার? ওতে নিজের কাজের ক্ষতি হয়। রোহিণী এখন ছায়াছবির জগতের স্বপ্ন দেখছে।

সে দেখেছে ছবির জগৎটাকে। একটা নেশার মতই যেন ওই জগৎ তাকে আকৃষ্ট করে। দেখেছে টাকার খেলা। একজন পরিচালক ছবি করতে পারলে ভালোই রোজগার করে। তার তুলনায় লেখক, গীতকার যা পায় তা সামান্যই। আর প্রচারের বেশিটাও পায় পরিচালকই।

রোহিণী বলে সমীরকে —লিখে, গান লিখে কত পাবে সমী? একটা ছবি করতে পারলে আর সে ছবি হিট করাতে পারলে আর পিছন ফিরে চাইতে হবে না। চাকরি করে কি পাবে? চিরকাল কেরানিগিরি করেই চলে যেতে হবে। কেউ চিনবে না। সমীর বলে---তবু তোমার গানের জন্যই চিনবে।

—ওখানেই থামবো না। আমি ছবিই বানাবো। পরিচালক হবো। অবাক হয় সমীর—কি বলছ? চাকরি করে গান লিখছ লেখো—ওসব করতে যেও না।

রোহিণী তখন অনেক দূর এগিয়ে গেছে। বলে সে—আমি চাকরি ছেড়েই দোব। এই চাকরি ভালো লাগছে না। মনে হয় সময় নষ্টই করছি সামান্য কটা টাকা আর নিশ্চিন্ত জীবনের মোহে। আমি ছবিই করবো। প্রযোজকও পেয়ে গেছি। পরিচালক হবো।

সমীর বলে—কাজটা ঠিক করছ না রোহিণী। শিল্প সাধনার জন্য একটা নিশ্চিন্ত পরিবেশ চাই। অবশ্য ডাল-ভাতের, আশ্রয়ের সমস্যা তোমার নেই—

—তাই এই ঝুঁকি নিতেই হবে। দেখবে ছবি আমি করবোই। একটার পর একটা ছবি করবো। সবাই চিনবে আমায়। তাই চলে যেতে হবে আমায় এখান থেকে।

রোহিণী তার মনস্থিরই করে ফেলেছে। পদত্যাগপত্রও দিয়েছে।

এই অফিসের পরিবেশে সমীরের একটা আশ্রয় ছিল রোহিণী। দুজনে দুই পথের পথিক। তবু মূলত সংস্কৃতিপ্রেমী। তাই তাদের মধ্যে অন্তরের মিল ছিল খুবই। সমীরও তার কাছে পেয়েছে অনুপ্রেরণা। তার সাহিত্য সৃষ্টির কাজে রোহিণীর অবদানও কম ছিল না। সমীরও তাকে উৎসাহিত করেছে।

রোহিণী ক'দিন অফিস আসেনি। সমীর গেছে ওর বাড়িতে। রোহিণী তখন বাইরের ঘরে কী সব লেখার কাজে ব্যস্ত।

—এসো।

সমীর বসে। রোহিণীর স্ত্রীও আসে। সেও শুনেছে রোহিণী চাকরি ছেড়ে দিতে চায়। তাই

রোহিণীর স্ত্রী উমা বলে—আপনি ওকে বলুন, গান লিখছে লিখুক। চাকরি করেও এটা করা যায়। তাই বলে সরকারি চাকরি ছেড়ে সিনেমা লাইনে যাবে?

সবটাই অনিশ্চিত ব্যাপার। তারপর ছবি যদি না চলে কি হবে? রোহিণী বলে—আমার ছবি হিট করবেই। যা গল্প লিখছি—একেবারে দারুণ। আর গান—সবকটাই হিট করাব। দেখবে সমীর—রোহিণীকে কেউ আটকাতে পারবে না।

রোহিণীর বাবা বৈকালিক ভ্রমণে গেছলেন। সমীরকেও চেনেন তিনি। ডেকে বলেন—তুমি তো চাকরি করেও লিখছ। তোমার বন্ধুর এই ঘোড়ারোগ ধরলো কী করে? লিখছিস তাই লেখ। তা নয়, যাবে ছবি করতে। একটু বুঝিয়ে বলো ওকে। বিয়ে-থা করেছে। দায় দায়িত্ব বেড়েছে। এসব কথা ভাবতে হবে তো?

রোহিণীকে বলে সমীর। রোহিণী তখন অন্যজগতের স্বপ্ন দেখছে। পরিচালক হবে। গাড়ি বাড়ি-টাকা-নাম যশ হবে। সামান্য কেরাণীগিরির মোহ তার ভঙ্গ হয়ে গেছে।

রোহিণী এখন আর চাকরিতে নাই। চাকরি ছেড়ে এখন ছবির জগতে হারিয়ে গেছে। সমীরের মনে হয় সেও যদি মুক্তির পথ পেতো আরও মন দিয়ে সাহিত্য করতে পারতো। কিন্তু দেখেছে বাংলার সাহিত্যিকদের প্রায় সকলকেই অন্য কিছু কাজকর্ম করে তবে সাহিত্যকর্ম করতে হয়। সাহিত্যসেবা এখানে পেশায় তখনও পরিণত হয়নি। নেশাতেই পর্য্যবসিত রয়েছে। তাই এখানে রয়েছে নিষ্ঠা-আন্তরিক চেষ্টা। তাই সাহিত্যক্ষেত্রে সৃজনশীলতা রয়েছে। সাহিত্যিকরা সাহিত্যকে নিছক বেসাতিতে পরিণত করেনি।

তাছাড়া সমীরের উপর সারা সংসারের দায়িত্ব। প্রবীর কলেজে পড়ছে তাঁর খরচ আছে, সুবীরও এবার ক্লাশ নাইনে উঠবে। আর মাও এবার ভাবছে মিনার বিয়ের কথা। তার জন্যও খরচা কিছু আছে। সমীর যেন গোয়ালে বাঁধা গরু, গাড়ি তাকে টানতেই হবে। ছেড়ে পালাবার পথ নাই। তাই চাকরি তাকে করতেই হবে।

তবে সহজে থামবে না সে। ওই বোঝা টেনেও তাকে ঠেলে উপরে উঠতে হবে।

শ্যামলীর সঙ্গে তার দেখা প্রায়ই হয়। শ্যামলীকে নসুদার মেয়ের কথাও বলেছে। কাজলী ফটিকের সঙ্গে গেছে দু মাসেরও বেশি। এখনও নসুদা তাদের হদিস করতে পারেনি। ফটিককে দু'একবার পাড়ায় দেখা গেছে। হরেকেষ্টবাবুর জিপে ও মাইক ফুঁকে প্রচার করছে।

নসুদা তাই দেখে থানায় গেছে। বলে পুলিশকে

—ফটিক এখানেই এসেছে দারোগাবাবু। ওকে ধরুন।

দারোগাবাবু বলে—কোথায় এসব শুনলেন মশায়? আমরা হন্যে হয়ে খুজছি ব্যাটাকে। পাত্তা পাচ্ছি না। আর আপনি বলেন—এখানে এসেছে।

—আমি নিজে দেখেছি তাকে হরেকেষ্ট বাবুর মিছিলে?

দারোগা বলে—ঠিক আছে। আমি আজই দেখছি। পেলে হাতকড়ি দিয়ে আনবো থানায়।

অবশ্য ওই পর্যন্তই। ফটিককে ধরা হয়নি কাজলীর খোঁজও মেলেনি। শ্যামলী বলে—মেয়েটা শেষে এইসব করলো?

সমীর বলে—বিনা পরিশ্রমে, বিনা সাধনায় অনেক কিছু পাওয়ার স্বপ্নই দেখেছিল

কাজলী। নিজে তো দেখছো শ্যামলী—কোন কিছু পেতে গেলে তার মূল্য দিতে হয়। ওরা অনায়াসেই অনেক কিছু পেতে চেয়েছিল। নুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গেছল—তারপর যা হয় তাই হয়েছে।

শ্যামলীও ভাবছে কথাটা। বলে সে,

—এই শহরের মোহের আবর্তে পড়ে অনেকেই হারিয়ে যায় সমী। ছেলে-মেয়ে সবাই। তাই মনে হয় সংযম আর চিন্তা-ভাবনার দরকার। নসুদা—বৌদি এখন কেমন আছে?

—ওই এক রকম। বলে—মেয়েটা যেখানে থাক সুখে থাক এটা জানতে পারলে কলকাতা ছেড়ে গ্রামেই ফিরে যাবো। আমাদের গ্রামই ভালো।

শ্যামলী বলে—সভ্যতার কালো ছায়া শহরকেই নয়, এবার গ্রামকেও গ্রাস করবে সমী। মানুষের পালিয়ে বাঁচার পথ কোথাও থাকবে না। পালানোর চেয়ে এর সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে।

ওরা গোলদিঘীর এককোণে বসে কথা বলছে। হঠাৎ করে ডাক শুনে চাইল। শ্যামলীও দেখেছে লোকটাকে।

সমীর অবাক হয়—মনুকাকা!

তাদের গ্রামের মনতোষ মাস্টার। গ্রামের স্কুলেই মাস্টারি করে। লোকটার অনেক রকম ধান্দা। শীর্ণ পাকানো চেহারা। মাথার চুলগুলো ছোট করে ছাঁটা। যাতে টিকিটার অস্তিত্ব সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়। পরনে খেঁটে ধুতি, ক্ষারে কাচা সার্ট। তার উপর একটা চাদর জড়ানো। পায়ে লাল ধুলোমাখা বিবর্ণ কেডস্। গ্রামের লোক ওকে মনতোষ নয় আড়ালে 'মনরোষ' বলেই ডাকে।,

তবু অচেনা শহরে মনু মুখুয্যে এদের দেখেই খুশি হয়। তবে শ্যামলীকেও এখানে সমীরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে এক ঠোঙা থেকে চিনেবাদাম চিবুতে দেখবে তা ভাবেনি। মনু মুখার্জি সমীরের খোঁজেই যাচ্ছিল। বলে সে—যাক এখানেই তোমাদের দেখা পেলাম। তা শ্যামলীও কি কাছাকাছিই থাকো? পড়াশোনা কেমন হচ্ছে?

শ্যামলী বলে—ভালোই। আমি ওদিকেই থাকি। আমার হোস্টেল কাছেই।

মনুও বসেছে। বলে—উঃ বুঝলে স্কুলের পুরস্কার-এর বইপত্র কিনতে এসেছিলাম হে। হেঁটে হেঁটে এ দোকান সে দোকানে বই কিনে পা হাত টাটিয়ে গেছে। ভাবলাম নসুর ওখানেই যাবো। তা ঠিকানাটা আনতে ভুলে গেছি। ভাগ্যিস তোমার ঠিকানাটা এনেছিলাম।

ব্যাগটা নামিয়ে এবার কলসী নিয়ে একজন চাওয়ালাকে ডেকে বলে,—চা দে বাবা। দুখানা বিস্কুটও দিবি।

চা খেতে থাকে। সমীর বলে—গ্রামের খবর ভালো তো? শ্যামলীদের বাড়ির খবর?

মনু মুখুয্যে বলে,

—গ্রামের হালচাল বদলাচ্ছে হে। এবার দুর্গাপুরের দামোদরের উপর ব্রিজ হবে শুনছি। আর দুর্গাপুরের জঙ্গল সব সাফ। সেখানে সব কারখানা হচ্ছে।

চাওয়ালা বলে—বাবু দামটা।

মনু মুখার্জি বলে—সমী, খুচরো নেই হে। দামটা দাও তো, পরে দিয়ে দোব।

সমীর দামটা দিয়ে দেয়। শ্যামলী বলে,—চলি। হোস্টেলে ফিরতে হবে।

মনু মুখুয্যে বলে—হ্যাঁ, এসো মা। মন দিয়ে পড়াশোনা করো। গ্রামের মুখ উজ্জ্বল করো। ওই নসুর মেয়েটার কেচ্ছা যা শুনছি, রাম রাম। শ্যামলী চলে যায়।

মনু মুখুয্যে বলে—বড় ভালো মেয়ে হে। তা সমী—চলো, আজকের রাতটা তোমার মেসেই থাকবো। নসুর ওখানে যেতে আর প্রবৃত্তি হয় না হে। একেবারে নাটকীয় কাণ্ড বাধালো। শহরে এসে দুর্মতিই হয় হে। খুব অপবিত্র স্থান। চলো—

সমীরও বুঝেছে মনুকাকা আজ তার ঘাড়েই চাপবে। মেসেই আনে মনু মুখুয্যেকে। মনু মুখুয্যে বলে—একতলাতেই থাকো বুঝি? ঘরটা কেমন স্যাতসেঁতে হে।

সমীর বলে—বেশ নিরিবিলি—

—হ্যাঁ। তুমি শুনি আবার কাব্য টাব্য লেখো টেখো। তা বাপু ওসব বৃথা শ্রম না করে দু-পাঁচটে টুইশনিই করো না কেন? কলকাতায় শুনি এতেও ভালো টাকা দেয় টেয়। গাঁয়ের মত দশটাকা রেট এখানে নয়। কাব্যি করে কী হবে?

সমীর জবাব দেয় না।

রাতে খাবার খেতে বসেও মনুকাকা বলে,

—রাতে একপিস করেই মাছ বুঝি? কিন্তু বাপু তোমাদের চালটা বেশ মোটা। মিহি চালের ভাত চলে না বুঝি?

সমীর জবাব দেয় না। লোকটা কোথাও যেন ভালো কিছুই দেখে না, অযাচিতভাবে এসে জুড়ে বসেছে।

পরদিন মনুকাকা বলে—সমীর, একটা ভুল করে ফেলেছি হে। বুঝলে কাল বেশি টাকার কেনাকাটা করেছি। হিসাব করিনি। এখন রাস্তা খরচা-গাড়িভাড়া টাড়ায় টান পড়েছে। গোটা পঞ্চাশ টাকা যদি দিতে পারতে আমি বাড়ি গিয়েই তোমার মাকে টাকাটা দিয়ে দেব। টাকাটা না হলে যে বিপদে পড়বো বাবা।

সমীর টাকাটা কাল এক প্রকাশকের কাছে পেয়েছিল। তার থেকে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে বলে—এটা মাকেই দেবেন কাকা।

—ও নিয়ে ভেব না। কালই ফেরত দিয়ে দোব তোমার মাকে ফিরে গিয়েই। মনু মুখুয্যে খেয়েদেয়ে ফেরে টাকাটা নিয়ে।

এর ক'দিন পর শ্যামলীই শমীরকে বলে,— তোমার মনুকাকার কথা শুনেছো?

—কী হলো?

—মাকে গিয়ে বলেছে আমি নাকি পড়াশোনা ছেড়ে বাজে ছেলেদের সঙ্গে মিশছি। এখান-ওখানে বেড়াচ্ছি।

সমীর অবাক হয়। বলে সে—সেকি! এইসব বলেছে!

—মা তো রীতিমত চিন্তিত।

সমীর বলে—আচ্ছা লোক তো। নিয়ে গিয়ে রাখলাম—আর উল্‌টে বোধ হয় আমার নামেও বলেছে যা তা। যেতে দাও ওর কথা। টাকা দিলাম সেটাও বোধ হয় চেপে গেছে।

সমীরের সেই উপন্যাসটা বের হয়েছে পত্রিকায়। উদ্বাস্তু জীবন নিয়ে এই ধরনের লেখা বের হয়নি আগে। বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করে লেখাটা। আর সেদিন পত্রিকার অফিসে যেতে

প্রশান্তবাবু বলে,—অথর। সুরেশবাবু তোমার লেখাটা পড়েছেন। তোমার খোঁজ করছেন। তিনি কটা ছবি করতে চান।

সুরেশবাবু বর্তমানে বাংলা ছবির নামকরা পরিচালক। তাঁর ছবি কয়েকটা এর মধ্যে সারা ভারতে খ্যাতি লাভ করেছে। আন্তর্জাতিক বাজারেও গেছে সে সব ছবি। গুণী পরিচালক।

সমীর ভাবতেই পারে না যে তার লেখার ছবি করবেন সুরেশবাবুর মত পরিচালক। প্রশান্তবাবু বলে,

—তোমার কাছে যাবে ওর লোক। সুরেশবাবু কাজের মানুষ। ওর কথাতে রাজি হয়ে যেও। ছবিটা বোঝেন উনি। একটা ভালো ছবিই হবে।

পরদিনই এক ভদ্রলোক সমীরের অফিসেই আসে। বলে সে—সুরেশবাবুর ওখান থেকে আসছি। আজ বৈকালে ওর স্টুডিও অফিসে যদি একবার এসে দেখা করেন ওর সঙ্গে ভালো হয়।

সমীর বলে—সন্ধ্যা ছটার সময় যেতে পারি।

—তাই বলবো ও'কে। ভদ্রলোক চলে যায়।

টালিগঞ্জের ট্রাম ডিপোর কাছে পথটার ওদিকে সারবন্দী দেওদার গাছের ছায়া নেমেছে। এদিকটা এখনও নির্জন। গাছ-গাছালি ঘেরা বাংলো ধরনের বাড়ি। সন্ধ্যার পর লোক চলাচলও কমে যায়।

এরমধ্যে টালিগঞ্জের আরও ভিতরে বিস্তীর্ণ হোগলাবন-জলার ধারে বেশ কিছু উদ্বাস্তু পরিবার এসে জুটেছে, তাতেও এদিকের নির্জনতা কমেনি। তবে যে হারে উদ্বাস্তুরা আসছে, খালি বাগান, হোগলাবন, জলা দখল করছে তাতে এই নির্জনতা আর থাকবে বলে মনে হয় না।

প্রাচীনকালে এটা কোনো ধনী জমিদারের বাগান বাড়িই-ছিল। জমিদার আর নাই। এখন এটাকে সাজিয়ে গুছিয়ে একটা স্টুডিও বানানো হয়েছে। কালী ফিল্মস্ স্টুডিও।

টালিগঞ্জ অঞ্চলে ট্রাম-ডিপোর পিছনে ইন্দ্রপুরী স্টুডিও। ওখানে রোহিণীর সঙ্গে এসেছে সমীর। শৈলজানন্দবাবু ওখানেও সুটিং করেন। এদিকে কালী ফিল্মস স্টুডিওর ওদিকে একটা ছোট স্টুডিও রয়েছে। ফিল্ম কর্পোরেশন-এর স্টুডিও। তারপর কিছু আগেকার বসতি, আমবাগান, পুকুর, তার ওদিকে ঐতিহ্যময় নিউ থিয়েটার্স স্টুডিও। সুন্দর সাজানো বাগান। একটা খড়ের গোলঘর, পাশের পুকুরে শাপলা শালুক, বাঁশবন সবই আছে।

কালী ফিল্মস্ পরে যৌথভাবে কয়েকজন টেকনিশিয়ান মিলে পরিচালনা করতেন। তারপর সরকার ওটা অধিগ্রহণ করে। নামকরণ হয় টেকনিসিয়ান্স স্টুডিও।

টালিগঞ্জ এলাকায় এছাড়াও ছিল রাধা ফিল্মস্, ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিও, উত্তরে ছিল এম-পি স্টুডিও। ইস্টার্ন টকীজ। কিন্তু কালক্রমে উত্তরের সব স্টুডিওই বন্ধ হয়ে যায়। দক্ষিণের কয়েকটা এখনও টিকে আছে। ওইখানেই সব কেন্দ্রীভূত।

সুরেশবাবুর ঘরটা একদিকে। দীর্ঘ ফর্সা রং উন্নত নাসা, পরনে ধুতি-পাঞ্জাবী। সমীরকে দেখে বলে,—আসুন।

এই প্রথম একজন বড় মাপের পরিচালকের মুখোমুখি বসেছে সে। সুরেশবাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। অধ্যাপনার লাইনে না গিয়ে এই পথেই এসেছেন।

চা এসেছে। সুরেশবাবু চায়ের পর পকেট থেকে বিড়ির বাণ্ডিল বের করে একটা বিড়ি ধরিয়ে লম্বা টান দিয়ে বলে,

—আপনার লেখাটা পড়লাম। আজকের একটা বার্নিং প্রবলেমকে নিয়ে লিখেছেন। আমি নিজে পূর্ববঙ্গের লোক। এই দেশ ভাগকে আমি মেনে নিতে পারিনি। এর সর্বনাশা পরিণতিই হবে, তবু মানুষ বাঁচবেই। বাঁচার লড়াই তার থামবে না। এই কথা আমিও বিশ্বাস করি, তাই এই ছবি করবো।

সমীর ওর কথাগুলো শুনছে। তার চিন্তাধারার সঙ্গে মিলছে ওর কথা, দৃষ্টিভঙ্গি। সুরেশবাবুর সম্বন্ধে আগে শুনেছিল! তরুণ সুরেশবাবু নাকি উদ্ধত, মুখের উপর যা তা বলতে পারে। তাবড় এক অভিনেতা ওর আগের ছবিতে অভিনয় করার সময় নানাভাবে ওকে বিব্রত করেছিলেন।

একবার একটা সেটে অভিনয় করার সময় সেই অভিনেতা সংলাপ চলার পর প্রশ্ন করেন—ঠিক আছে তো?

তাঁর অভিনয় প্রসঙ্গে কারোও কিছু বলার সাহস ছিল না। কিন্তু সেটের কলাকুশলী, অন্য অভিনেতাদের সামনে মুখের উপর সুরেশবাবু বলে ওঠে,

—কিস্যু হয়নি।

নামী অভিনেতার ফর্সা রং তামাটে হয়ে ওঠে। তিনি সংযত কণ্ঠে বলেন,

—তাহলে কেমন চান?

এবার সুরেশবাবু বিড়িতে শেষ টান দিয়ে লম্বা দেহ নিয়ে ফ্লোরের একতলা থেকে ওই সংলাপগুলো বলতে বলতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে ফ্রেম আউট হয়ে যান। সারা ফ্লোরে স্তব্ধতা নামে। সেই নামী অভিনেতা ওর মুখের ভাব-সংলাপ এর মধ্যে অভিনয় দেখে হতবাক হয়ে যান। পরে সেই ভাবেই অভিনয় করেন।

আর তারপর থেকে সুরেশবাবুর সঙ্গে সবরকম সহযোগিতাই করেন।

সমীর কিন্তু লোকটির মধ্যে দেখে গুণগ্রাহী মানসিকতাকে। ওই দিনই চুক্তিপত্র সই হয়ে গেল। সুরেশবাবু বলে,

—সমীরবাবু, একটা ভালো গল্প যদি সিনেমাকে দিতে পারেন, সিনেমাজগৎও আপনার কাছে ঋণী থাকবে।

সন্ধ্যা নেমেছে। সুবেশবাবু বলে,

—দেখুন উপন্যাস, গল্প সাহিত্যের ভাষা তার প্রকাশভঙ্গির একটা স্বকীয়তা আছে। তেমনি এই সিনেমা অর্থাৎ সেলুলয়েডেরও একটা ভাষা আছে। তার জন্য চিত্রনাট্য নতুন আঙ্গিকে লিখতে হয়। গল্প-উপন্যাস তো লিখছেন, এটাও লিখতে চেষ্টা করুন। আখেরে কাজ দেবে। এই সিনেমা মিডিয়মও একটা শক্তিশালী মিডিয়ম। এখানে ভালো লেখক আসা দরকার।

সমীর কথাটা ভাবছে। এর আগে হলিউডের বিখ্যাত ছবিগুলোও হয়েছে সাহিত্য থেকে। গন উইথ দি উইন্ড, হাউ গ্রীন ওয়াজ মাই ভ্যালি, উইদারিং হাইটস্, জুয়েল ইন দি সান,

গ্রেপস্ অব রাথ, গ্রোথ অব দি সয়েল, গুড বাই মিঃ চিপস, অ্যাডভেঞ্চারস অব মার্ক টোয়েন—বহু সাহিত্যধর্মী ছবি দেখেছে, মূল উপন্যাসও পড়েছে। দেখেছে কীভাবে গ্রহণ বর্জন করে সেই সব উপন্যাস থেকে সার্থক বিশ্বনন্দিত ছবি হয়েছে। বাংলা ছায়াছবিতেও রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, উপেন গাঙ্গুলি, তারাশঙ্করবাবু আরও অনেকের কাহিনীর সার্থক চিত্ররূপ হয়েছে। শৈলজানন্দ, প্রেমেন মিত্র, প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর মতো সাহিত্যিকরা এসেছেন। চিত্রনাট্য লিখেছেন তারা। নৃপেন চট্টোপাধ্যায়, বিনয় চট্টোপাধ্যায়ের মত প্রতিভাবান লেখকরাও ছবির জন্য চিত্রনাট্য রচনা করেছেন। হলিউডেও নাম করা লেখকরাও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন।

এটাও সাহিত্যের একটা ধারা। নাটক হয় মঞ্চে। চিত্রনাট্য অবলম্বনেই হয় সিনেমা। সুরেশবাবু বলে,

—অথর, যদি 'ইগোর' বাধা না থাকে আমার সঙ্গে হাত মেলাতে পারেন চিত্রনাট্যের কাজে।

সমীরও রাজি হয়ে যায়।

এমনি দিনে বাড়ি থেকে মায়ের চিঠি আসে। মিনার বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে। সমীর গ্রামে আসে। প্রবীর এর মধ্যে গ্রামের স্কুলেই মাস্টারি পেয়েছে। বাড়িতেই থেকে চাকরি। সংসারের সুরাহাও কিছুটা হয়েছে। পাশের গ্রামেরই ছেলে অরুণ। এককালে জমিদারি কিছু ছিল। বেশ কিছু শালবনও রয়েছে। তার আয়ও মন্দ নয়। আর ওই গ্রামে বেশ কিছু কারিগর কাঁসার বাসন তৈরি করে।

অরুণদের সেইসব কাঁসার বাসনের ব্যবসা। মোটামুটি সচ্ছল গৃহ। বাবা নাই, মা-ই সংসারের কর্ত্রী। দেনা-পাওনার কথা বলেছে প্রভাদেবী। কিছু নগদও দিতে হবে। গহনাও চাই। এছাড়া বিয়ের অন্য খরচও আছে। সব মিলিয়ে বেশ কয়েক হাজার টাকাই।

সমীর ভাবনায় পড়ে—এত টাকা হঠাৎ কোথায় পাই মা। আগেও জানাও নি। কোনরকমে আট-দশ হাজারের ব্যবস্থা করতে পারি। বাকি টাকা আসবে কোথা থেকে?

প্রভাদেবী বলে—টাকার জন্য ভাবিস না। টাকার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। গহনার ব্যবস্থাও। ছেলেটি ভালো—কাছাকাছিই থাকবে মিনা—তুই আর অমত করিস না বাবা।

—এত টাকা কোথায় পেলে মা?

প্রভা বলে—পরে বলবো।

সমী বলে—মনুকাকার হাতে একশো টাকা পাঠিয়েছিলাম দিয়েছে তোমাকে? গত মাসেই পাঠিয়েছি।

মা বলে—মনু ঠাকুরপো টাকা কড়ি তো দেয়নি,

—সেকি!

প্রভা বলে—উলটে অনেক আজেবাজে কথাই বলেছে গ্রামে। নসুর, নাকি কোন একটা গুণ্ডার সঙ্গে বের হয়ে গেছে। শ্যামলীর সম্বন্ধেও কি সব বলেছে। আর তুই নাকি একতলার একটা এঁদো ঘরে থাকিস। মেসের খাওয়া দাওয়াও খুব বিশ্রী। ওইভাবে মানুষ থাকে না।

সমীর বলে—তাই নাকি। তিনবেলা খেয়ে এল, ঘুমিয়ে এলো আর এইসব বলেছে!

টাকাও দেয়নি?

প্রভা বলে—ও ওই রকমই। শ্যামলীর নামেও কিসব বলেছে। বিভূতি ঠাকুরপোও রেগে গেছে।

সমীর বলে—বিচিত্রলোক তো।

পথেই মনু মুখুয্যেকে ধরে সমীর। মনু মুখুয্যে ভাবতে পারে নি যে সমীর গ্রামে আসবে এত তাড়াতাড়ি। সমীরকে দেখে মনু তোবড়ানো গালে হাসি ফুটিয়ে বলে,

—আরে সমীর যে। কবে এলে?

সমীর ওর কথার জবাব না দিয়ে বলে,

—কাকা, টাকাটা মাকে দেননি মা বলছিল।

মনু মুখুয্যে অবাক হয়—টাকা! কিসের টাকা?

—একশো টাকা দিলাম, মাকে বাড়িতে দিয়ে দেবেন বললেন। গাড়িভাড়াও ছিল না।

মনু মুখুয্যে বলে—টাকা! আরে ইস্কুলের ফান্ডই সঙ্গে ছিল আমার, তোমার কাছে টাকা নিতে হবে কেন? ভুল করছ তুমি।

সমীর অবাক হয় ওই লোকটার কথায়। বলে,

—এতবড় মিথ্যা কথাটা এত সহজে যে বলতে পারে—গ্রামে এসে সে অকৃতজ্ঞের মত কথাই বলবে তা জানি। ছি, ছিঃ একশোটাকার জন্য নিজের বিবেককেও বিক্রি করতে বাধল না? আপনি না একজন শিক্ষক, ছেলেদের এই সবই শেখান?

মনু মুখুয্যে এবার জ্যামুক্ত ধনুকের মত সিধে হয়ে ফুঁসে ওঠে।

—কি যা তা বলছ?

সমীর বলে—আপনাকে আশ্রয় দিয়েই ভুল করেছিলাম। উপকার করেছিলাম অচেনা শহরে, আর জিবের যত গরল আছে সব উগ্‌রে দিয়ে সেই উপকারের প্রতিদান দিয়েছেন। বলুন—টাকা নেননি? আমার মেসে থাকেননি?

মনু মুখুয্যে বলে—এসব ঠিক কথা নয়। ইস্কুলের হিসাবেই দেখবে হোটেল চার্জ বাবদ খরচা লেখা আছে। আমি হোটেলেই ছিলাম হে। প্রমাণ আছে কিছু তোমার? টাকার কথা বলছ—প্রমাণ আছে?

মনু মুখুয্যে জোর গলায় চীৎকার করতে করতে চলে যায়। গোষ্ঠ বিহারী, শম্ভু মুদি বলে—আর লোক পেলে না সমী ওই বিটলে শয়তানকে আশ্রয় দিয়েছিলে। টাকা দিয়েছিলে। ও আমার দোকানের মাল খেয়ে স্রেফ বলেছিল—টাকা দিয়ে দিয়েছি। এক নম্বর ঋণপাড় হে।

শ্যামলীদের বাড়িতেই গেছে সমীর।

শ্যামলীর বাবা বিভূতিবাবু কুশল সংবাদ নেন। শ্যামলীর কথাও জিজ্ঞাসা করেন।

সমীর বলে—শ্যামলী ভালোই পড়াশোনা করছে। আশা করছে ফার্স্টক্লাশ পাবে। রিসার্চ স্কলারশিপ পাবে।

বিভূতিবাবুর স্ত্রীও এসেছে। বিভূতিবাবু বলেন,

—শোন শ্যামলীর মা। তোমার মেয়ে রিসার্চ স্কলার হবে।

মা বলে—তবে যে মনু ঠাকুরপো বলছিল—আজে বাজে ছেলের সঙ্গে মিশছে। আমার

যা ভয় করছিল।

সমীর বলে—ওই লোকটা এক নম্বর বেইমান, মিথ্যাবাদী কাকীমা। আমিই ওকে মেসে রাখলাম-ফেরার সময় ট্রেন ভাড়া ছিল না, টাকা দিলাম। আজ বলে তোমার মেসেই ছিলাম না, হোটেলে ছিলাম। টাকাও দাওনি তুমি।

বিভূতিবাবু বলেন—সেকি। তোমাকেও ঠকালো, স্কুল কমিটিকেও ভুয়ো হোটেলের বিল দিয়ে দু তিনশো টাকা ঠকালো?

—তাই দেখছি। শ্যামলীর মা বলে, কি বাজে কথা সব বলছিল।

—ওদের এই সবেই আনন্দ। একেবারে গ্রাম্য নীচতারই পরিচয় ওরা। তবে সমী ওরাই গ্রামের সব নয়। যেতে দাও ওসব কথা। এখন তো পত্র-পত্রিকায় দেখি তোমার লেখা। ওটা চালিয়ে যাও। চাকরিটাও করে যাও। দুদিকের কাজে পরিশ্রম বেশি হবে। কিন্তু কিছু পেতে গেলে পরিশ্রম তো করতেই হবে।

সমীর এখন লেখার জগতে ধীরে ধীরে পরিচিতি লাভ করছে। তাকে আরও এগিয়ে যেতে হবে। মহানগরীতে সে নিঃসঙ্গ অপরিচিত। তার পিছনেও মদত দেবার কেউ নাই। একটি অপরিচিত জনকে লড়াই করে সমাজে ঠাঁই করে নিতে হবে। সে থামবে না।

সমীর গ্রামে এসেছে ক'দিন। বিয়ের বাজারপত্র করতে সদর সহরে যেতে হচ্ছে। গ্রামে কিছুই মেলে না। প্রবীরও সামলাচ্ছে এদিকের হাঙ্গামা।

সেদিন পারুল বৌদি এসেছে বাড়িতে। জেঠিমার বড় ছেলে রমেনদার স্ত্রী। দেবেন এখন স্কুলের ক্লাশ নাইনে পড়ছে। বছর দুয়েক ফেল করার পর এখন স্কুলের দিকে আর যায় না। বাড়িতে চাষবাস এর কাজই দেখাশোনা করে। আর গ্রামের আটচালায় বসে নানা সমস্যার সমাধান করে গ্রামের মানুষের। এর মধ্যেই সে আইন কানুন কোর্ট-কাছারির ব্যাপারও জেনেছে। গ্রামের কিছু মানুষের কোর্ট-কাছারির ব্যাপারও সেই সামলায় অবশ্য তার বিনিময়ে কিঞ্চিৎ অর্থাগমও হয় তার।

রমেনদাকে দেখেনি সমীর। সেই দুর্ভিক্ষের সময় ধান চাল তাদের ছিল না। কেউই দেয় নি। রাতের অন্ধকারে রমেনদাই তাদের মুখের অন্ন জুগিয়েছিল তার মায়ের অগোচরে।

সমীর অবশ্য সেই ধানের দাম রমেনদাকে দিয়েছিল। রমেনদা বলে,—দাম দিচ্ছিস সমী?

সমীর জানে রমেনদার রোজকারপাতি নাই। ইদানীং শরীরটাও ভালো যাচ্ছে না। প্রায়ই জ্বর হয়। চিকিৎসা বলতে পাশের গ্রামের রমণ ডাক্তারের কাছে দু-চারটি বড়ি নিয়ে এসে খায় মাত্র। জেঠিমা করালীই ওই সংসারের কর্ত্রী। ওরা বেকার রমেনদাকে তেমন কিছু দেয় না।

এখন দেবেন নক্কা ছক্কা করে মাঝে মাঝে দু দশটাকা রোজগার করে। সে সেটা নিজেই রাখে। জেঠিমা বলে,

—দুধের ছেলে, ও সংসারে কি দেবে? একটা বুড়ে-দামড়া সংসারে বসে খাচ্ছে। বৌ তো পাটরানী। তাতে একটা মেয়ের জন্ম দিয়েছে, কে পার করবে ওই মেয়েকে? আপনি পায় না শঙ্করাকে ডাক।

রমেনদা সবই শোনে। এতদিন সে গ্রামে গান-নাটক-কৃষ্ণযাত্রা এসব নিয়েই ছিল। গ্রামের

সুর ছিল যেন সেইই।

সেই সুরও থেমে গেছে। বাড়ির বাইরের ঘরেই থাকে। সংসার তার কোন খবর রাখে না। সমীর টাকাটা দিতে রমেন বলে,

—এটা নেওয়ার ইচ্ছা ছিল না রে। মা তোদের অনেক ঠকিয়েছে। জমির ভাগও ঠিক মত করতে দেয়নি। কিছু ধান দিয়েছিলাম—কিন্তু টাকার আমার খুব দরকার, তাই নিতে হলো।

সমীর বলে—চিকিৎসা করাও বড়দা।

রমেন হাসে। ম্লান বিষণ্ণ হাসি। তাতে বেদনা-হতাশাই ফুটে ওঠে।

সেদিন পারুল বৌদিকে দেখে বলে সমীর,

—এসে অবধি রমেনদার ওখানে যেতে পারিনি। তাকে দেখছি না। কেমন আছে রমেনদা?

পারুল বৌদি ওর মেয়েটাকেও সঙ্গে এনেছে। সুন্দর ফুটফুটে মেয়ে। সমীর ওকে কোলে নেয়। পারুল বৌদির চোখে জল।

—বলে সে—তোমার দাদা আছে এক রকম।

প্রভাও ব্যস্ত। পারুল বৌদি কিছুক্ষণ থেকে বলে,

—যাই কাকীমা। পরে আসবো। দেরি হলে মা হাঁক-ডাক শুরু করবে। জানেন তো মা, ঠাকুরঝিকে।

চলে যায় বৌদি। সমীর শুধোয়—কি ব্যাপার মা?

প্রভা বলে—রমেনের টি বি হয়েছেরে, তার বাড়িতেই পড়ে থাকে। যত কষ্ট এই বেচারা বউটার। দিনরাত বড়দি ওকে গালমন্দ, শাপ-শাপান্ত করছে। যেন রমেনের অসুখের জন্য ওইই দায়ী।

—টি বি হয়েছে রমেনদার? চমকে ওঠে সমীর।

তাদের গ্রামে এই রোগ কয়েকজনেরই হয়েছে। করুণাদা, ভটচাযদের রজনীদারও। সুন্দর চেহারা ছিল রজনীদার। কর্ণের পার্ট করতো দারুণ। টি বিতে সেও মারা গেল। করুণাদা-ও গেছে। এবার পালা রমেনদার।

তখনকার দিনে বিধি ছিল দুরারোগ্য ব্যাধিই। সমীরের মনটাই বিষণ্ণতায় ভরে ওঠে।

ক'দিন বিয়ের হাঙ্গামাতেই কেটে যায়। মিনা-প্রবীর, সুবীরদের নিয়ে অতীতে এক তমসাচ্ছন্ন রাত্রিতে তারা সব হারিয়ে পরদেশ থেকে উৎখাত হয়ে ফিরে এসেছিল এই মাটিতে। সেদিন কীভাবে দিন চলবে তাদের জানা ছিল না।

আজ নিজেদের পরিশ্রমে এই মাটিতে পা রেখেছে। ছোট্ট অসহায় বোনের বিয়েও দিয়ে তাকে নিজের সংসারে পাঠিয়েছে। প্রবীরও এদিকটা সামলেছে, সুবীর ম্যাট্রিক পাশ করলে তাকে কলেজে পড়াবে। ছোট্ট এইটুন পিতৃহারা ছেলেটাকে সে বাবার অভাব বোধ করতে দেয়নি।

তা সমীর সব কাজের মধ্যে সংসারকেও ভালোবেসেছে। এই সব দায়িত্বকেই সে নিজের

ঘাড়ে তুলে নিয়েছে। প্রভাদেবীও তা জানে।

বিয়ে-থা চুকে গেছে।

সমীর এবার কলকাতায় ফিরবে। ছুটি শেষ হয়ে আসছে। কলকাতায় অফিসের কাজ ছাড়াও তার লেখার কাজ পড়ে আছে। দুটো উপন্যাস প্রেসে, তাদের একটা করে প্রুফ দেখার দরকার। নতুন লেখার কাজ আছে। সুরেশবাবুর সঙ্গেও চিত্রনাট্য নিয়ে বসতে হবে।

রমেনদার ওখানেও গেছল সমীর। বিয়েতে জেঠিমা করালী কেউ আসেনি। দেবেনও আসেনি। প্রভা-সমীর দুজনেই গেছল জেঠিমার কাছে।—তোমরা কেন যাবে না?

জেঠিমা বলে—এখান থেকেই আশীর্বাদ করছি। যাওয়া হবে না। দেবেন মানা করেছে।

সমীর অবাক হয়—সংসারের কর্ত্রী তুমি জেঠিমা। তুমি যাবে না?

করালী বলে—গোড়া কেটে আগায় জল দিতে আর হবে না। এখন এসো তো।

তবু সমীর বিয়ের রাতে রমেনদার বাইরের ঘরে যায় খাবারপত্র নিয়ে। পারুল বৌদিকেও আসতে দেয়নি ওরা।

রমেনদা বলে—জানতাম তুই আসবি সমী।

পারুল বৌদির অবস্থাও দেখছে সমীর। ঘরে একটা তক্তপোষে ময়লা বিছানা পাতা। ওষুধ বলতে কয়েকটা বড়ি আর এক শিশি মিক্‌চার। পারুল বৌদির পরনের কাপড়টাও ময়লা, জীর্ণ। সমীর বলে,

—খাবার কিছু এনেছি বড়দা। বৌদি—

রমেন খেতে ভালোবাসে। ইদানীং সুখাদ্য, মাছ মাংস এসব জোটে না। তাই খাবার দেখে খুশিই হয়।

পারুল বৌদি ভিতরের বাড়ির দিকে ভয়ে ভয়ে চাইল। ধরা পড়ে গেলে মুশকিলই হবে। সমীর বলে—আমি যাই বৌদি, পরে দেখা হবে। রমেনদা বলে—সবই তো দেখছিস সমী। এ রোগ আর সারবে না রে। আমি থাকতেই তোর বৌদি-মেয়েটাকে ওরা দেখে না। মরে গেলে ওদের কি যে হবে।

সমীর বলে,—এসব কথা কেন ভাবছো। দেখবে তুমি সেরে উঠবে।

হাসে রমেনদা। মলিন বিষণ্ণ হাসি। সমীরকে বলে,—তুই যা। পরে কথা হবে সমী।

...সমীরের মনে হয়েছিল রমেনদা যেন তাকে কিছু বলতে চায় সেটা পারুলবৌদির সামনে বলতে পারেনি।

মিনা শ্বশুরবাড়ি চলে গেল। একসঙ্গে সুখে দুখে ওরা জড়িয়েছিল। আজ সে তার সব ঋণ শোধ করে গেল মাকে একপাত্র ধান আর ষোল আনা দিয়ে। ঋণমুক্ত হয়ে চলে গেল নিজের ঘরে।

প্রভাদেবী কথাটা আগেই ভেবেছিল। বিভূতিবাবুর স্ত্রীর কোন আত্মীয়ের শহরে বাস-গাড়ির ব্যবসা। ওখানেই বাড়ি ঘর। তার এক মেয়ের সঙ্গে প্রভা সমীরের বিয়ে দেবার মনস্থ করে। মেয়েটিকে দেখিয়েও নিয়ে গেছে তারা বিভূতিবাবুর বাড়িতে এনে। প্রভারও পছন্দ হয়।

আর বিভূতিবাবুর সেই আত্মীয়ও বিভূতিবাবুদের কাছে ছেলের সম্বন্ধে শুনেছে, সরকারি

চাকরি করে। বাড়িঘরের অবস্থাও মোটামুটি। তারাও মত দেয়। আর প্রভাদেবীও কথা দেয় তাদের।

এবার সমীরকে বলে মা—আমার একটা কথা রাখতে হবে বাবা।

মায়ের কথায় চাইল সমীর।

বলে—এবার বিয়ে থা কর তুই। মেয়েটা ছিল, সেও চলে গেল। প্রবীর স্কুল নিয়েই ব্যস্ত। সুধাও কলেজে চলে যাবে। একা একা আমার দিন কাটবে কি করে?

সমীর অবাক হয়। বিয়ে করার কথা সে ভাবেনি। তাই বলে—এত তাড়া কিসের মা।

প্রভা বলে—বয়স তো হলো রে। কবে আছি কবে নাই, ঘর-সংসার তো বুঝিয়ে দিতে হবে তাকে। তাছাড়া তুই কি চিরকাল মেসেই পড়ে থাকবি?

সমীর মেসের সনৎ, দিবাকরদের দেখেছে! বিয়ে-থা ঘর-সংসার করেছে। গ্রামেই রেখেছে সকলকে। নিজেরা মেসেই থাকে— আর হিসাব করে কবে রিটায়ার করে দেশে ফিরে যাবে।

সমীর বলে—বেশ তো চলছে মা।

—না রে। এভাবে চলতে পারে না। আমি ওদের কথা দিয়েছি। বিভূতি ঠাকুরপোর সম্বন্ধীর মেয়ে। মেয়েটিও ভালো রে। তাছাড়া—

সমীর চাইল। বলে সে—ওদের জন্যই মিনার ওই ঘর করে বিয়ে দিতে পেরেছি রে। ওরাই টাকা দিয়েছে। আমি নিতে চাইনি—

অবাক হয় সমীর। এবার ব্যাপারটা বুঝতে পারে। বলে সে,—আমাকে জিজ্ঞাসা না করেই এতদূর এগিয়ে গেছো মা?

প্রভা বলে—উপায় ছিল না রে। বিভূতি ঠাকুরপো এত করে বললেন, ওর কথা ফেলতে পারলাম না। তুই মায়ের এই কথাটা রাখ বাবা। সংসারের জন্য অনেক করেছিস তুই। এটুকু কর মায়ের জন্য। আমি বলছি—ঠকবি না তুই। মায়ের আশীর্বাদ মিথ্যে হয় না রে।

সমীর ভাবছে কথাটা।

দেখেছে বাবা বেঁচে থাকতে মা অনেক ভালো অবস্থাতে ছিল। বাবা মারা যাবার পর নিঃস্ব হয়ে এই মাটিতে এসে ছেলে মেয়ে সংসারের জন্য সব কিছু ত্যাগ করেছে। একবেলা খেয়ে নানা দুঃখ কষ্ট সহ্য করে আজ তাদের দিন ফিরিয়েছে। সেই সর্বাংসহা ধরিত্রীর মত মায়ের এই কাতর আবেদনকে সে ফিরিয়ে দিতে পারে না।

মানুষ ভাবে এক, তার পথ চলার ছকটাকে নিজের মত করে সাজিয়ে নিতে চায়। কিন্তু অদৃশ্য কোন জীবনদেবতা যেন অলক্ষ্য থেকে তার গতিপথ নিয়ন্ত্রিত করে। এ যেন অদৃশ্য সেই জীবনদেবতারই নির্দেশ। সমীর বলে—যা ভালো বোঝো করো। এসব আমি ভাবিনি মা। প্রভাদেবী বলে—জীবনের পথে ভাবার বাইরেও অনেক কিছুই ঘটে রে। তাকে মেনেও নিতে হয়। প্রতিবাদ করে বীরত্ব দেখানো যায়।—তা সাময়িক। মেনে নিয়ে সহনীয় করে নিয়ে চললে জীবনের পথ চলাটা অনেক সহজই হয়।

সমীর বলে—এখন কলকাতায় ফিরি, তারপর ওসব ব্যাপারে মাথা ঘামিয়ো। প্রভা বলে—সামনে বৈশাখেই দিন করবো বলেছি।

সমীর মেসে ফিরেই খবরটা পায়। এতদিন এই মেসে সকলে একত্রে এক পরিবারের মত ছিল। বোমাতঙ্ক, মহাযুদ্ধ, মন্বন্তর, দাঙ্গার সেই দিনরাতের কথা ভোলেনি।

এই মেস বাড়ি এবার ছেড়ে দিতে হবে। মামলায় তারা হেরে গেছে হায়ার কোর্টে। এবার বাড়িওয়ালা বাড়ির দখল নেবে এদের তুলে দিয়ে। জগন্নাথ বলে—বন্দরের কাল হল শেষ।

এবার সমীরও ভাবনায় পড়ে। অফিসই নয় এখন কলেজ স্ট্রিট বই পাড়াতেও তাকে যাতায়াত করতে হয়। পত্র পত্রিকার অফিসে, টালিগঞ্জেও যেতে হয়। এই জায়গাটা মধ্য কলকাতায়। যাতায়াতের সুবিধা অনেক। এদিকেই থাকতে হবে তাকে।

জগন্নাথ, মৃগেনরাও ভাবনায় পড়ে।

ওরাও খুঁজছে। শেষ অবধি একটা ঘরের সন্ধান পাওয়া যায় মীর্জাপুরের ওদিকে। বাড়িওয়ালা নেই, তার দুই ছেলে আর মা।

বয়স্কা মহিলা দোতালায় থাকে। নীচে দুখানা ঘর ভাড়া দেবে। কিন্তু এই ছেলেদের ভাড়া দিতে চায় না। মহিলা বলে,—ফ্যামিলি নাই?

জগন্নাথ বলে—না মাসীমা। তবে সবাই সরকারি চাকরি করি। ভাড়া আগাম চান তাও দেব। আর মাসের দু তারিখে ভাড়া পাবেন। মেসে ছিলাম, মেস উঠে গেল। চার বন্ধুতে এখানে থাকবো। এই দেখছেন সমীর মুখুয্যে। মস্ত লেখক। সিনেমাতেও এর বই হচ্ছে।

ওই ভদ্রমহিলা দেখছে চার মূর্তিকে। কেমন ভাড়াটে হবে—ঝুটঝামেলা করবে কি না তাই ভাবছে। ভদ্রমহিলার বড় ছেলে সমীরকে দেখে বলে—আপনিই সমীর মুখুয্যে। আপনার লেখা আমি অনেক পড়েছি। আপনার 'স্বপ্নের দিন' উপন্যাস দারুণ লেগেছে।

জগন্নাথ, মৃগেন কিছুদিন ধরেই ঘর খুঁজে হন্যে হয়েছে। এদিক ওদিকে বাড়ির সন্ধানে গেছে। পত্রপাঠ বিদায় করেছে। মৃগেন শেষ অবধি সালকিয়ার বাঁধাঘাটে বাঁশপট্টির কাছে একটা বাড়ি দেখেছিল।

জগন্নাথ বলে—একেবারে সালখেতে, গঙ্গার ওপারে। তাও শ্মশানঘাটের পাশে।

মৃগেন বলে—আর আছে বড়বাজারে। আমার জানাশোনা এক ভদ্রলোক থাকে। চল সেখানে।

সমীরও গেছে সেখানে। আলু পোস্তার ওদিকে পাথুরিয়াঘাটা এসে পড়েছে দেবেন মল্লিক রোডে সেইখানে। ঠ্যালা, ট্রাক কুলিদের ভিড়। পথ চলা যায় না। আশপাশে দু দশ ঘর দেহপসারিনীও রয়েছে। কোন ঠ্যালাওয়ালার সঙ্গে দিন দুপুরেই পথে দাঁড়িয়ে পোজ নিয়ে বলে—ফিলিং।

অর্থাৎ ফিলিমের নায়িকাদের পোজে দাঁড়িয়ে ঠ্যালাওয়ালার সঙ্গে এক গাল হেসে রসিকতা করছে। ওদিকে পুরনো জীর্ণ একটা বিশাল বাড়ি। নীচেটা প্রায়ান্ধকার। পায়ের পাশ দিয়ে বিড়ালের সাইজের দু-চারটে ছুঁচো দৌড়ে গেল।

—কি রে। সমীর চমকে ওঠে।

মৃগেন বলে—নীচে আলু, পেঁয়াজ, মশলা পাতির গুদাম তো। তাই রাজ্যের ছুঁচো থাকে এখানে। সিঁড়ি দিয়ে উপরে চল, আলো পাবি।

সিঁড়ির রেলিং এক কালে ছিল। এখন ফ্রেম এর কিছুটা রয়েছে মাত্র। সিঁড়িটাও ভাঙা।

কোনমতে তিন তলায় উঠেছে। সমীর অবাক হয় ওই জরাজীর্ণ বাড়ির দশ ফিট বাই বারো ফিট ঘরের খোপে খোপে এক একটি পরিবার কোনমতে বাস করছে। রান্নাবান্না প্রাকৃতিক কাজ সবই ওখানে। দিনের আলো কখন ঢোকে আর বের হয় কেউ জানে না। সব সময়ই মিট মিটে আলো জ্বলছে। একচিলতে বারান্দায় ছোট ছেলেমেয়েদের কলরব। ওই টুকুই ওদের বিচরণের স্থান।

ওদিকে একটা ঘরে সার সার কয়েকটা বিছানা পাতা। এক একজনের সম্পত্তি বলতে এক একটা টিনের ট্রাঙ্ক। ওর মধ্যেই থালা বাটি গেলাস—জামা-কাপড়ও থাকে। একটা দড়ির আলনায় লুঙ্গি গামছা। মৃগেন ওদিকে দেওয়ালের ধারের শূন্যস্থান দেখিয়ে বলে,—ওখানে তিনটে সতরঞ্চি পেতে তিনটে বেড হতে পারে। এখানে আসবি তো বল।

সমীর গ্রামের ছেলে। আকাশ, সবুজ গাছ গাছালি, পাখির ডাক এসবে অভ্যস্ত। ওই মেসে তবু ভদ্রস্থ হয়ে থাকা যায়। এখানে এই জরাজীর্ণ বাড়িতে অসংখ্য মানুষের ভিড়ে আর এই অন্ধকার রাজ্যে তার দম বন্ধ হয়ে আসে।

জগন্নাথ বলে—চল তো, কাল পরশু খবর দিবি।

ওই ঘরটাতেই ক'জনের আস্তানা। ওদের একজন বয়স্কমত লোক শুধোয়—পোস্তায় কার গদিতে কাজ করা হয়?

এখানে পোস্তার কর্মচারীরাই আলুর বস্তার মত গাদাগাদি করে থাকে। জগন্নাথ বলে—কাজের চেষ্টা করছি।

—কাজ! নটবর দত্ত, ভূষণ কয়ালের গুদামে দ্যাখো, কাজ পেয়ে যাবে। তা আলু না পেয়াজের কাজ জানো? আলু মানে চাপাডাঙ্গা, পেঁয়াজ সেই নাসিক? তবে পেঁয়াজের দর ভালোই তাহলে কাল খবর দিও। নাহলে আদা পিয়াজের আড়তের দুজন বলছিল, তাদেরই নেব মেসে। মাসিক সিট রেন্ট কিন্তু তিরিশ টাকাই লাগবে। খাবে-ওদিকেই নিতাই-এর হোটেলে। পাঁচটাকা মিল—

এখানেই হোটেলও আছে। সমীর বের হয়ে এসে বলে,—ওঃ, কলকাতায় মানুষ কীভাবে থাকে তা এখানে না এসে জানা যেত না। এইভাবে কত মানুষ থাকে।

জগন্নাথ বলে—এখন আমাদের বরাতে কি আছে তাই দ্যাখ। আর মাত্র সাতদিন তো ওখানে পরমায়ু। তারপর কী হবে?

গঙ্গার ধারে এসেছে তারা। এদিকে কর্মব্যস্ত বড়বাজার. ওদিকে সালখে, গঙ্গার ওপারে। মৃগেল বলে,—সাল্‌খেতেই না যেতে হয়।

সমীর দেশ থেকে ফিরে শ্যামলীর ওখানে গেছে। ওর মা কিছু ঘি—বাড়ির তৈরি সন্দেশ দিয়েছিল। সেগুলো শ্যামলীকে দিতে, বলে শ্যামলী—মা আর কী বলছিল?

—মনুকাকা তো গিয়ে অনেক কথাই বলেছে। তুমি নাকি উড়ে বেড়াচ্ছো। আমার কথা শুনে শান্ত হলো। মনুকাকা আমার দেওয়া টাকাটা আর আমার মেসে থাকার কথাও উড়িয়ে দিল।

—সেকি! শ্যামলীও অবাক। বলে সে—থাক্‌গে, মিনার বিয়ে থা চুকে গেল। ভেবেছিলাম যাবো বিয়েতে।

—সমীর বলে—তবে যাবে তোমার মামাতো বোনের বিয়েতে।

—মানে! বাঁকুড়ার মামার মেয়ে—সীমা। ওর বিয়ের খবর তুমি জানলে কী করে?
সমীর বলে—শুনলাম তাঁরা পাত্রও ঠিক করে পাকা কথা বলেছেন।
—কোথাকার ছেলে? কি করে? শ্যামলী প্রশ্ন করে।
সমীর বলে—তা জানি না। এখন কার কোথায় বিয়ে হচ্ছে ওসব জানার মত মনের অবস্থা নাই।
শ্যামলী হাসছে। হাসলে ওকে সুন্দরই দেখায়। হাসিটা চোখের তারায় ঝিলিক তুলে মুখটাকে উদ্ভাসিত করে তোলে। সুগঠিত দাঁত সেই হাসিতে মুক্তোর মত জেল্লাদার হয়ে ওঠে। শ্যামলী বলে,
—কি ব্যাপার! প্রেম ট্রেম করছো নাকি সমী আজকাল যে অন্যের বিয়ের খবরে নিজের সম্বন্ধে আশা হারিয়ে ফেলছ।
সমীর বলে—প্রেম! পড়োনি—ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়
পূর্ণিমা চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।
আমার সেই অবস্থা।
—কী হলো?
—মেসের পালা শেষ। বাড়িওয়ালা সাতদিন পরই আউট করে দেবে। এখনও কোন আস্তানার সন্ধান পাইনি এদিকে। বড়বাজারের আলুর গুদামে বস্তার পাশেই না লাট হয়ে থাকতে হয়। কলকাতা শহরে আশ্রয়ের যে এত অভাব সেটা এবার বুঝছি।
শ্যামলীও ভাবনায় পড়ে। বলে—তাহলে থাকার কী হবে?
—সাল্‌খের দিকেই না যেতে হয়।
—সে তো অনেক দূর। শ্যামলীর মুখেও চিন্তার ছায়া নামে। সমীর বলে,—দেখি কি হয়! পরে জানাবো।
শ্যামলীও যেন অসহায় বোধ করে। বলে—রোজ দেখা হচ্ছিল। এরপর কী হবে?
সমীর বলে—সব কিছুকে মেনে নিয়েই চলতে হবে শ্যামলী। জীবনে পথ চলায় কেউ সঙ্গী হয়! দুদিনের জন্য হেসে খেলে চলে। আর জীবনের পথের মোড়ে দুজনের পথ দুদিকে ঘুরে যায়! তবু পথ চলা থামে না।
শ্যামলী বলে—তা সত্যি।
—ট্রেনের লাইন দেখেছো? দুজনে পাশাপাশি চলেছে—চলেছে মিলনের ব্যাকুল আকুতি নিয়ে কিন্তু মেলে না কখনও, তবু তাদের অস্তিত্ব পাশাপাশিই থাকে। এত এক বিচিত্র ট্র্যাজেডি।
শ্যামলী কি ভাবছে। বলে সে,
—কোথায় বাসা পেলে জানাবে কিন্তু।
—আগে পাই। চলি।
সমীর চলে আসে। শ্যামলীর হোস্টেলের বান্ধবীরাও ইদানীং নজর রাখছে শ্যামলীর উপর। ওদের অনেকেই সমীরকে প্রায় আসতে দেখে। দুজনকে এখান ওখানে বেড়াতেও দেখেছে।
রঞ্জনা বলে—তোর দেবদাস কি বলে গেল রে? গুম হয়ে গেলি?
ইভা বলে—কে জানে এতদিন ওকে ল্যাজে খেলিয়ে এবার অন্য কোন মেয়ের সঙ্গে

গাঁটছড়া বাঁধতে চলেছে। ছেলেগুলো অমনিই।

রেখা ওসবে নাই। সে শ্যামলীর হাত থেকে সন্দেশের কৌটা বের করে এর মধ্যে একটা সন্দেশ মুখে পুরে বলে—দারুণ রে। একেবারে ফ্যান্টা—এবার মিষ্টি নিয়েই পড়ে তারা।

জগন্নাথ মৃগেনরা এখনও বাসার ঠিক করতে পারেনি। দিবাকর এর মধ্যে পটুয়াটোলায় একটা মেসে ঠাঁই পেয়েছে। সে বলে,—আরে দিবাকর মুখুয্যের কলকাতায় থাকার ভাবনা। কালই চলে যাচ্ছি মালপত্র নিয়ে।

অবশ্য মাল বলতে একটা সুটকেস আর সতরঞ্চি জড়ানো বেডিং। একটা রিকশা ডেকে মেস ছেড়ে চলে গেল দিবাকর। সনৎবাবু-ভাইপো-ভাগ্নেদের নিয়ে গড়পার রোডের ওদিকে বাসা ঠিক করেছে।

বলে—মেসে আর থাকছি না। বাসাই করলাম। পটলা-ম্যানা মালপত্র গোছগাছ করে নে, বেরুতে হবে'

তিনতলা প্রায় ফাঁকা। হরিদাসবাবুই রয়েছে। দোতলার ঘরগুলোও খালি হচ্ছে। জগন্নাথ মৃগেনরা সেদিন সমীরকে নিয়ে বের হয়েছে মির্জাপুরের সেই বাড়ির সন্ধানে', এখনও তাদের ঠাঁই হয়নি তেমন।

সেই বাড়িউলি ভদ্রমহিলা তখনও ভাবছে এদের কি বলবে' ওর বড়দাই বলে — মা, এদেরই দাও নীচের ঘর দুটো। একজন লেখক থাকবেন বাড়িতে, আর ভাড়া তুমি ঠিকই পাবে। সকলেই ভালো চাকরি করে।

জগন্নাথ যেন আশার আলো দেখে। বলে সে,

—ওর জন্য ভাববেন না। তিন মাসের ভাড়া আগামই দিয়ে যাচ্ছি মাসীমা। সেইই টাকাটা বের করে। ভদ্রমহিলা বলে,

—তিন মাসের লাগবে না বাবা, এক মাসের ভাড়াই আগাম নেব। আর মিটারের জন্য দুশো টাকা। এটা যাবার সময় ফেরত পাবে।

জগন্নাথ টাকাটা দেয়। বড় ছেলেই রসিদ এনে দেয়।

এর মধ্যে উপর থেকে চা-বিস্কুটও এসেছে। জগন্নাথও এর মধ্যে মাসীমার সঙ্গে বেশ জমিয়ে মিশেছে।

বাসন্তী দেবী বলে—কবে আসছ তোমরা? ঘর দোর সাফ সুতরো করাতে হবে, চুনকাম করাতে হবে।

জগন্নাথ বলে—কালই তাহলে চুনকাম করান —আমরা তিনদিন পরই আসবো। অবশ্য কাছে থাকি আরপুলি লেনে। এর মধ্যে পরশু একবার দেখে যাবো।

ওরা বের হয়ে আসে। জগন্নাথ বলে,

—মৃগেন চল পুঁটিরামের দোকানে। ব্যাটা অথরের জন্য আজ একটা দারুণ প্রবলেম সল্ভ হয়েছে। ওকে আজ পুটিরামের রাজভোগই খাওয়াবো!

মৃগেন বলে, তা সত্যি। তবু মেসের কাছে চেনাজানা পাড়াতেই রইলাম, নাহলে ওই আলু পোস্তার জেলখানাতেই গিয়ে সতরঞ্চি পাততে হতো। সমীর বলে—বাঁচা গেল রে।

মেসের বাবুরা একে একে বিদায় নিচ্ছে। ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল এতদিনের সংসার। একটা গাছে পাখিদের বাসা। গাছটা কেটে ফেলাতে তাদের বাসাও ভেঙে গেল। উর্ধ্বাকাশে কিছুক্ষণ কলরব করে তারা সবার নতুন বাসার সন্ধানে কোন শূন্যে হারিয়ে গেল।

তাদের অবস্থাও তেমনি। মেসের বাবুদের গোটা চারেক তক্তপোষ একটা ঠেলায় চাপিয়ে সমীররাও এসে আস্তানা নিল নতুন ঠিকানায়।

বাসন্তী দেবীরও চারটে ছেলের উপর যেন মায়া পড়ে গেছে। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ওদের ঘর গুছিয়ে দেয়। রান্নাঘরও আছে আলাদা।

জগন্নাথ বলে, ওদিকের হোটেলেই খাবার ব্যবস্থা করেছি মাসীমা। হাত পুড়িয়ে রাঁধার কাজ কে করবে। দুবেলা ওখানেই খেয়ে নেবো আমরা।

তবে মৃগেন এদের মধ্যে সংসারী। একটা স্টোভ কিনেছে—সকালের চা ব্রেকফাস্ট ওতেই করে নেয়।

বাসন্তী দেবীর বড় ছেলে কোন ব্যাঙ্কে কাজ করে। নিমাই এমনিতে ভদ্র, বেশ রুচিশীল। বিয়ে-থা করেছে। ছোট ছেলে নিতাই সবে রেলে চাকরি পেয়েছে। বাসন্তী দেবীর সংসারে তেমন অভাব নাই। ছোট ছেলে থাকে আসানসোলে। বাড়িতে নিমাই আর বৌমা শীলা।

সমীরের সুবিধাই হয়েছে। সকালে অফিস করে একেবারে হোটেলে খেয়ে ফের বাড়িতে। একটু ঘুম দিয়ে উঠে লিখতে বসে। সারা বাড়ি তখন ফাঁকা। জগন্নাথদের দিনে ডিউটি। সমীর নিশ্চিন্তে লিখতে সময় পায়। একটু উঠানও আছে। ওদিকে একটা কাঠবাদাম গাছ, পুরু সবুজ পাতাগুলোয় বর্ষাশেষে লালচে রং ধরে, তারপর ঝরে যায়। আবার আসে কিশলয়।

বাসন্তী দেখে সমীরকে।

বৃদ্ধাও বলে—দিনরাত লেখাপড়া নিয়েই থাকো দেখি। তা ভালো। কাগজেও তোমার নাম দেখি। বৌমা লাইব্রেরি থেকে একটা বই এনেছিল। তুমি বইও লেখো!

বাড়ির খবরও নেয় বুড়ি। সমীরের জীবন কাহিনী—মায়ের কথা শুনে বলে—জীবনে মাকে শ্রদ্ধা করো বাবা। আমার ছেলে বৌও খুব করে।

সকালে অফিসে ডিউটি, দুপুরে লেখালেখির কাজ। নতুন বাসায় এসে এখন মোটামুটি ভালোই চলছে। মাসীমাই বলে,

—হোটেলে খেলে শরীর টিকবে না। রান্না তো নয়, বিষ। আর ডবল খরচা। তার চেয়ে কাজের মেয়েকে বলছি সে তোমাদের দুবেলা রান্না করে দেবে। কিছু দেবে ওকে। দিয়ে থুয়েও খরচা কম পড়বে-ভালো খাবারও পাবে।

জগন্নাথই তাদের ম্যানেজার। সে হিসাব করে দেখে সায় দেয়। রান্নার ব্যবস্থাও হয়েছে।

সমীর এখন সুরেশবাবুর সঙ্গে কাজ করছে। চিত্রনাট্য লেখার কাজ। এর মধ্যে সমীরকে বলে সুরেশবাবু,

—অথর, পুরো উপন্যাসটা আগে তোমার মত করে বেশ লেখে ফ্যালো। সব চরিত্রের নিজস্ব ডাইমেনশন, কালার হবে, শেড থাকবে। কাহিনীর পরিণতিটা হতে হবে সেইমত।

এক কালের সমাজের ছবিটাকে ফুটিয়ে তুলতে হবে, যাতে পঞ্চাশ বছর পরেও পাঠক এই যুগের যন্ত্রণাকে যেন বুঝতে পারে।

সমীরের এখন প্রকাশকের জন্য ঘুরতে হয় না। এর মধ্যে কয়েকজন প্রকাশক তার উপন্যাস নিয়মিত ছাপছে। সমীর সেই উপন্যাসটাই লিখছে। আর সন্ধ্যায় গিয়ে হাজির হয় সুরেশবাবুর ওখানে। কালিঘাটের ওদিকে ওর বাসা।

বাইরের ঘরে সন্ধ্যার সময় আসল অধ্যাপক-সঙ্গীতজ্ঞ-শিল্পীদের ভিড় জমে। সুরেশবাবুর অট্টহাসি শোনা যায়। আর মাঝে মাঝে তার সহকারীদের হাঁক পাড়ে —'অ্যাই শৈলেন, এক রাউন্ড চা অর্গানাইজ কর।'

চা আসে। সাহিত্য, সংস্কৃতি নিয়েই আলোচনা হয়। সমীর দেখে সুরেশবাবুর সাহিত্যে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য। কোন কোন দিন বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক' অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রাজকাহিনী' থেকে পাঠ শুরু হয়। পাঠ করে সুরেশবাবু। যেমন বাচন ভঙ্গি-তেমনি কণ্ঠস্বর। সমীরও যেন সেই লবটুলিয়া ন্যাড়া বইহয়ার রাজ্যে, কখনও রাজপুতনার ঊষর পার্বত্য জগতে হারিয়ে যায়।

এই চলে রাত আটটা অবধি। তারপর শুরু হয় ওদের চিত্রনাট্যের কাজ। সুরেশবাবুর চিত্রনাট্য রচনার ধরনটা আলাদা। সাধারণত বিনয় চ্যাটার্জি, নৃপেন চাটুয্যেরাই নামী চিত্রনাট্যকার, শৈলজানন্দ প্রথমে নিউথিয়েটার্সএ চিত্রনাট্য লিখতেন। তারপর তিনি নিজের কাহিনীর চিত্রনাট্য করেছিলেন নন্দিনী, শহর থেকে দূরে, মানে না মানা আরও অনেক ছবির।

সুরেশবাবুর ধরনটাই স্বতন্ত্র। সমীর এর আগে চৌরঙ্গী থেকে বিখ্যাত বেশ কিছু হলিউডের ছবির চিত্রনাট্য ও বই সংগ্রহ করে পড়েছে।

নাটকের একটা রীতি আছে। এক একটা দৃশ্যের মাধ্যমে কাহিনী এগিয়ে যায়, চরিত্রগুলোর রূপ পেতে থাকে ঘটনাপ্রবাহের পরিপ্রেক্ষিতে, তারপর একটা ছোট ক্লাইমেক্সের মধ্যে একটা অঙ্ক শেষ হয়। পরের অঙ্কে নাটকের মূল নাটকীয়তা গড়ে ওঠে- আর তারই একটা চরম পর্যায়ে দ্বিতীয় অঙ্ক শেষ হয় তারপর তৃতীয় অঙ্কের শুরু, নাটকের চরমতম মুহূর্তের দিকে এগিয়ে যাবার গতি আর চরম মুহূর্তে নাটকের শেষ পরিণতি, পরিসমাপ্তি ঘটে।

সিনেমার ক্ষেত্রে সুরেশবাবু নাটকের মূল পরিকাঠামোটাই অনুসরণ করতেন। সেখানে দৃশ্য নেই, আছে সিন আর নাটক একটা গণ্ডির মধ্যে - পরিসরের মধ্যে মঞ্চের সীমানায় বিধৃত। সিনেমার রাজ্য আরও প্রসারিত, তার অভিব্যক্তি প্রকাশের ক্ষেত্রও অনেক। একটা চরিত্রের বহু না বলা কথা, বেদনাকে একটা ক্লোজ আপে সুন্দর করে দর্শকের মনে গেঁথে দেওয়া যায়। এর ভাষা আরও প্রাণবন্ত-ব্যাপক। সুরেশবাবু চিত্রনাট্যকে ওই নাটকের মূল ধারায় প্রতিটি সিনের মধ্যে সাজিয়ে এক একটি সিকোয়েন্স তৈরি করতেন। প্রতিটি সিকোয়েন্স এর গতি থাকত ঊর্ধ্বমুখী লখ্য ছিল শেষ পরিণতির সার্থকতায়।

সমীরকে ইংরাজিতে দৃশ্য, সিকোয়েন্সগুলো বলে যেতো সুরেশবাবু। তখন এক মহান শিল্পী। চোখের সামনে সেই ছবি গুলোর ফ্রেম তার মনের পরতে ফুটে উঠতো। মাথার চুলগুলো টানতো যেন মগজ থেকে চিন্তার ধারা অব্যাহত রাখতে চায় বিড়ি টানতে।

তখন সে সৃষ্টির আনন্দে তন্ময়।

সমীর সেই মত বাড়িতে এসে সেই দৃশ্যগুলো লিখতো—সংলাপও। সেগুলো আবার সুরেশবাবুকে শোনানোর পর কিছু রদবদল করে তিনি নিতেন। তার উপর চিত্রনাট্যকে সম্পূর্ণতর করে রূপ দিত সুরেশবাবু। এ এক নিরবচ্ছিন্ন সৃষ্টির সাধনা। সমীর ধৈর্য নিয়েই লিখত শেখার আগ্রহ নিয়ে এই নতুন শিল্পমাধ্যমের কাজটা।

এর মধ্যেও সমীর দৈনন্দিন কাজগুলোও করতো। তার মনে হয় জীবন সবকিছু মিশিয়ে একটা সামগ্রিক রূপ নেয়। এখানে কোনটাকে ছেড়ে কোনটা নয়।

তাই চাকরিও করতো নিষ্ঠার সঙ্গে। তখন সে একজন কর্মী। অন্য পাঁচজনের সঙ্গে তার কোন পার্থক্য নাই। সাহিত্যিক পরিচয় সেখানে তার অবলুপ্ত তাই সহজেই সকলের সঙ্গে অফিসে মিশতে পারতো।

রোহিণীর কথা মনে পড়ে বারবার। রোহিণী চাকরি ছেড়ে দিল। ওই গীতিকার থেকেই তার মানসিকতায় একটা যেন স্বাতন্ত্র্য গড়ে উঠেছিল, সহজভাবে সে সকলের সঙ্গে মিশতে পারত না। একটা ভিন্ন মতবাদ কেমন বেড়ার সৃষ্টিই করেছিল। তাই যেন এ জগৎ থেকে সে সরে গেছে। সহজ হতে কোথায় বেধেছিল।

সমীর সহজ থাকার চেষ্টাই করে। তাই সব কিছুকেই সহজ সহনীয় করে নিতে চায়।

বাড়ি থেকে মায়ের চিঠি আসে। বিয়ের দিনক্ষণ স্থির করেছেন ওরা। ওকে বাড়ি আসতে হবে। সমীর কথাটা ভাবে। তাদের ভগ্নপ্রায় সংসারের জন্যই বোনের বিয়ে। সংসারের জন্যই বিয়েও করতে হবে।

সে দিন হঠাৎ শ্যামলী এসে পড়ে ওর বাসায়।

অবশ্য এই বাড়িতে শ্যামলী আগেই মাসীমার সঙ্গে বৌদির সঙ্গে পরিচিত ক্রমশই ঘনিষ্ঠই হয়ে উঠেছে। শ্যামলী দু' একদিন মাসীমার এখানে খাওয়া-দাওয়াও করে। মাসীমাও বলে,

—মেয়েটা হোটেলের খাবার খেয়ে মলো। অ বৌমা পুঁইশাক চচ্চড়ি করে। ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে, আর মাছের ঝাল।'

সমীর বলে—ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খাচ্ছো শ্যামলী।'

শ্যামলী বলে—'এলেম থাকা দরকার। কি মাসীমা।'

সমীর বিয়ের কথা জগন্নাথদেরও বলেনি, মাসীমাকেও জানায়নি। শ্যামলীকে অবশ্য কিছুটা বলেছিল মাত্র কিন্তু কনের কথা বলেনি।

শ্যামলী বাড়ি থেকে মায়ের চিঠি পেয়ে জেনেছে যে তার মাসতুতো বোন সীমার সঙ্গেই সমীরের বিয়ে হচ্ছে।

শ্যামলী একটু চমকে ওঠে।

সে এতদিন ধরে একটা স্বপ্ন দেখেছিল সঙ্গোপনে। সমীরকে প্রথম গ্রামে দেখেছিল। সেই ছায়াঘন নির্জন প্রাচীন শিবমন্দিরে। সেই গোধূলির ম্লান আলোয় জায়গাটা ভরেছিল ঘরে ফেরা পাখিদের কলরবে।

সমীর দেখেছিল শ্যামলীকে—শান্ত নম্র একটি কিশোরী।

শ্যামলী দেখেছিল সমীরকে একটি যুবক। মুখে চোখে নীরব বেদনার ছায়া। সেদিন

শ্যামলীই কথা বলেছিল।

ক্রমশ শ্যামলীর মনের অতলে সমীর কখন ঠাঁই করে নিয়েছিল জানে না শ্যামলী। সেইই উৎসাহ দিয়েছিল সমীরকে। দেখেছিল তার স্বতন্ত্র একটি সত্তাকে- যাকে শ্যামলী ভালো না বেসে পারেনি। দুজনেই দুজনকে অবলম্বন করে এগিয়ে যেতে চেয়েছিল নতুন পথে।

শ্যামলী তাই যেন ওর কাছে যাবার জন্যই কলকাতায় পড়তে এসেছিল। দুজনে এক নিজস্ব জগৎ গড়ে তুলেছিল।

সমীর সেদিন বিয়ের কথা বলাতে হাল্‌কা ভাবেই নিয়েছিল শ্যামলী। কিন্তু মায়ের চিঠি পাবার পর তার ধারণাই বদলে যায়।

সমীর ইচ্ছা করেই তাকে সেদিন পাত্রীর খবরটা দেয়নি। আজ সব জেনেছে শ্যামলী। তার মনের অতলে এক নীরব অভিমানই জাগে।

তবু সব কিছুকেই শ্যামলী সহজ করে নেবার চেষ্টাই করে। নিজের মনের সেই বঞ্চনার বেদনাকে সে বাইরে আনে না। যেন খুশিই হয়েছে।

শ্যামলীই আজ এ বাড়িতে এসে বলে,

—মাসীমা, তোমার সেই লেখকটি কোথায়? তার খবর জানো?

—কি হলো? মাসীমা শুধায়, কি করেছে সমীর?

—ডুবে ডুবে জল খাচ্ছে। তোমাকেও বলেনি। জানো—ওর বিয়ে।

নিমাইএর বৌও এসে জুটেছে। সে বলে তাই নাকি। তা লাভ ম্যারেজ নাকি।

মাসীমা বলে—ইদানীং ওইসব চালু হয়েছে। তা বাপু-বলে লাভ ম্যারেজ। শেষে দেখা যায় পুরো লোকসানের ম্যারেজ। সমীর তাই করছে নাকি?

শ্যামলী বলে—না, না। দেখে শুনে মায়ের সুপুত্রের মত মায়ের পছন্দকরা মেয়েকেই বিয়ে করতে চলেছে। আর মেয়েটি কে জানো? আমারই মাসতুতো বোন।

এর মধ্যে সমীরও ফিরেছে।

ততক্ষণে খবরটা চাউর হয়ে গেছে। জগন্নাথ-মৃগেন-বলরামরাও অফিস থেকে ফিরে চা টা খেয়ে টুইশানিতে বের হবে। তারাও শুনে সমীরকে দেখে বলে,

অ্যাই, এসব বলিসনি? বিয়ে করছিস।

সমীরও বিপদে পড়ে ততক্ষণে শ্যামলী মাসীমাকে নিয়ে নীচে নেমে এসে আসামীকে পাকড়েছে। সমীর বলে,

—না, ইয়ে, বলতাম তোদের।

জগন্নাথ বলে—এখন ধরা পড়ে গিয়ে কাচুমাচু করছে, পরে ব্যবস্থা হবে তোর। ওরা টুইশানিতে চলে যায়।

সমীর শ্যামলীকে এগিয়ে দিতে যাচ্ছে হোস্টেলে।

ওদিকে শ্রদ্ধানন্দ পার্কের একটা বেঞ্চে বসে তারা। সমীর বলে,

—সবই তো তুমি জানো শ্যামলী। মিনার বিয়ে দিতে মা ওদের সাহায্য নিয়েছিল। প্রবীরেরও তেমন কাজকর্ম নেই। সুবীরকেও কলেজে পড়াতে হবে। সংসারের সুরাহা কিছু

হবে। তাই সংসারের জন্য মায়ের কথাকে ফেলতে পারলাম না।

শ্যামলী চুপ করে থাকে। কোনদিনই সে নিজের চাওয়াটাকে মুখ ফুটে বলতে পারে নি। তার নিজের ব্যক্তিত্ব, মানসিকতাই তাকে এই কাঙ্গালপনা থেকে মুক্ত হবার সুযোগ দিয়েছে। আজও শ্যামলী তাই নিজের সেই বঞ্চনাকে ভোলার চেষ্টা করে বলে.

—না-না। ঠিকই করেছো। ঘর সংসার তো করতেই হবে।

নিজের কথা ভাববে না?

সমীরের কথায় চাইল শ্যামলী, মনে হয় ওকে কঠিন সত্য কথাটাই শুনিয়ে দেবে। সে স্বার্থপরই। কিন্তু পারে না শ্যামলী। তার মনে একটা রুদ্ধ অভিমানই জাগে। সমীর কি কিছুই বোঝে না? এযেন তারই ব্যর্থতা। শ্যামলী সহজ হবার চেষ্টা করে।

—আমার কথা? এখন সামনে পরীক্ষা, ভালো রেজাল্ট না করতে পারলে রিসার্চ করার সুযোগই পাবো না। এই নিয়ে ভাবছি—

তারপর প্রসঙ্গ বদলাবার জন্যই বলে শ্যামলী,

—কবে বাড়ি যাচ্ছো?

সমীর শুধোয়—তুমি যাবে না?

শ্যামলী হেসে ওঠে। সেহাসিতে যেন ব্যর্থ বেদনারই তীব্রতা ফুটে ওঠে। বলে শ্যামলী,

—তোমার বিয়ে তে যাবো না তাই কি হয়? কত হই-চই করবো বোনের বিয়েতে। বরযাত্রীও যাবো। যাবো বৈকি!

সমীর চুপ করে শুনছে ওর কথা গুলো। কখন অজানতে শ্যামলীর চোখ দিয়ে জলও বের হয়ে আসে সেটা খেয়াল করেনি শ্যামলী। সমীর অবাক হয়।

মনে হয় সমীরের জীবনে একটা মস্ত পরাজয়—ভুলকেই ঘটালো। শ্যামলীর মনের অতলের বেদনা আজ তার মনকেও স্পর্শ করে। আজ সে হেলায় জীবনের এক পরম সম্পদকে হারালো। যার সন্ধান সে এতদিন পায়নি। সমীর বলে ওঠে।

—শ্যামলী, আমার ক্ষমা চাওয়ার মুখও নেই। নিজের জীবনকে গড়তে চেয়েছি নিজের মত করে। কিন্তু জীবনদেবতার অদৃশ্য হাতের খেলায় সব হিসাবই গড়বড় হয়ে গেছে। তার খেসারত দিয়েই চলতে হবে।

শ্যামলী নিজেকে সামলে নিয়েছে। বলে

—এটা কি তোমার কোনও চরিত্রের ডায়ালগ? এটা ব্যর্থ প্রেমিকের মুখে দিলে পাবলিক খুব খাবে। দারুণ। চলো রাত হচ্ছে। হোস্টেলের সুপারকে তো চেনো। হবু ভগ্নীপতি বলে কোন খাতির করবে না। ফায়ার করে দেবে।

সমীর তবু অনেক কিছু হারিয়েও জীবনের পথ চলার দায়কে মেনে নিয়েছে। গ্রামে এসেছে। শ্যামলীও এসেছে। কদিন বিয়ের হাঙ্গামায় কোন দিকে কেটে যায়।

মিনা - ভগ্নিপতী অরুণও এসেছে। প্রভার এই আনন্দের দিনের হারানো স্বামীর জন্য চোখে জল নামে। সব হারিয়ে কয়েকটি অনাথ ছেলে মেয়েকে নিয়ে স্বামীর বাস্তুভিটেতে এসেছিল। কোন নির্ভর ছিল না। এখানে এসে অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য করেছে। অভাব অনটনকে দেখেছে। অন্নচিন্তায় মুষড়ে পড়েছিল। তবু বুক দিয়ে সন্তানদের আগলে

রেখেছিল। আজ সমীর নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে, সংসারের রূপ বদলাচ্ছে। এইটুকু পেয়েই সে খুশি। আজ বাড়িতে আসছে সমীরের বউ, ঘরের লক্ষ্মী। এই পূর্ণতার দিনে স্বামী নেই। সে এসব কিছুই দেখে যেতে পারেনি! দূর প্রবাসে কোন অচেনা সীমান্তের মাটিতে তাকে রেখে এসেছিল নিঃসঙ্গ-নির্জনে। দেশের মাটিতে তার ঠাঁই মেলেনি।

আজ প্রভা মাটিতে নতুন ঘর গড়েছে, তাই বার বার স্বামীর কথাই মনে পড়ে।

শ্যামলীই বিয়েতে বেশি হই-চই করে। বলে মিনাকে

—ভালো করে বর সাজাবি কিন্তু! ও ন বৌদি - একটু বেশি করে পাউডার সমীকে। যেন ফর্সা হয়ে ওঠে - নাহলে সীমার চোখেই ধরবে না। সে কিন্তু রীতিমত ফর্সা। ও কিটুদা, বরযাত্রীদের সব গাড়িতে তোলো। বিয়ের লগ্ন ভ্রষ্ট করে বর নিয়ে যাবে নাকি?

সমীর বিয়ে করতে এসেছে। বিভূতিবাবুও এসেছেন। তার আত্মীয় সদানন্দবাবুর অবস্থা ভালোই। শহরে দু তিন খানা বাড়ি, কয়েকটা রুটে বাস চলে তার। অন্য ব্যবসাও আছে।

মনু মুখুয্যেও এসেছে বরযাত্রী হিসাবে, শরৎ ভটচায - রতন খুড়ো গাড়ি থেকে নেমে সব দেখে শুনে বলে,

—এতো এলাহি কাণ্ড হে!

মনু মুখুয্যে তখন রেকাবিতে বরযাত্রীদের জন্য রাখা সিগ্রেটের প্যাকেট একটা তুলে পকেটস্থ করে, অন্য প্যাকেট থেকে সিগ্রেট ধরিয়ে তোবড়ানো গাল কুচকে বলে — ক্যাপস্টান সিগ্রেট দেয় নি হে - কাঁচি দিয়েছে।

শরৎ ভট্‌চায্‌ বলে—বাড়িতে তো বিড়িই খাও তাও পরের পয়সায়। এখানে তো দেখি কাঁচিতে ঘেন্না! জলখাবার তো দেখি দুপ্লেট সাবাড় করলে।

মনু মুখুয্যে বলে —না, সন্দেশগুলো ভালোই ছিল, তাও কালাকাঁদটা একটু কড়া পাক হয়ে গেছে।

—পায়না মিয়ানো মুড়ি, মিঠাই মণ্ডার ছড়াছড়ি। যা পাচ্ছো খাও।

এতোসব কথায় কান না দিয়ে মনু মুখুয্যে বলে,

—শাঁসালো পার্টি হে। গ্রাম দেবতা বাবা ভৈরব থানের জন্য শ' পাচেক টাকা পেন্নামী চাও। কিছু টাকার দরকার।

এরা গ্রামের ছেলেমেয়ের বিয়েতে পাত্র-পাত্রী পক্ষ থেকে এইসব ভড়ং করে কিছু টাকা আদায় করে। তারপর দু দশ টাকা ওই ব্যাপারে খর্চা করে বাকিটা নিজেদের পকেটে পোরে।

রতন ভট্‌চায্‌ বলে—বেশি চাপ দেবার পথ নাই হে - ঘরশত্রু বিভীষণ ওই বিভূতি রয়েছে যে।

বিয়ের পর্ব চলছে। শুভদৃষ্টির মুহূর্তেই সমীর দেখছে সীমাকে।

সীমাও দেখছে সমীরকে কি কৌতূহলী চাহনিতে৷ উলুধ্বনি - শাখ বাজে। সমীরের মনে হয় ওই মন্ত্রধ্বনি - অগ্নিসাক্ষী করে আজ এক নতুন সাথীকেই মেনে নিতে হয়েছে তাকে।

এযেন সেই অদৃশ্য কোন জীবনদেবতারই নির্দেশ। তার বার বার মনে পড়ে শ্যামলীর কথা। সেই রাত নির্জন পার্কের বেঞ্চে দেখেছিল শ্যামলীর চোখে জল-কি বেদনার অশ্রু।

শ্যামলী সেদিন ধরা পড়ে গেছল। কিন্তু সমীরের এই নিঃস্বতার বেদনা শ্যামলী হয়তো জানবে না কোনদিন। সব হারিয়েও অন্য কিছুকে নিয়েই পথচলতে হবে সমীরকে, দীর্ঘ জীবনের পথ।

হোমের আগুন জ্বলছে, আজ সেই হোমাগ্নিতে আহুতি দেয় সমীর সীমা দুজনে। দুজনে আজ এক বন্ধনে বাঁধা পড়েছে।

বাড়ি ফেরে সমীর। এখন সে একা নয়, সীমার জীবনও তার সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। প্রভা দেবী নতুন বউকে বরণ করে নেয়। এই সংসারে এলো আর একজন।

শ্যামলীর পরীক্ষা সামনে, বৌ-ভাতের পর দিনই বলে সে,

—কাকীমা, আমাকে কলকাতা ফিরতে হবে।

সীমা কদিনেই দেখেছে এ বাড়িতে শ্যামলীরও একটা বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

সীমা বলে —কবে ফিরবে?

—কালই। তোমার তো দেরি হবে।

সমীর বলে হ্যাঁ। একবার শহরে যেতে হবে। তারপর এদিকের ঝামেলা সব চুকিয়ে যাবো। দিন দশেক দেরি তো হবেই।

সীমা শুনছে ওদের কথা। বিয়ের সময়ও দেখেছে শ্যামলীই যেন এখানের কেউ কেটা। এম-এ পড়ছে শ্যামলী। সীমা ম্যাট্রিক পাশ করেছিল কোনমতে। তারপর কলেজে ভর্তিই হয়েছিল-কিন্তু পড়াশোনাতে তার মন নাই।

শ্যামলী ও ব্যাপারে অনেক এগিয়েছে। তাই সীমার একটা গোপন ঈর্ষাও ছিল। সেটা চেপেই রাখে। বলে সে সমীরকে,

—শ্যামলীদি কলকাতায় গিয়ে চালু হয়ে গেছে।

সমীর বলে —কলকাতা আর কিছু করতে না পারুক, মানুষকে চালু করে দেয়।

—তাই দেখছি, সীমা মন্তব্য করে।

সমীর কদিন ব্যস্ততার মাঝেও রমেনদার ওখানে গেছে। জেঠিমারা এখনও তাদের ক্ষমা করতে পারেনি। বরং এ বাড়ির একটু স্বচ্ছল অবস্থা দেখে জেঠিমা, করালীর মনের জ্বালাটাই বেড়েছে।

দেবেন এখন গ্রামের মাতব্বর মনে করে নিজেকে। এখন সেও বলে,

—ওসব ফুটানি দু'দিনের হে, উড়ে এসে জুড়ে বসে ফুটানি করছে।'

দেবেনও আসেনি বিয়েতে। বরং সেই সময় সমীরদের জমির জল কেটে নিজের জমিতে নিয়েছে। সমীরের চাষী কালো বলে,

—দেবেন ঠাকুরের শয়তানি এসব, দোব ওর জমির জল কেটে নীচে নামিয়ে।' ওদের ধান জমিও ক্রমনিম্ন। উপরের জমির জল তাই নীচের জমিতে কেটে নেয় অনেকেই। দেবেনও তাই করেছে।

সমীর বলে—ওসব করিস না।

—তাই বলে ক্ষেতি করবে ফসলের? কালো লোহার ফুঁসে ওঠে।

সমীর জানে এসবকেও মেনে নিতেই হবে।

তবু রমেনদার ওখানে গেছল সে। ওর শরীর ভেঙে পড়েছে। কাশির সঙ্গে রক্ত পড়ে এখন।

ছিন্নবাস - মলিন শয্যা। পারুল বৌদির চোখে জল নামে। সমীর পারুল বৌদের হাতে কিছু টাকা দিয়ে বলে —এটা রাখো বৌদি।

পারুল বলে—মা, ঠাকুর পো আমাদের কথা ভাবে না। দূর থেকে দেখে মাত্র।'

রমেনদা বলে—আমি আর ক'দিন রে সমী। তারপর তোর বৌদিকে ওরা কি ঠাঁই দেবে? খেতে পরতে দেবে?

সমীর বলে—নিশ্চই দেবে। গ্রামে মানুষ নাই। ওনিয়ে তুমি ভেবনা বড়দা। রমেনের চোখে জল নামে। তার কেষ্টযাত্রার দল এখন বসে গেছে। পড়ে আছে সাজের বাক্স। রমেন দা বাঁশী বাজাতো ভালো। বলে,

—বড় সাধ ছিল জমিয়ে মাথুর করবো। খুব করুণ পালা রে। কৃষ্ণ মথুরা ছেড়ে চলে যাচ্ছে, সাথীদের কান্না - বিষাদের সুর। দুনিয়া ছেড়ে চলে যেতেও মানুষের মন কাঁদে রে তবু চলে যেতে হয়—

রমেনদা যেন সেই চরম মুহূর্তের ছবিই দেখে আজকাল।

তার জীবনের কোন স্বপ্নই পূর্ণ হয়নি। তবু সে স্বপ্ন দেখে আবার সেরে উঠে মাথুর পালা গাইবে জমাটি আসরে।

কিন্তু তার গান, সুর আর উঠবে না। সব সুর থেমে যায় অকস্মাৎ। দু-তিন দিন পর দুপুরের স্তব্ধতা নেমেছে গ্রামে। তাল গাছের পাতা কাঁপে - বাঁশবনে ঘুঘুর ডাক ওঠে, এসময়টা গ্রাম নিস্তব্ধ। হঠাৎ নিস্তব্ধতাকে ভঙ্গ করে জেঠিমা -করালীদির আর্তকান্নার রোল ওঠে।

—একি সব্বোনাশ হলো রে। একি করলি বাবা।

পাড়ার লোক সচকিত হয়ে ওঠে। সমীরও বের হয়। প্রভা বলে,

—দিদি কাঁদছে কেন রে?

চমকে ওঠে সমীর। ও বাড়িতে গিয়ে ঢোকে। বাইরে ঘরে লোকজন জুটেছে। পারুল বৌদির চাপা কান্নার সুর ওঠে। বাচ্ছা মেয়েটা জানে না তার বাবা আর নেই। সে ওদিকে একটা আধ পাকা পেয়ারা কামড়াবার চেষ্টা করছে।

ঘরের বাইরে জেঠিমা করালীদি তখনও নিরাপদ দূরত্বে বুক ফাটা কান্নার রোল তুলেছে। দেবেন ওদিকে দাঁড়িয়ে আছে।

সমীরও ঘরে ঢুকে দাঁড়ালো। রমেনদার জীর্ণ দেহটা পড়ে আছে। এই জীবনে সে কোন আনন্দ - তৃপ্তি পায়নি। এ জীবন তাকে দেয়নি কিছুই। অপরিচিতের মত তাই এই জগত ছেড়ে যেন শূন্যহাতেই সে হারিয়ে গেল।

প্রভাও আসে। আজ তার চোখেও জল নামে। রমেনই তবু এদের সাধ্যমত সাহায্য করেছিল। আজ সেও চলে গেল অবহেলায়। জীবনের একটা অধ্যায় যেন শেষ হয়ে গেল। সমীর তার নীরব দর্শক মাত্র। আজ পারুল বৌদি ও মেয়েটার জন্য দুঃখ হয়।

জীবনের পথ চলা তবু থামে না। জীবন মৃত্যুর মাঝখানের দিনগুলোকে নিয়েই মানুষের স্বপ্ন-সাধনার পালা চলে। চলে দেওয়া নেওয়ার হিসাব। পাওয়া না পাওয়ার দ্বন্দ্ব। জীবন দেবতা হাসে অলক্ষ্যে। তবু সেই বিধাতাকে উপেক্ষা করেই মানুষ তার পথে চলে।

সমীর কলকাতায় এসে কাজ লেখার মধ্যে ডুবে গেছে। তবু মাঝে মাঝে সীমার চিঠি আসে। বদ্ধ বন্দী জীবনে একটু মুক্তির আশ্বাস আনে। আনে কিছু রঙিন স্বপ্নের আভাস।

শ্যামলীর হোস্টেলেও যায়। শ্যামলী আসে এ বাড়িতে।

মাসীমা বলে-সমী, বৌ তো দেখালে না। একবার আনো এখানে। নাহয়, তোমার মাসীমার বাড়িতেই থাকবে সে।

শ্যামলী বলে —তা মন্দ হবে না। কি সমী?

সমীর ভাবছে কথাটা। মাঝে মাঝে এখন বাড়ি যেতে হয় তাকে। সীমা বাড়িতেই রয়েছে। সমীর বলে,

—দেখি ওকে বলে।

শ্যামলী বলে—এর মধ্যে ওর মতামতেরও দাম দিতে শিখেছো। বাঃ একেবারে গুড হ্যাজব্যান্ড। সীমাকে সত্যিই হিংসা হয়।

সমীর চুপ করেই থাকে। শ্যামলী ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বলে,

—সম্পর্কে ভগ্নপতি, একটু ঠাট্টাই না হয় করলাম।

সমীর দেখছে সীমাকে।

তার বাবার অবস্থা ভালোই। শহরের পরিবেশে মানুষে হয়েছে আদর যত্নে। সীমা শুনেছিল তার স্বামী কলকাতায় চাকরি করে। কলকাতাতেই থাকতে পারবে।

কিন্তু বিয়ের পর তাকে কলকাতা নিয়ে যাবার কথা বলেনি সমীর। সে গ্রামেই রয়েছে। গ্রামে অবশ্য এর আগেও দুচারদিনের জন্য মাসীর বাড়িতে এসে থেকে গেছে সীমা।

বিভূতিবাবুদের অবস্থা এদের থেকে অনেক ভালো, পাকা দোতলা বাড়ি। এদের মাটির বাড়ি। তবে এখন প্রভাদেবী প্রবীর বাড়ির ওদিকে একটা পাকাবাড়িই তুলছে।

সমীর এখন উপন্যাস-গল্প থেকেও কিছু টাকা পাচ্ছে। সুরেশবাবু তার গল্প নিয়ে ছবি করার খবর বের হয়েছে পত্র-পত্রিকায়, এর মধ্যে আরও একজন প্রযোজক তার গল্প একটা নিয়েছে। তার চিত্রনাট্য করছে সমীর। এই টাকাও বাড়িতেই দিচ্ছে সমীর। তার মা বলে—সমী, মাটির বাড়িতে আগে ছিলাম না রে, চিরকাল পাকাবাড়ির কোয়ার্টারেই থেকেছি। এখানে এসে এই মাটির কুঁড়েতে ছিলাম তোদের নিয়ে। গোবর মাডুলি দিয়েছি। এবার একটা পাকাবাড়ি কর। বৌমাও কি মাটির কুঁড়েতে থাকবে?

সমীরও মায়ের কথায় আপত্তি করেনি। পাকাবাড়ি তুলছে। তবু সীমার মনটা খুশি নয়। সে সমীরকে বলে,

—এই গাঁয়েই পড়ে থাকতে হবে? আর তুমিও চিরকাল মেসেই দিন কাটাবে?

সমীর বলে—সত্যি সীমা, তোমাকে এখানে এনে বিপদেই ফেলেছি।

—বিপদ! সীমা অনুযোগ করলেও সমীরকে আঘাত দিতে চায়নি।

সমীর বলে—নয় তো কি। শহরের প্রাচুর্যের মধ্যে মানুষ হয়েছো। এসে পড়লে গ্রামের

এক গরিবের ঘরে। আর কলকাতায় যাবার কথা বলছো? নিজেই দেখছো মা কত কষ্টে সংসার ধরে রেখেছে। এসময় এদের ফেলে নিজেরা স্বার্থপরের মতে চলে যাবো?

সীমা ভাবছে কথাটা। সমীর বলে,

—দুর্ভাগ্য আমার, আমি বড় ছেলে। বাবা মারা যাবার পর এদের সব ভার আমাকেই বইতে হচ্ছে। এরা দাঁড়াক-সেদিন আমরা ঘর বাঁধবো। ততদিন কষ্ট সইতেই হবে। তুমি এ বাড়ির বৌ-সেইটা তোমার দুর্ভাগ্য।

সীমা জীবনে প্রাচুর্যকে দেখেছে। তার মাঝে মানুষ হয়েছে। কিন্তু বিয়ের পর বুঝেছে এই তার সংসার। সমীরকে দেখেছে সেও সহ্য করেছে অনেক।

সীমা সমীরকে আঘাত দিতে পারে না। বলে,

—সবই বুঝি। কবে সেই দিন আসবে জানি না।

—সে দিন আসবেই। সমীর জীবন সম্বন্ধে আশাবাদী।

বাড়ির কাজ এগোচ্ছে। সীমার বাবা-ভাই মাঝে মাঝে আসে। এর মধ্যে প্রভা বাড়িতে ইঁদারাও করেছে। এখন গ্রামে গ্রামে বিজলি যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে তাদের গ্রামেও বিজলির লাইন হবে।

সীমার দাদা তরুণও মাঝে মাঝে আসে। সে বলে প্রভাকে,

—মাউই মা, ইলেকট্রিক আনুক। ইঁদারায় একটা পাম্প বসিয়ে দেব। বাড়ির ছাঁদে ট্যাঙ্কে জল উঠবে - বাথরুমেও জল পাবেন।

প্রভা বলে —দেখা যাক বাবা। আগে বিজলি আসুক।

প্রভা এখন কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়েছে। প্রবীর স্কুল মাস্টারি করছে। বাড়ির কাজ শেষ হয়েছে। ছোট ছেলে সুবীর এবার বি-এস-সি দেবে। শহরে হোস্টেলে থেকে পড়ে। সে দিন দুপুরে ও বাড়িতে চিৎকার - পারুলের কান্নার শব্দে সচকিত হয়ে ওঠে প্রভা। সীমাও এর মধ্যে জেনেছে ওই বাড়ির সঙ্গে তাদের সম্পর্কটা। মাঝখানে এখন পাকা দেওয়াল উঠেছে। ওদিকে জেঠিমার গলা শোনা যায় —কেঁদে আর কি হবে। এমন সোনার চাঁদ ছেলে গেল, তার চিররোগা একটা মেয়ে, ও তো মরে তোকে বাঁচিয়েছে লা। মেয়েকে মানুষ করা—বিয়ে দেওয়া ওসব কি করে করতিস?

করালী বলে—আর কাঁদিস না ঢং করে। মেয়ে গেছে আপদ গেছে। চুপ করে শোনে প্রভা।

সীমা বলে—বড়দির মেয়েটা খুব ভুগছিল। কিছু হলো নাকি? যাবো ওদিকে? প্রভা চেনে তা জাকে। ইদানীং এদিকে পাকাবাড়ি তোলার পর থেকেই বড় জা, করালী এবার এদের উপর হাড়ে চটে গেছে। তাই কারণ অকারণে ওদিক থেকে শোনায় —খুব যে দালান দিচ্ছিস লা? বেশি গরব করিস না।

করালীর মা মালতী আবার ছড়া কাটে

—পরের চাকরি প্যাদা গিরি

তায় রেখেছে মোচ্।

সেই গরবে মাগের গরব

ঘরে দেয় না ছোঁচ। —কি আমার পাটরানী বউ এনেছিস লা—তার

জন্যে দালান দিতে হবে?

কথাটা সীমাও শোনে। প্রভা বলে —ওসবে কান দিও না মা। আমি অনেক সয়েছি ওসব।

তবু সীমা আজ না গিয়ে পারে না। পারুলের জন্য সেও বেদনা বোধ করে। জীবনে অকালে স্বামীকে হারিয়ে মেয়েটাকে নিয়েই বেঁচেছিল, সেই অবলম্বনটুকুও হারিয়ে গেল।

মালতী ঠাকরুণের শোক দুঃখ নাই। সে ফুঁসে চলেছে।

—এই রাক্ষসীই অপয়া, ঘরে এসে শ্বশুরকে খেলো, সোয়ামী খেলো, এবার মেয়েটাকে খেলো। আর কত খাবি লা?

করালী বলে —তাই বলছি দেবা, ওটাকে দূর কর। ওই রাক্ষসী এবার আমাদের না খায়।

সীমা চুপ করে শোনে মাত্র। জীবনের এই কঠিন রূপকে সে এখানে প্রত্যক্ষ করে শিউরে উঠেছে। তার তুলনায় সীমা অনেক নিশ্চিন্তেই আছে। সমীরকে নিয়ে সে খুশি।

এখানে শাশুড়ীও তাকে মেয়ের মতই ভালোবাসে। সীমার হাতেই সংসারের টাকাকড়ি তুলে দিয়েছে। প্রবীরও মাসের মাইনে পেয়ে তার হাতেই তুলে দেয়। সুবীরের যত আবদার তার কাছেই।

প্রভাই বলে—মা, সুবীকে তুমিই মাথায় তুলছো। সেদিন প্যাণ্ট জামা করালো - আবার ওকে এত টাকা দিলে?

সুবীর বলে—বৌদি, মায়ের কিপটেমি স্বভাবের কথা তো জানো না। মহা কঞ্জুস।

সীমা তার সংসার নিয়ে তৃপ্ত। তাই পারুলের বেদনায় সেও মুষড়ে পড়ে। সীমা বাড়ি এসে কাপড় চোপড় ছাড়ে। প্রভাকে বলে—

—মা, এবার ওরা দিদিকে বাড়ি থেকে না তাড়ায়।

প্রভা চমকে ওঠে - কেন? ওর কি দোষ? তাছাড়া বাড়ির বড় বৌ - তারও তো হক আছে। তাড়ালেই হলো, ও যাবে কোথায়?

কিন্তু এবার সেই পর্বই শুরু হয়। দেবেনও এবার করণীয় একটা কাজ পায়। বৌদিকেই হঠিয়ে দিয়ে এবার সে সবকিছু একাই দখল করতে চায়। পারুল এখন ওদের চোখের বিষ।

একবেলা চাট্টি ভাত তাও ঠিকমত দেয় না ওরা।

পারুলও বিপদে পড়ে! স্বামী-মেয়ে আজ নিজের বলতে কিছুই নাই। তার যেন কোন দাবিই নাই এখানে।

পারুল দেখেছে প্রভার উপরও মা মেয়েতে এমনি অত্যাচার করেছিল। সময়ে ভাতও দিত না। মা মেয়েতে দরজা বন্ধ করে ঘরের ঘিয়ের লুচি, ক্ষীর খেয়েছে তাকে দিত দুখানা পোড়া রুটি। ভাতের উপর তরকারীও দিত না।

কিন্তু কাকীমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল। আজ তার দিন বদলেছে. এখানে থেকে সরে গেছে, নিজের সংসার এখন গড়ে তুলেছে। আর কিছুটা হয়েছে ছেলেদের জন্য। তার কেউ নাই. তাই জীবনভোর এই বঞ্চনাই সইতে হবে।

সেদিন ভাতই দিয়েছে ওকে। পারুল বলে, একটু ডাল তরকারি-করালী ফুঁসে ওঠে

-এবার পোলাও কালিয়া চাইবি না? ওই জুটেছে তোর বাপের ভাগ্যি। পারুল বলে — তোমার এতো জোটে কেন? বিয়ে হয়েছে শুনি-তা স্বামীর ঘরেই যাও। এতো আমার স্বামীর ঘর-আমি কেন পাবো না?

—কি বললি? এত বড় মুখ-

করালী ওর চুলের মুঠি ধরে ভাতের থালা থেকে তুলে মারতে থাকে। মালতীও গর্জায় - সব খাকীকে তাড়ালে দেবু। এ্যা - এতবড় মুখ!

দেবেনও বীরদর্পে গর্জে ওঠে নিকালো। আভি নিকালো এখান থেকে। এক লাফে সে এসে পারুলকে ঘাড় ধরে বাড়ির বাইরে এনে ঠেলে ফেলে দরজাটা বন্ধ করে দেয়। ছিন্ন লাস - পারুল শক্ত মাটিতে ছিটকে পড়েছে। তার কপালটা কেটে গেছে পাথরে লেগে। চোখের জল মিশেছে সেই রক্তে।

পথে লোকজন জুটে গেছে। মনু মুখুয্যেও যাচ্ছিল, শরৎ ভট্‌চায্‌ ওদিক আটচালায় দাবার ছক পেতেছে, গোলমাল শুনে এসে পড়ে। বলে সে —একি হচ্ছে দেবু। তোর বৌদি-

দেবেন কিছু বলার আগে মালতী বলে —বৌ! শত্রুর, ডাইনী। ওকে তাই ঝেটিয়ে বিদেয় করলাম।

পারুল আর্তনাদ করে—মা, কোথায় যাবো?

—চোপ, কে তোর মা? জাহান্নামে যা - শহরে যা। সেখানে ভালোই থাকবি। প্রভাও বের হয়ে এসেছে। সীমাও রয়েছে ওদিকে। সে এমনি ভয়ই করেছিল। জানে সীমা পারুলদির বাবা মা নেই। খুবই গরীব ওরা। একটা ভাই আছে - তবে সে কোথায় তা পারুলও জানে না। দেশের বাড়ি ঘর ছেড়ে কোথায় রয়েছে কোন পাহাড় বনে সামান্য কাজ নিয়ে। বোনের খবরও নেয় না।

সমীর কলকাতা থেকে ফিরছে। আর এই সময়ই এসে পড়ে সে। প্রভা পারুলকে তুলেছে। কান্নায় ভেঙে পড়ে পারুল। প্রভা জানে তারও এই অবস্থাই করতো ওরা, ঈশ্বর তাকে সাহায্য করেছেন। সেদিন প্রভা মালতীর অত্যাচারের জবাব দিতে পারেনি। আজ যেন দেবে সেটার। তাই বলে প্রভা পারুলকে,

—তুই চল মা আমার ঘরে। আমার যদি একমুঠো জোটে, তোরও জুটবে। চল—

পারুল অবাক হয়ে দেখছে প্রভাকে।

—কাকীমা!

—হ্যা মা। চল। জীব দিয়েছেন যিনি আহার দেবেন তিনিই। চল।

পারুলকে ধরে নিয়ে আসে। সীমাও এগিয়ে আসে। শাশুড়ির এই সিদ্ধান্তে সেই খুশি হয়। বলে সীমা—এসো বড়দি।

সমীরকে বাড়ি ঢুকতে দেখে খুশি হয় প্রভা।

—আয় বাবা।

সমীর দেখছে ওদিকে সীমা তুলো এনে পারুলের রক্ত মুছে সাফ করছে। সমীর খুশিই হয় সীমাকে ওকে সেবা করতে দেখে।

ওদিক থেকে তখন জ্যাঠাইমা মালতী আর তস্য কন্যা করালীর বাক্যবাণ বর্ষিত হয়ে চলেছে। দেবেনও গর্জাচ্ছে।

—কদ্দিন ভাত দেয় দেখা যাবে। এবাড়িতে ঢোকার পথ বন্ধ। যাও কোন চুলোয় যাবে।

মালতী শোনায়—খুব যে দরদ লা ছোট বৌ - আমি পাপকে বিদেয় করলাম আর তুই ঠাঁই দিলি। শত্রুর কাকে বলে।

পারুলের চোখে জল। রাত নেমেছে।

প্রভা বলে—কাঁদিস নে মা, জীবন ভোর তো কাঁদলি। এখন থাম। একটা পথ তোর হবেই।

সমীর, প্রবীর খেতে বসেছে। প্রভা বলে

—হ্যাঁরে দেশে আইন নাই? সব হারিয়ে মেয়েদের কি পথে পথে ঘুরতে হবে? তার কি দুমুঠো অন্ন - একখানা বস্তর পাবার হক্‌ও কোথাও নাই?

সমীর ভাবছে কথাটা। প্রবীর বলে,

—পথ একটা আছে মা।

সমীর শুধোয় —কি পথ?

প্রবীর বলে —কাল বিভূতিকাকার সঙ্গে কথা বলো। শুনছিলাম এখন আইন বদলেছে। বৌদেরও অধিকার দিয়েছে সরকার।

প্রভা বলে —তুই কথা বল সমী, বৌমার জন্য কিছু করতেই হবে।

সীমাও দেখেছে পারুলের দুর্ভাগ্য - ওই চরম অপমানকে। মেয়ে হয়ে আর একটি মেয়ের উপর এই অত্যাচার তারও মোটেই ভালো লাগেনি। রাতে সীমাও সমীরকে বলে,

—তুমি কথা বলো মেসোমশায়ের সঙ্গে। দরকার হয় বাবার কাছেই চলো-আমিও যাবো পারুলদিকে নিয়ে। এত বড় অত্যাচারের একটা বিহিত করতেই হবে। শয়তানের দল।

সমীর বলে—খুব রেগে গেছো দেখছি।

সীমা বলে—রাগবো না? মেয়েদের কি কোন হক্ই নাই? শুনেছি তোমার ওই জেঠিমা আর করালীদি তোমাদেরও এই ভাবে দূর করতে চেয়েছিল?

সমীর বলে—তাহলে তো ভালোই হতো।

—কেন? সীমা ডাগর চোখ তুলে চাইল।

সমীর বলে—এমনি একটা হতভাগার হাতে তোমাকে পড়তে হতো না।

কত ভালো পাত্র-শহরের পাত্র জুটতো।

সীমা বলে—তোমাকে তবু চিনেছি। তারা আবার ক্যামন হতো কে জানে। এই ভালো। এইটুকু নিয়েই খুশি থাকতে চাই।

সমীর দেখছে সীমাকে। তাদের তুলনায় ওর বাবা দাদারা বড়লোকই। সীমা শহরের আরাম আয়েস ছেড়ে গ্রামের জীবনকেই তবু মানিয়ে নিয়েছে। সমীর বলে,

—ভয় হয়েছিল সীমা, এই জীবনকে তুমি হয়তো মেনে নিতে পারবে না। তবে কি জানো—জীবন একটা স্রোতের মতই। সব অবস্থাতেই মানিয়ে নিতে পারলেই শান্তি মেলে

-মানিয়ে না নিতে পারলেই অশান্তির কারণ ঘটে। জীবনে তাই মানিয়ে নেওয়াটাই বড় কথা।

—সীমা সেই চেষ্টাই করে চলেছে। বলে সমীর,

—বাড়ির বড় বৌ তুমি। তোমার দায়িত্ব অনেক। আর কি জানো সংসারের রূপটা কঠিনই। আমি একটা মতে চলি।

সীমা চাইল —মত? সেটা আবার কী?

—সংসারে চাকরি যেদিন থেকে শুরু করতে বাধ্য হয়েছি - সেদিন থেকেই সংসারের আমাকেই ভার নিতে হয়েছে। এদের দাঁড় করাবার চেষ্টা করেছি - বাড়ি করেছি নিজের সামান্য রোজগার থেকেই - ভাইদের মানুষ করেছি। কিন্তু তাদের কাছে কোন দাবি আমার নেই - কিছুর প্রত্যাশাও করিনি কারো কাছে। কর্তব্য বলেই করেছি। করছি। চণ্ডীদাসের একটা কথা আছে—

চণ্ডীদাস কহে শুন বিনোদিনী
সুখ দুখ দুটি ভাই,
সুখের লাগিয়া যে করে পীরিতি
দুখ যায় তার ঠাঁই।

সীমা বলে—এযে প্রেম-পীরিতির কথা গো।

—কঠিন সত্যকথা সীমা। কোন উদ্দেশ্য, স্বার্থ নিয়ে যদি কারোও জন্য কিছু করো, তাকে ভালোবাসো, তাতে ঠকবেই। সে কেন তোমার জন্য কিছু করল না, প্রতিদান দিল না এ প্রশ্ন জাগবেই। তাতে দুঃখই পাবে। তাই যার জন্য যা করো না কেন - কোন প্রত্যাশা নিয়ে করবে না। তাতে দুঃখ পাবে না। এটা সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। মা - ভাই, বোন - স্বামী, স্ত্রী, সন্তান সকলের ক্ষেত্রেই।

সীমাও ভাবছে কথাটা।

বলে সে - রাত হয়েছে। এই সাহিত্যের ভাষণ থামিয়ে এবার শুয়ে পড়ো।

পারুল প্রভার ঘরে শুয়েছে। ঘুম আসে না পারুলের। আজ তার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেছে। ওই বাড়ির মানুষগুলো কোন দিনই তাকে দেখতে পারেনি। তার স্বামীর উপরও অত্যাচার করেছিল ওই করালী আর দেবেন।

রমেন মারা যাবার পর তাকে ওই বাইরের বাড়িতেই ফেলে রেখেছিল। দিনান্তে সের কয়েক চাল ফেলে দিত, যেন ওই বাড়ির ঝিই সে। একমাত্র অবলম্বন মেয়েটাও অসুখে পড়লো। শাশুড়ি - করালীই বলে—আপনি পায় না শঙ্করাকে ডাক। কে খরচা করবে ওই আধমরা মেয়ের পিছনে। এর বেঁচে থেকে লাভ কি? মরুক। তোরও হাড় জুড়াবে।

পারুলের চোখে জল নামে। প্রভাই কিছু টাকা দেয়। রমণ ডাক্তারকেও বলে,

—মেয়েটাকে ওষুধ দাও রমন। খর্চাপত্র আমিই দেবো। বড়দিকে বলো না। কিন্তু কিছুই করা যায়নি। মেয়েটাও মারা গেছল।

আজ পারুল একা। চোখে জল আসে। প্রভা জেগে ওঠে।

—কি পারুল, এখনও ঘুমোসনি? রাতভোর জেগেই থাকবি মা? শুয়ে পড়। একটা ব্যবস্থা হবেই।

গ্রামের লোকও সবাই জানে দেবেন - মালতীরা, বড়বৌকে বের করে দিয়েছে। মনু

মুখুয্যে বলে,

—বড় অপয়া হে। সংসারের অকল্যাণই করেছে মেয়েটা। শরৎ ভট্চায্ খিচিয়ে ওঠে —তুমি তো অপয়া, তাহলে বলি তোমার ছেলে, গিন্নীকে, তোমাকেও তাড়িয়ে দিক বাড়ি থেকে।

মনু মুখুয্যে, শরতের দল সকালে বিভূতিবাবুর বৈঠকখানায় আসে। প্রাত্যহিক চা টা এখানেই সেবা করে। তার সঙ্গে তামাকও। বিভূতিবাবু বলে—দেবেন কাজটা ঠিক করে নি। হাজার হোক বাড়ির বড় বৌ-সে যাবে কোথায়?

এমন সময়ে সমীর আর সীমাকে আসতে দেখে চাইল মনু মুখুয্যে। সীমা বলে — মেসোমশাই, একটু ভিতরে আসুন। কথা আছে।

বিভূতিবাবুও ভিতরে যান।

মনু মুখুয্যে জানে ওদের বাড়িতেই পারুল উঠেছে। আর সমীরকে সস্ত্রীক এখানে আসতে দেখে তার সন্দিগ্ধ মন কিছুটা আঁচ করে নেয়। বলে সে,

—ব্যাপারে কি বলোতো শরৎ?

শরৎ ভট্চায্ বলে—ওদের আসা যাওয়া তো আছে, তাই এসেছে।

মনু মুখুয্যে এত সহজে এটাকে মেনে নিতে পারে না। তার মনে অন্য রহস্য দানা বাঁধে।

সমীর সীমা তখন বিভূতিবাবুর বাড়ির ভিতরে বেশ জাঁকিয়ে বসেছে। বিভূতিবাবুর স্ত্রীও শুনেছে ঘটনাটা। সীমা বলে,

—বাড়ি থেকে বৌকে তাড়িয়ে দেবে, এর বিহিত হবে না? পারুলদি যাবে কোথায় মাসীমা?

কল্যাণী বলে —তাই তো রে, ভাবনার কথা।

বিভূতিবাবু কি ভাবছেন। বলেন, অবশ্য আইনে একটা পথ আছে।

—কি? সমীর শুধোয়।

বিভূতিবাবু বলেন এখন আইনত ওই সম্পত্তির অর্ধেকের মালিক ওই বড় বৌ। নতুন আইনে তাই বলে।

সমীর বলে —ওই দেবেন তো ওকে তাড়িয়েই দিয়েছে। কোন কিছুই দেবে না। আর বৌদিরও কেউ নাই যে ওর হয়ে লড়বে।

সীমা বলে —মা তো ওকে বাড়িতে এনেছেন। বলেন —ও নাহয় আমারই একটা মেয়ে। থাকুক।

—কিন্তু ওর হক্ কেন পাবে না? সীমার কথায় বিভূতিবাবু বলেন,

—সমীর, পারুলের অংশ এখন যদি কেউ কিনে নেয় তাহলে সে দেবেনদের সম্পত্তির অর্ধেকের মালিকই হবে। আর সে দাবি করলে আইনই তাকে অর্ধেক সম্পত্তি দিতে বাধ্য করাবে। সীমা বলে সমীরকে —তাহলে ওই পারুলদির কাছ থেকে তুমিই কিনে নাও ওর সম্পত্তি।

সমীর বলে তা কী করে হয়? লোকে বলবে অসহায়া বিধবাকে হাতে এনে ঠকিয়েছি।

তার সর্বস্ব নিয়েছি। না - না -

সীমা বলে —নেবে কেন? ওই ভাবে ওর জমি উদ্ধার করে দাও। পারুলদির তাতেই ভালোমতই চলে যাবে। ওই জমির উদ্বৃত্ত ফসল থেকে পারুলদি ক্রমশ তার দেনা শোধ করে দেবে। অবশ্য সময় লাগবে।

বিভূতিবাবু বলেন —সমীর, সীমা ঠিকই বলেছে।

সমীর বলে —মেসোমশাই এটা না করে আমি যদি বৌদিকে দিয়েই তার অংশ বন্টন করে দেবার মামলা শুরু করি, আদালত বিধবার দিক দেখে নিশ্চয়ই সুবিচার করবে। না হলে বিক্রির কথা বললে - বৌদিও কিছু ভাবতে পারে।

বিভূতিবাবু বলেন —তাও হয়। ভালোই হয় সমীর। সীমাও এতে সায় দেয়। বলে সে —তাহলে কালই সদরে গিয়ে বাবাকে বলি, নন্দকাকা তো নামী উকিল। উনিই যা করার করবেন।

মনু মুখুয্যে মনে মনে হিসাবটা করেই রেখেছিল। সেও আইনের ব্যাপারটা ভালোই বোঝে। পারুল সেদিন বৈকালে ঠাকুর মন্দিরে গেছলো। ফিরছে, হঠাৎ মনু মুখুয্যকে দেখে চাইল। মুখুয্যেই বলে,

—দেবেনটা একটা গণ্ডমূর্খ মা। ছিঃ ছিঃ একেবারে ঘোরতর অন্যায় কাজ করেছে। শোন বাড়িতে এসো মা। তোমার কাকীমা তো সব শুনে কি কান্না - একটিবার দেখা দিয়ে যাও।

পারুল গেছে মনু মুখুয্যের বাড়ি।

ওর স্ত্রী ওকে জল খাওয়ায়, চোখের জলও ফেলে ওর দুঃখে। মনু বলে —একটা বিহিত করতে চাই মা। গাঁয়ের লোক এতবড় অন্যায়কে চুপ করে থাকলেও আমি থাকবো না। তোমারও হক আছে - না হয় কাশীতেই থাকবে। আমার পিসীমা ওখানে থাকে। বাবা বিশ্বনাথের চরণে পড়ে থাকবে।

পারুলেরও মন চায় চলে যেতে কোন তীর্থস্থানে। বলে সে,

—কিন্তু চলবে কিসে? পয়সার তো দরকার।

মনু বলে —পিসীমার বাড়িতেই থাকবে ওর কাছে। মস্ত লোক ওরা - আর ধরো এককালীন হাজার পাঁচেক টাকা পাশবইএ রেখে দিলে কিছু সুদও পাবে। তোমার আর খরচা কি মা - ওতেই চলে যাবে।

—পাঁচ হাজার টাকা! কোথায় পাবো কাকা?

পারুলের কথায় মনুও হিসাব করে। ওই দেবেনের অর্ধেক সম্পত্তির দাম অনেক। নিদেন পনেরো বিঘে ধান জমি সে পাবে। বাগান—পুকুর, বাস্তু বাড়ির ভাগও কম নয়। মনু বলে —বিপদের সময় সাহায্য করা মানুষেরই ধর্ম। তুমি বিপদে পড়েছো, ওটাকা আমিই দোব মা - শুধু একটা দলিলে সই করে রেজেস্ট্রি করে দিতে হবে। ওসব ব্যবস্থা আমিই করে দোব - তুমি শুধু সই করে দেবে। তারপর ঝাড়াহাত পা, চলে যাও বাবা বিশ্বনাথের চরণে - শান্তি পাবে মা। সংসারের বন্ধন থেকে তিনিই মুক্তি দিয়ে তাঁর চরণতলে ঠাঁই দিতে চান। তুমি সত্যই ভাগ্যবতী মা। পরম ভাগ্যবতী।

পারুল ওর কথাগুলো শুনছে। সব ছেড়ে চলে যেতে হবে কোন অজানা জগতে। মনু বলে তবে কাউকে এসব কথা বলো না মা। সমীরকেও না! ওই চাইবে তোমাকে অসহায় বুঝে কোনমতে ঠকাতে - টাকা তুমি নগদই পাবে মা। তাহলে কালই জানাবো - দু একদিনের মধ্যেই শুভকাজটা সেরে তোমাকে কাশীতে পৌঁছে দিয়ে আসবো। জয় বাবা বিশ্বনাথ।

পারুল ওই মনু মুখুয্যেকে চেনে। কোনদিনই মনু তার হয়ে কথা বলেনি। লোকটার সম্বন্ধে নানা কথাই শোনে। শম্ভু মুদির অনেক টাকা মেরেছে। শ্যামলীদির নামেও যাতা রটিয়েছিল। সমীর তাকে বাড়িতে দেবার জন্য টাকা দিয়েছিল। একেবারে অস্বীকার করেছে। এমন লোককে ওসব কথা বলতে দেখে অবাক হয় সে।

আরও বেজেছে পারুলের এখান থেকে চিরদিনের জন্য চলে যেতে হবে কোন অজানা জায়গায়। এই মাটিতেই রয়েছে তার স্বামী - সন্তানের শেষ চিহ্ন - এখান থেকে চলে যেতে মন চায় না।

কথাটা পারুল এসে প্রভাকেই সব বলে। সমীরও শোনে। সীমা বলে - দেখলে, ওই শকুন ঠিক ভাগাড়ে এসে জুটেছে। ও চায় বিক্রি দলিলে দিদির সই করিয়ে অনেক কিছু পেতে। আর এই ভাবে ঠকাবে পারুলদিকে ওই শয়তান?

সমীর এবার বুঝেছে ব্যাপারটা। সেইই বলে,

—বৌদি, আইনত ওই বড়দাও ওর পৈত্রিক সম্পত্তির অর্ধেকের মালিক। এখন তুমিই মালিক।

পারুল অবাক হয়। কি বলছ ঠাকুর পো? তাহলে ওরা আমাকে এইভাবে তাড়িয়ে দিল?

সীমা বলে —তাই আদালতে গিয়ে তুমি তোমার হক্ চাইবে। আইন তোমাকে ওই সম্পত্তির অর্ধেক দেবে। তোমার কোন অসুবিধাই হবে না।

পারুল বলে —কিন্তু সে তো খরচার ব্যাপার - সদরে যেতে, থাকতে হবে। উকিলের খরচা - আমি এসব কোথায় পাবো রে সীমা।

সীমা বলে —শহরে আমাদের ওখানেই উঠবে আমার সঙ্গে। কাকাবাবু নামী উকিল। যা করার উনিই করবেন। আমিই সব ব্যবস্থা করে দোব। আমি চাই - এত বড় অন্যায়ের প্রতিকার হোক।

পারুল কি ভাবছে। প্রভা বলে,

—সব থাকতে পরের দয়ায় কেন থাকবি? ওসব ওরাই করে দেবে - তুই মাথা উঁচু করে থাকবি এইখানে, তাই দেখাতে চাই।

সমীর বলে —মনু মুখুয্যে এতবড় শয়তান ভাবতেই পারিনি। এই ভাবে ঠকাবার মতলব করেছিল!

প্রভা বলে —আমাদেরও পথে বসাতে চেয়েছিল - সেই দিনগুলোর কথা ভুলিনি রে। তাই পারুলকে কেউ ঠকাক তা হতে দেব না।

পরদিনই সমীর পারুলকে নিয়ে সদরে চলে যায়। মনু মুখুয্যে এর মধ্যে হিসাব করে

ফেলেছে। দমকা পনোরো বিঘে ধানজমি আরও অনেক কিছুই পেয়ে যাবে সে। মামলা ঠুকতে হবে - সেটা মনু ভালোই জানে। সে বাড়িতে দলিলের খসড়া করছে।

গিন্নী পুকুরে স্নান করতে গিয়ে দেখে দুটো রিকশায় করে সমীর সীমা পারুল কোথায় যাচ্ছে। সীমাই বলে —বাবার ওখানে যাচ্ছি কাকীমা।

—কিন্তু পারুল?

সীমা বলে —ওর মনমেজাজ ভালো নাই তাই ওকেও বললাম চলো ক'দিন ঘুরে আসবে।

মনুর বৌ স্নান সেরে দাওয়ায় জলের কলসীটা নামিয়ে বলে,

—এসব লেখাপড়ায় ঘণ্টা হবেক, তোমার পাখি যে ফুড়ুৎ ধা। চমকে ওঠে মনু - মানে!

—ওই পারুলকে নিয়ে দেখলাম সমীর আর ওর বউ বাংড়োয় গেল। সদরে।

—সে কি! মনু যেন আকাশ থেকে পড়ে। আজই শুভকাজটা সেরে ফেলতো। সে কিন্তু ফাঁক থেকে এমনি বিপদ ঘটবে তা ভাবতেই পারেনি। বেশ বুঝেছে মনু তার হাতের মুঠো থেকে সবকিছু ওই সমীরই ছিনিয়ে নিল। এবার তার পরবর্তী পদক্ষেপের কথা ভাবছে মনু মুখুয্যে।

দেবেন বেশ বীরদর্পে সেদিন পারুলকে বের করে দিয়ে এখন বুক ফুলিয়ে বেড়াচ্ছে। ভেবেছিল পারুল কান্নাকাটি করবে গ্রামের লোকেদের কাছে। সে পাত্তাই দেবে না। মালতী -করালীও খুশি হয়েছে আপদ বিদেয় করতে পেরে।

তবু মাঝে মাঝে করালী পাঁচিলের ওদিকে উদ্দেশে বলে,

—কত দরদ দ্যাখা যাবে। বড়লোকী চাল, ফুটানি ঢের দেখা আছে ।

সেদিন দেবেন বাড়িতে কি কাজ করছে, মালতী দাওয়ায় বসে পান-দোক্তার আয়োজন করছে। মনু মুখুয্যেকে ঢুকতে দেখে চাইল দেবেন। মালতীও বলে —সালিশী করতে এসেছো বুঝি? ওই অভাগী সাতখান করে লাগিয়েছে?

দেবেন খড় কাটছিল, বলে—ওসব কোন কথা শুনবো না। মরদা কা বাত হাতিকা দাঁত। যা করেছি - ব্যস। ঠিক করেছি।

মনু বলে —এবার ঠ্যালা সামলা দেবেন?

—মানে? দেবেন চাইল।

মালতী শুধায় —কী হলো আবার?

মনু বলে—তোমার বড় বৌ আদালতেই গেছে মনে হয়।

দেবেন খড়কাটা বন্ধ রেখে উঠে আসে —কী বলছ মনুকাকা! আদালতে যাবে?

—তাই মনে হচ্ছে।

—সে তো অনেক টাকা - অনেক ঝামেলা। কোর্ট-কাছারি বলে কথা। সদরে যাতায়াত করা কি কম খরচা! দেবেন বিড় বিড় করে।

মনু বলে—ম্যাড়া লড়ে খুঁটোর জোরে। সেই জোর পেয়েছে তোমার বৌ গো?

মালতী অবাক হয় - কী বলছ?

—হ্যাঁ, ওই সমীর তার বৌ তোমার বৌমাকে নে সদরে ওর শশুরের কাছে গেছে। নন্দউকিলের নাম শুনেছো? দুঁদে উকিল তিনি ওই সমীরের খুড়শ্বশুর। কে জানে কি করে?

মালতী এবার চুপ করে যায়। দেবেন বলে, এতই সস্তা। দখল নেহি দেগা। মনু মুখুয্যে বলে —সেটা তোর ব্যাপার। খবরটা দিয়ে গেলাম।

মালতী এবার ফুঁসে ওঠে। তার সঙ্গে যোগ দেয় করালীও। মালতী তার স্বর্গত স্বামীকেই ডাকাডাকি করে শোনায়।

—ওগো তুমি কোথায় গেলে গো। কি বিষবৃক্ষ পুতে দিয়ে গেলে গো - এযে বিষের জ্বালায় জ্বলে মরলাম গো!

করালী উদারা মুদারা ছাড়িয়ে তারায় গলা তুলে শাসায়,

—ধরম এর বিচের করবে।

সীমার বাবা, মা সব শোনেন সীমার কাছ থেকে। পারুলের চোখে জল। সীমার কাকা নন্দবাবু সদরের নামী উকিল। সীমার ছোটকাকা। তিনিই বলেন,

—এতো জেতা কেসই। এই ভাবে বঞ্চিত করবে?

সীমা বলে —ছোটকা, তোমাকে এই কেস করতে হবে। 'ফি' আমিই দেবো। হাসে নন্দবাবু।

—পাগলী। তুই ভাবিস না। আজই কাগজপত্র তৈরি করছি। সমীরও তাদের জমির কড়চা, দাগনম্বর-রেকর্ড পত্র নিয়েই গেছে। নন্দবাবু বলে—কাজটা দেখছি সহজ করেই এনেছো বাবাজী। কালই কাগজপত্র তৈরি করে মামলা রুজু করে দিচ্ছি। দু বার ঘোরালেই নাকদম হয়ে মীমাংসার পথ পাবে না।

সীমা বলে —সম্মানজনক সর্তেই মীমাংসা যদি হয় হবে, না হলে মামলা কিন্তু চলবে কাকা।

পারুল এদের এখানে এসে খুশিই হয়েছে। সুন্দর শান্তির সংসার। পুরুষদের সকলেই কাজে ব্যস্ত - ছোটরা স্কুল কলেজে ব্যস্ত। গ্রামের মত এখানে আলস্য নেই - এর তার পিছনে লাগার সময়ও এদের নাই। যে যার কাজ নিয়ে থাকে।

সীমা বলে —পারুলদি, মামলা শুরু করছি তোমার জন্যই। শেষে আবার পিছিয়ে যাবে না তো? দেওর - শাওড়ির কথা ভেবে?

পারুল তার মনস্থির করে ফেলেছে। সমীর বলে,

—তোমাকে জোর করছি না। বৌদি, কিন্তু মাথা উঁচু করে মেয়েদেরও এখন বাঁচতে হবে। তাই এছাড়া পথ নাই। শক্ত হতে হবে। পারবে তো?

পারুল আজ নতুন করে বাঁচতে চায়। স্বামী - মেয়েদের উপর ওদের অন্যায়ের প্রতিকার করতে চায়। বলে সে—আমি পিছিয়ে যাবো না ঠাকুরপো।

সমীর সীমারা ফিরে আসে দিন তিনেক পর।

প্রবীর বলে —ওরা বোধ হয় টের পেয়ে গেছে দাদা।

সমীর বলে —পাবেই। আজ না হোক কাল। কিন্তু কি ভাবে টের পেল ওরা?

প্রভাই বলে মনু ঠাকুরপোই সব খবর দিয়েছে ওদের।

প্রবীর বলে —ব্যাটা এক নম্বরের শয়তান। দেব একদিন ওকে সিধে করে।

সমীর বলে —ওসবের দরকার নাই। এখন যাক আদালতে - যা হবার সেখানেই হবে।

সমীরের ছুটি ফুরিয়ে আসছে। ওকে কলকাতায় ফিরতে হবে। বলে সে —মা, বৌদি এখানে যেমন আছে থাকুক। ওরা কী করে দেখা যাক। আমি কলকাতায় ফিরবো—ছুটি তো ফুরিয়ে গেল। মামলার দিন পড়লে প্রবীর যাবে। সীমা বলে —তেমন হলে ঠাকুরপোকে নিয়ে আমিই দিদিকে হাজির করাবো।

সীমা এখন যেন করার মত একটা কাজ পেয়েছে।

সমীর কলকাতায় ফিরছে আবার সেই অফিস আর লেখার কাজ।

এখন আর সে একা নয়। তার জীবনের সঙ্গে আর একজনের জীবনও জড়িয়েছে সে। মনে পড়ে সীমার কথা - আসার সময় তার চোখেও জল নামে। সমীর বলে — সীমা, কদিনের পরিচয়, তাতেই এই।

সীমা চুপ করে থাকে। সমীর বলে —সামনের মাসেই আসবো।

সমীরের এই মাঝে মাঝে কলকাতার বাইরে গ্রামে চলে যাওয়াটা যেন একান্ত প্রয়োজন। বাইরের প্রকৃতি তাকে অনুপ্রাণিত করে। শাল বন, মহুয়ার সুবাস, পলাশের রক্তিম আবেশ যেন তার মনকে নাড়া দেয়, বৃষ্টিবিধৌত লাল মাটি সদ্যস্নাত শালবন তার চোখ জুড়োয়। এখানের মাটি মানুষ, তাদের জীবনচর্যা, সুখ দুখের কাহিনীই উঠে আসে তার সাহিত্যে। তারাই সঞ্জীবিত করে তার চরিত্রগুলোকে।

দুর্গাপুরের বুকে আসছে একটা আমূল পরিবর্তন। স্বাধীনতার পর এক বৃহৎ কর্মযজ্ঞ শুরু হয়েছে সেখানে। দুরন্ত দুর্বার দামোদর নদী ছিল তাদের কাছে একটা দুর্বার বাধা হয়েই। বর্ষায় জেগে উঠতো এর বিধ্বংসী রূপ, পারাপার বন্ধ। গৈরিক জলধারা বয়ে চলেছে দুধার বেগে, ওদিকের শালবন ঢাকা চড়াইএ নামে বৃষ্টি ধারাস্নান।

সেই নদীর বুকে গড়ে উঠেছে ব্যারেজ। ওই জলধারাকে আটকে তাকে নদীর দুদিকের, ক্যানেলে বইয়ে দেওয়া হবে। সেই জলে হবে চায আবাদ। আর দুর্গাপুরে গড়ে উঠছে বিশাল সব কল-কারখানা।

এই ঘুমন্ত - অবহেলিত অঞ্চলের রূপরেখাই বদলে যাবে। সারা অঞ্চলে একটা প্রাণের সাড়া এসেছে। এদিকের শালবন, পড়ে থাকা প্রান্তরে রাস্তার ধারে গড়ে উঠছে ছোটখাটো কারখানা। দূর বনের ওদিক থেকে মাটির বুক থেকে উঠেছে কালো পাথরের স্তর। এতদিন সেই প্রান্তর পরিত্যক্ত হয়েছিল।

এখন সেই প্রান্তরের বুকে ডিনামাইট চার্জ করে তোলা হচ্ছে পাথর। পাথর ভাঙার মেশিনও বসেছে। সেই সব পাথরকুচি চালান যাচ্ছে দুর্গাপুরের কর্মযজ্ঞে।

এদিকের লোকজনও কাজ পাচ্ছে, আর ওইসব জমির মালিকরাও পাথর বেচে এখন হাল ফিরিয়েছে। এই এলাকার গ্রামগুলোর মানুষ এতদিন ঘুমিয়ে থেকে যেন জেগে উঠেছে, এতদিনের জমাট অন্ধকার - দুর্গাপুরের ফার্নেসের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

কলকাতা আছে কলকাতাতেই।

সমীর বাসায় কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। প্রশান্তবাবুকে পরের উপন্যাস দিতে হবে। উপন্যাসের জন্য আরও দু'একজন প্রকাশক বলেছে।

ওদিকে সুরেশবাবু শুটিং শুরু করেছেন। কোন সদ্য গড়ে ওঠা কলোনিতেই তিনি লোকেশন করেছেন। আর বেশ কিছুদিন কাজ করেছেন আউট ডোরে। সমীর তার সঙ্গে থেকে চিত্রনাট্য লেখার কাজও করেছে, আর মাঝে মাঝে লোকেশনেও যায় শুটিং দেখতে।

সাহিত্য ছাড়াও সিনেমার মাধ্যমটাকেও সে চিনতে জানতে চায়। তাই সমীর অফিসের পর দুপুরেই চলে যায় দূরের সেই লোকেশনে।

শিল্পীদের ডায়ালগও পড়ায়, সিন বুঝিয়ে দেয় সুরেশবাবুর কথামত, দেখে ক্যামেরার পজিশন। এগুলো সম্বন্ধে ধারণা থাকলে চিত্রনাট্য লেখার কাজটা ঠিকমত করা যায়। সমীর সবই মন দিয়ে করে।

সেদিন স্টুডিওতে গেছে। অনেক দিন আর রোহিণীর সঙ্গে দেখা হয়নি। রোহিণী চাকরি ছেড়ে দেবার পর দু'একবার দেখা হয়েছিল। তখন সমীর মেসে ছিল। মেসেও এসেছে রোহিণী। তারপর মেস উঠে গেছে।

রোহিণী ওর নতুন ঠিকানা জানে না। সমীরও ব্যস্ত হয়ে পড়ে নানা কাজে। রোহিণীর খবর আবছা পায়। কে যেন বলছিল রোহিণী ছবি করছে।

সেদিন স্টুডিওতে সুরেশবাবুর ঘর থেকে বের হয়ে বাগানের পাশ দিয়ে আসছে। হঠাৎ রোহিণীকে দেখে চাইল।

—তুমি!

রোহিণীও এগিয়ে আসে —এখন তো লেখার কাজ বেশ চলছে। অনেক পত্র-পত্রিকাতে নিয়মিত লিখছো। চালিয়ে যাও। এদিকে সুরেশবাবুর মত পরিচালক তোমার ছবি করছেন। এ ছবি দেখবে দারুণ হবে।

সমীর দেখছে রোহিণীকে। সেই আগেকার ঝকমকে তাজা ভাবটা আর নেই মনে হয়। কথার সুরে সেই দাপটও কম। কেমন যেন একটু মিয়োনো ভাবই ফুটে ওঠে ওর চেহারায়, কথায়। সমীর বলে —তোমার খবর কী বলো? ছবির কাজ কতদূর?

স্টুডিওতে যারা ছবি করে স্টুডিও কর্তৃপক্ষ তাদের কাজের জন্য একটা করে অফিস করে দেয়। লম্বা টানা একতলার ঘরে সার সার নানা পরিচালক, হবু পরিচালকদের ঘর। আশেপাশে ছবিতে নামার জন্য অনেকেই ভিড় করে, নানা বয়সী ছেলেমেয়ে - মধ্যবয়স্কদের ভিড়। যদি ছবিতে কোন কাজ পায়।

আর হবু নায়কের দল টাইট প্যান্ট, কেউ বা উত্তমকুমার - কেউ সৌমিত্র - অনিল চাটুয্যেরা ঘুরছে। তারা নিজেরাই এর মধ্যে কেউকেটা হয়ে গেছে।

রোহিণী ওই দিকে একটা ঘরে বসে।

সমীরকে নিয়ে ঢুকলো। কয়েকটা চেয়ার রয়েছে। সমীর দেখছে ওর অফিস। বলে রোহিণী

—ক'দিন স্যুটিং করেছি। সামনের মাসে আবার ডেট নেব।

তার ছবির কাহিনী, চিত্রনাট্য সঙ্গীত সবই রোহিণীই লিখেছে। সমীর বলে —কোন

নামী লেখকের গল্প নিলে ভালো করতে। চিত্রনাট্যও যদি কাউকে দিয়ে লেখাতে।

রোহিণী বলে —ওই তোমাদের দোষ, নামী লেখকরাই লিখতে পারে অনামীরা পারে না? দেখবে আমার গল্প যা লিখেছি না। হিরো হিরোইনের লাভ সিন - বাবা মায়ের ইমোশন্যাল সিন যা লিখেছি—আর চিত্রনাট্য? আমি ডিরেক্টার, আমার চোখ দিয়ে ছবিকে দেখাতে চাই এক নতুন অ্যাঙ্গেল থেকে। সেই অ্যাঙ্গেল কি তুলে ধরতে পারবে আজ যারা চিত্রনাট্য লিখছেন তাঁরা? এ ছবি একেবারে নতুন আঙ্গিক নতুন বক্তব্য নিয়ে আসছে, দেখবে ছবি কি করি।

সমীর অবাক হয়ে শুনছে রোহিণীর কথা। এই ধরনের কথা স্টুডিও লাইনে প্রায় সবাই বলে। এ জগতে বিনয়ীর সংখ্যা কম সৃষ্টির উদ্দাম আনন্দে তারা আত্মহারা - মাত্রাহারা।

এর মধ্যে দুচার জন হবু স্টারও এসে গেছে। তারা এসে প্রণাম করে - কেমন অছেন রোহিণীদা - সেদিন আপনার একখানা গান শুনছিলাম, একেবারে পাগল হয়ে গেছি দাদা।

অন্য একজন বেশ দামী পোশাক পরা তরুণ এসে ঢোকে বিদেশী সুগন্ধীর গন্ধ উঠছে। চোখে সোনালী ফ্রেমের চশমা। রোহিণীই তাকে বলে

—এসো কিশোর।

কিশোর বলে —দাদা আমার রোলটা?

রোহিনী সেই গান ভক্ত ছেলেটিকে বলে —এখন এসো তুমি। পরে দেখা করো।

ছেলেটি চলে যায়, কি যেন বলছিল সে। রোহিণী বলে —পরে এসো - কথা হবে। আজ বিজি।

চলে যায় সে। সমীরের মনে হয় রোহিণী বেশ কিছু দিনে ভালো গানও লেখেনি। অফিসে কাজ করার সময়ই তার সেরা গানগুলো লেখা হয়েছিল। তারপর আর তেমন গান সে লিখতে পারেনি। নিজের আসল কাজটাই করেনি। এখন সিনেমা নিয়েই মেতেছে। তাও প্রযোজকও ঠিক তেমন পায়নি। টাকার জোগাড় নেই তাই ছবির কাজও এগোয়নি বিশেষ।

আর নামী দামী অভিনেতা - অভিনেত্রীদেরও নিতে পারেনি। ও যেন অন্ধকারেই পথ চলছে কোন মতে হাতড়ে হাতড়ে। সমীর দেখছে রোহিণী তখন সেই নবাগত ভদ্রলোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে কী কথা বলছে। সমীরই বুঝেছে এখন ব্যাঘাত না ঘটানোই সঙ্গত। তাই বলে সমীর

—চলি রোহিণী।

রোহিণী বলে—সামনের মাসেই স্যুটিং করছি এখানে। একদিন এসো।

সমীরকে এগিয়ে দিতে আসে রোহিণী ভদ্রলোককে বসিয়ে রেখে। সমীর বলে — এখন আছো কোথায়? বাড়িতে নেই কে বলছিল।

রোহিণী বলে —বাড়ি থেকে স্টুডিও দূরে পড়ে। জানো তো এদিকের নানা কাজ। তাই টালিগঞ্জে রিজেন্ট পার্কের ওদিকেই একটা বাসা নিয়েছি।

ঠিকানাটা ও দেয় সমীরকে। সমীর বলে,

—যাও, উনি বসে আছেন। আমি চলি।

—পরে দেখা করো। রোহিণীও বলে।

শ্যামলী খবর পেয়েছে সমীর ফিরেছে, কিন্তু শ্যামলী অবাক হয়। গ্রাম থেকে এলে সমীর ওর হেস্টেলে যেতো দেখা করতে। এবার আর যায়নি।

শ্যামলীই সেদিন আগে সমীরদের বাসায়। অবশ্য ওদের নীচে তলায় বেশিক্ষণ থাকে না শ্যামলী। দোতলায় বাসন্তীদেবী না হয় তার বউমার সঙ্গেই কথা বলতে যায়। শ্যামলী আজ এখানে এসে দেখে নীচেকার ঘর দুটো বন্ধই। সমীর - জগন্নাথরা কেউ নাই। তাই দোতলায় উঠে যায়।

বাসন্তীদেবী শ্যামলীকে দেখে খুশি হয় —এসো মা।

শ্যামলী বলে —মাসীমা, আপনার অপোগণ্ডগুলির কেউ তো নেই। সব গেলেন কোথায়?

—ও নীচের ওদের কথা বলছ? সমীর কদিন তো লিখছিল অফিস থেকে ফিরে এসে। আজ বোধ হয়, বের হয়েছে। শ্যামলীকে চা দাও বৌমা। ইউনিভার্সিটি থেকে আসছে তো।

বৌমাও চেনে শ্যামলীকে। প্রায় তারই বয়সী বাসন্তীদেবীর ছেলের বউ। শ্যামলী ওর ঘরে গিয়ে বসে। বাসন্তীদেবীর পুত্রবধূ কমলা শুধোয়,

—সমীরদার বৌ কেমন হলো?

—ভালোই।

কমলা বলে —সমীরদা বৌকে কি বাড়িতেই রেখে দেবে? এখানে আনবে না?

শ্যামলী বলে —কে জানে! তা তিনি গেলেন কোথায়?

কমলা বলে —দিনরাতই তো দেখি লেখাপড়া করছে! ঘর-সংসার করবে কখন! আর শুনি সিনেমা পাড়াতেও যাতায়াত করে?

শ্যামলী বলে —কাজ করতে হয় কমলা। এখানে তো এখন অনেক পণ্ডিত-লোকই যাতায়াত করেন। ভদ্রঘরের মেয়েরাও এখন ছবিতে নামছে।

কমলা বলে —কে জানে শ্যামলী। তাই বলছিলাম - সমীরবাবু বিয়ে-থা করেছে - বৌকে এখানেই আনা ভালো।

—হাসে শ্যামলী। কমলার দোষ নাই। সমাজের বহু মানুষই এমনি চিন্তা-ভাবনা করে। সমাজের রূপই বদলেছে, কমলা ঘরে বসে সেই খবর রাখে না।

শ্যামলী বলে —এখন তো ঘরের মেয়ে - বউরাও অফিসে চাকরি করছে ছেলেদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। পথে ঘাটে ট্রামে বাসে মেয়েদের ভিড় দেখেছো? এখন আগেকার সেই শুচিতা মেনে ঘরের কোণে বসে থাকলে আর চলবে না।

কমলাও সেটা দেখেছে। দেখেছে এ পাড়ার দত্ত বাড়ি - পাইন বাড়ির মেয়েদের। আগে তারা পথে বার হতো না। অন্তঃপুরেই বন্দী থাকতো, এখন তাদের বিরাট বাড়ি শরিকের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা হয়ে এর ভাগে দুখানা ঘর-ওর ভাগে দেড়খানা একটু বারান্দা পড়েছে।

তখন ছিল রান্নাশালা, রাঁধুনি বামুন ছিল যৌথ পরিবারে। এখন সে সব গেছে।

বারান্দার কোণে রান্না হয় তোলা উনুনে। ওই বাড়ির বৌ নন্দিনী, ধীরেন পাইনের মেয়েও কোন অফিসে কাজ করতে যায়।

কমলা বলে —তাই দেখছি শ্যামলী। এখন মনে হয় লেখাপড়াটা ভালো করে কেন শিখিনি - তাহলে দিনরাত ঘরে বন্দী না থেকে বের হতে পারতাম - কারো হাত তোলায় থাকতাম না।

শ্যামলী বলে —তবে তার জন্য তৈরি হতে হবে কমলাদি।

কমলা বলে, তা তোমাকে দেখেই বুঝছি শ্যামলী। কত পরিশ্রম করে পড়ছো। নিজের কথাটাও ভাবলে না।

—সেকি? নিজের জন্যই তো ভাবছি। শ্যামলী জবাব দেয়।

—ছাই। তাহলে সমীরবাবু কেন অন্য মেয়েকে বিয়ে করলো? কমলার কথায় চমকে ওঠে শ্যামলী। এই কথাটাকে সে বারবার ভুলতে চায়। তাদের দুজনের মধ্যে এমনি একটা কিছু সম্পর্ক ছিল এটা শ্যামলীও কোন দিন ভাবেনি।

সমীরও জীবনের লড়াই এ ব্যস্ত। চাকরি ছাড়াও লেখাটা তাকে নেশার মত পেয়ে বসেছে. সমীর তার নিজের জন্য কোনদিনই ভাবেনি। কিন্তু শ্যামলী হঠাৎ কঠিন সত্যটাকে আবিষ্কার করে চমকে উঠেছিল সেদিন। কিন্তু করার কিছুই ছিল না। সমীরও সেই বেদনাটাকে সহজভাবেই মেনে নিয়েছে। সংসারের জন্য, মায়ের জন্যই ওখানে বিয়েতে মত দিয়েছিল যেন বিয়েটা তার জীবনে গুরুত্বপূর্ণ কিছুই নয়, একটা সাধারণ ঘটনা মাত্র।

শ্যামলী কমলার কথাটা হেসেই উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে। বলে সে—তোমার যতসব উদ্ভট কথা বৌদি।

নীচে দরজা খোলার শব্দ ওঠে। আলোটাও জ্বলে ওঠে। কমলা জানলা দিয়ে দেখে বলে —সমীরদা ফিরেছে।

সমীর গিয়েছিল শ্যামবাজারে তার এক বন্ধুর ওখানে। শ্যামবাজারের খালধারেই বিজয়দের বাড়ি - ওখানেই তাদের বিরাট করাত কল। বিজয় নিজে কবিতা লেখে, কফি হাউসেই ওদের পরিচয়। বিজয়দের বাড়িতেও যায় সমীর। ওদের বিরাট কাঠের গোলা। সুন্দর বন অঞ্চলে ওদের কাঠ কাটাই করা হয়। সেই সব গরান - ধুন্দুল - কেওড়া কাঠ বড় বড় নৌকায় খালধরে করাতকলে আসে। সুন্দরবনে বাইন কাঠ থেকে চায়ের পেটি বানানো হয়, সেই কাঠ ও আসে প্রচুর। তারা বিভিন্ন চা কোম্পানিকে চায়ের পেটি সাপ্লাই করে।

সমীর বলে —কাঠ চেরাই করা ছেড়ে কাব্যচর্চা শুরু করলে বিজয়।

বিজয় বলে —ওসব দাদা করেন।

বিজয়ের দাদা অজয়কেও দেখেছে সমীর। ক্রমশ তার সান্নিধ্যে এসেছে। অজয়দা কাঠের ব্যবসা করে। কিন্তু ক্ল্যাসিক্যাল গানের ভক্ত। শহরের দামী সঙ্গীত সম্মেলনের পৃষ্ঠপোষক। ওর সঙ্গেই সমীরও গেছে বিভিন্ন সঙ্গীতের আসরে। শুনেছে পণ্ডিত ওঙ্কার নাথ ঠাকুর - বড়ে গোলাম আলি-ওস্তাদ আমীর খান - তারাপদ চক্রবর্তী মশায়ের গান, রবিশঙ্কর-আলি আকবর খাঁ সাহেবে বাজনা।

সমীরের মনে হয়, এ যেন এক অন্য জগৎ। অজয়দাই ওকে পরিচয় করিয়ে দেন

ওস্তাজ ভীমসেন যোশীর সঙ্গে। অজয়দের বাড়িতেও আসেন অনেকে। এ কাননের গানের আসরও বসে। সমীর সেখানে হাজির।

অজয়দা বলেন —বুঝলে সমীর, কবি সাহিত্যিক হতে হলেও ক্লাসিক্যাল গান শুনতে হবে। এক একটা সময়কে ধরে এক এক রাগ রাগিণী। খেয়াল শুনেছো তো - প্রথমে বিস্তার, তারপর রাগ-রাগিণীর স্বরূপ প্রকাশ, তারপর মধ্যলয় - সেখান থেকে দ্রুত - তারপর সুন্দর একটা ফর্মেশন তৈরি করে সমাপ্তি। সামগ্রিকভাবে একটা উপন্যাসের রূপই এমনি হে। সামগ্রিক পূর্ণতা আর ঠুংরি, একটি নিটোল সুন্দর ছোট গল্পের মতই একটি করুণ আর্তিতে তার সমাপ্তি।

সমীর বলে —কাঠের ব্যবসা করেও এসব ভাবেন?

অজয়দা বলেন —হয়তো কাঠের ব্যবসাতে মিস্ ফিট - চলে এসেছি। আসলে লাইন ছিল অন্য। বিজয়টাকে বলি - একটু ভাবনাচিন্তা কর, পড়াশোনা কর। তা নয়, কফি হাউসেই ওদের কবিতার জন্ম - শেষও ওইখানেই। কিছুই দেখল না।

সেদিন অজয়দা বলেন —সমী সুন্দরবনে যাবে? সেখানের জীবন সেখানের মানুষের জীবন সংগ্রাম বড় কঠিন হে। তোমার সাহিত্যে ওই সব কথা যদি বলতে পারো - দারুণ হবে। তবে জানোই তো সুন্দরবন নামটা সুন্দরই কিন্তু আসলে দারুণ বিপজ্জনক জায়গা। সেখানে ডাঙায় বাঘ আর জলে কুমীর কামট বাস করে - জল আর জল। সে জল প্রাণ নিতেই জানে প্রাণ দিতে জানে না। তেষ্টাও মেটায় না, নোনা বিষ।

অজয়দা বলেন —যাবে কি না ভেবে দ্যাখো, কলকাতার অনেককেই বলেছি। তারা মুখেই হাতি ঘোড়া মেরেছে, কিন্তু কেউই যায়নি ওই সব বিপদের কথা শুনে।

সমীর বলে —তাহলে আপনি কেন যান?

হাসেন অজয়দা —আমি? এই যে ঠাটবাট, এত লোকের অন্নসংস্থানের কথা - এসব ভেবেই যাই। তাছাড়া—

কি যেন ভাবছেন তিনি। শুধোয় সমীর,

—তাছাড়া?

—সুন্দরবনের একটা নিবিড় টান আছে হে, যে ওই বনে একবার গেছে সে আবার যাবে। বনকে ভালোবাসলে - বন তাকে টানে বারবার। ভেবে দ্যাখো যাবে কিনা। মাসখানেক কিন্তু সময় হাতে রাখবে। এসব সভ্য জগতের বাইরে। এখানের দিনক্ষণ ঘড়ি, ঘণ্টা-বার এককেব হিসাবে চলে না। জোয়ার ভাটা আর সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত এর হিসাবে আজও চলে।

সমীর যাবার মনস্থই করে। এই আদিম অরণ্য আর এই জীবনকে দেখতে যাবে সে। 'আরণ্যক' উপন্যাস পড়েছে বিভূতিভূষণের। এই প্রসঙ্গে উনি নাম করেছিলেন আর একটি উপন্যাসের, তার নাম 'হাডসন বে'। সেই আরণ্যের অরণ্যভূমি - হাডসন বে র আদিম অরণ্য আজ নাই। তবু সুন্দরবন এখনও আছে।

জগন্নাথ, মৃগেন আর বাসন্তীদেবী ওই বনে যাবার কথা শুনে বলে —আর যাবার জায়গা পেলি না? লোকে দিল্লী, গোয়া কন্যাকুমারী - কাশ্মীর যায় বেড়াতে তুই যাবি ওই বাঘ কুমীরের রাজ্যে?

ওদের কাছে বেড়ানোর সংজ্ঞাটা আলাদা। লিস্টি মিলিয়ে দর্শনীয় স্থানে যায়। এদিক ওদিক ঘুরেফিরে খেয়েদেয়ে আসে। বন- নদী - সেখানের মানুষকে দেখতে যেতে চায় সমীর জানতে চায় কিছু। তার সাহিত্যে আনতে চায়। সেই অচেনা মানুষদের কথা।

শ্যামলী শুনে বলে —সেকি! ওই সাংঘাতিক বনে গহীন গাং এ যাবে নৌকায় ভেসে। বিশ-পঁচিশ দিন সভ্যজগতের সঙ্গে কোন সম্পর্কে থাকবে না। না - না। তুমি যাবে না।

সমীর দেখছে শ্যামলীকে। ওই চোখে মুখে উৎকণ্ঠা ফুটে উঠেছে। সমীরও অবাক হয় শ্যামলীর এই উদ্বেগে। বলে সে,

—কী বলছ শ্যামলী! এমন সুযোগ ছেড়ে দোব? ওই জগৎ - ওই জীবনকে দেখতেই হবে। আমার লেখায় হয়তো অন্যরূপই আসবে। তাই যেতেই হবে।

শ্যামলী বলে - সাংঘাতিক বিপজ্জনক ঠাঁই, যদি কিছু হয়ে যায়? না, সমীর এখন তোমার দায়িত্ব বেড়েছে। সীমার কথা ভেবেই এখন সাবধান হতে হবে।

সমীর বলে —আমার জীবনে দুটো দিক আছে শ্যামলী, এক সাহিত্য - অন্যটা সংসার। সাহিত্যই সৃষ্টির কাজই আগে - তাই যেতেই হবে। তার জন্য অনেক কিছুকেই মেনে নিতে হবে। সীমাও জানে সেটা।

শ্যামলী চুপ করে চেয়ে থাকে। যেন হার মেনেছে সে। বলে,

—যাবেই! তাহলেও বলবো সাবধানে থেকো।

সমীর বলে —মাসখানেকের ব্যাপার। তুমি সীমাকে কিছু জানিয়ো না। বলেছি - একটু বেড়াতে যাচ্ছি বাইরে।

মস্ত বড় নদী থেকে একটা বেশ বড়সড় খাল বের হয়েছে। ওদিকে আর একটা খাল। খাল গুলোর গভীরতাও অতল, জোয়ারে ফেঁপেফুলে ওঠে - তখন ভয়ানক রূপই নেয়, আর ভাটার সময় ওদের গভীর কাদাভর্তি বুকের কিছুটা দেখা যায়। যেন কি আদিম বুভুক্ষায় হাঁ করে আছে। ওই জলে মানুষ কেন গরু-বাছুরও নামে না কুমীর - কামটের ভয়ে।

কামট থাকে ঝাঁক বেঁধে। ছোটবড় সাইজের মাছের মত। সূচ ধারালো করাতের মত দাঁত। মানুষজন জলে নামলে ওরা তাদের পায়ের মাংস কেটে নেয় - তখন টেরও পায় না। জল রক্তে লাল হয়ে যায়। তারপর দেখা যায় পায়ের মাংস আর নেই। মানুষ রক্তক্ষরণেই দূর বাদাবনে এইভাবে মারা যায়। ওদের ভয়ে মানুষ, গরু, বাছুরও কাছে আসে না জলের।

এছাড়া কুমীর তো আছেই, তারা তীর থেকে ল্যাজের ঝাপটায় মানুষ গরু বাছুরকে জলে ফেলে টেনে নিয়ে যায়। নদীর বিস্তারও তেমনি।

সমীর এসেছে অজয়দার সঙ্গে। লঞ্চে হাসনাবাদ থেকে এখানে কয়েকঘণ্টার পথ। সুন্দরবনের প্রবেশদ্বারই বলা যেতে পারে জায়গাটাকে। একটা দ্বীপের মত জায়গায় কিছু বসতি ওদিকে কিছু কৃষ্ণচূড়ার গাছ ঘেরা ফরেস্টের অফিস - বনকর্মীদের কাঠের বসত ঘর। তারপরই নদীর ভেড়ি - অন্যদিকে কিছু শস্যরিক্ত প্রান্তর। বাঁধের ধার ঘেঁসে কিছু মাটির ঝুপড়ি।

এদিক অজয়দার কাঠের ঘর - আর বেশ কিছু জায়গায় রয়েছে ছোট বড় মাঝারি সাইজের রকমারি ধরনের নৌকা ছড়ানো আর মাঝিদের থাকার ঘর, তাও কাঠকুটোর তৈরি। একটা বটগাছের ওদিকে চালায় বন দেবীর মূর্তি - পাশে দক্ষিণরায়। বাদাবনের ওরাই লৌকিক দেবদেবী। গহন গাং গহীন বনে অসহায় বাওয়ালি - কাঠুরিয়াদের ওরাই রক্ষাকর্তা। গুণীন এদের পুজো করে। শরৎ গুণীন এর চেহারাটা বেঁটে-খাটো একটা মুগুরের মত শক্তপোক্ত। মাথায় অবিন্যস্ত ঝাকড়া চুল - চোখ দুটো যেন জ্বলছে। বিড় বিড় করে মন্তর পড়ে মাথা নেড়ে জয়ধ্বনি দেয় - জয় মা বনবিবি - বাবা দখিন রায়ের জয়।

অজয়দা বনের গভীরে বনবিভাগের পারমিট নিয়ে সেইমত গাছ কাটিয়ে দুহাজার মণ কাঠ ধরে তেমনি ঢাউস নৌকায় কাঠ বোঝাই করে কলকাতার করাতকলে আনান। বাইন কাঠই বেশি। কারণ ওতেই চায়ের বাক্স তৈরি হয়।

এবার কাঠ কাটাই এর পারমিট মিলেছে। সুন্দরবনের প্রান্তে - বঙ্গোপসাগরের ধারে কোদা আইল্যান্ডে। মূল ভূমি থেকে সমুদ্রের মধ্যে প্রায় ছ'মাইল দূরে ওই শেষ দ্বীপ-

সেখানে কাঠ কাটাই করছে তাঁর লোকজন। প্রায় শ-দুয়েক লোক আছে তার দলেরই কাঠুরিয়া - মাঝি সর্দার সব মিলিয়ে। তাদের চাল ডাল - আনাজপত্র - বিড়ি তামাক দেশলাই মায় খাবার জল অবধি বড় বড় জালায় এখানে থেকে নিতে হয়।

এইসব রসদপত্র দুটো বড় নৌকায় বোঝাই করে এবার সমীরদের যাত্রা শুরু হল রাতের ভাটার টানে। তারা নেমে চলেছে সমুদ্রের দিকে, তাই ভাটার টানেই যেতে হবে। আবার ছ'ঘণ্টা পর যখন জোয়ার আসবে তখন ধারে নোঙর করে থাকতে হবে। রান্না বাড়া করা হয় তখনি। জোয়ারে ওসব পাট চুকিয়ে আবার ভেসে চলে ভাটার টানে। সমীর নৌকার পাটাতনে বসে আছে। নৌকাটা একটু বড়ই। একটা ছই এর ঘরও আছে। রাতে সেইখানে শোয়, দিনে বাইরেই থাকে। পিছনে আরও বড় দুখানা নৌকা রসদপত্র, জল নিয়ে আসছে বনের লোকদের জন্য।

সমীর দেখে ক্রমশ শেষ জনবসতি পিছনে ফেলে এবার তারা আদিম অরণ্যেই ঢুকেছে। নদীর বিস্তারও বেড়েছে, শীতের সময়, গাং এখন শান্ত, নদীর জলে ঝরে পড়া কেওড়া-গরান-বাইন আর কতরকম পাপড়ির মেলা।

সবুজ বনভূমি কে যেন মাপ জোপ করে সাজিয়ে পুঁতেছে - সবুজ হলুদ বনে সোনার বরন রোদের খেলা। অপরূপ এক জগৎ। কিন্তু সমীরের কাছে এই রূপ উপভোগ করার মত মন আর নেই। কাল থেকেই সে কি যেন আতঙ্কের জগতে হারিয়ে গেছে। প্রাকৃতিক কাজ করার জন্য টয়লেট বলতে নৌকার গায়ে কাঠের তেকাঠা লাগানো নীচে একটা কাঠ দিয়ে আটকানো - ওই ধরে অকূল গাংএ ঝুলে পড়তে হবে। হাত পা ফসকালেই পড়বে অকূল গাংএ। কামটের দল সেখানে ঘুরছে খাবারের সন্ধানে নৌকার পিছনে তাদের খাবারেই পরিণত হতে হবে।

দূরে বনভূমিতে হঠাৎ শোনা যায় চাপা গর্জন। সেই গর্জন যেন নদীর বিস্তারে ধ্বনি প্রতিধ্বনি তোলে। মাঝি বলে —ভয় নাই বাবু, গাং সাঁতারে আসবে না দিন বেলাবেলি।

অর্থাৎ দিনে না এলেও ওনাদের আসার সম্ভাবনা রাতে যে নেই সেটা বলা যায় না।

সমীরের সারা মনে জমাট আতঙ্কের ছায়া। শ্যামলীর কথা মনে পড়ে। বারবার নিষেধ

করেছিল সে, মনে পড়ে তাদের গ্রামের শালবনের কথা। এ অরণ্য তার চেয়ে শত গুণ ঘন, জমাট আর শ্বাপদসঙ্কুল। মা-ভাইদের কথা - সীমার কথা মনে পড়ে। এই মৃত্যুর জগত থেকে আর কি কোনদিন সেখানে ফিরতে পারবে সমীর?

সঙ্গে কিছু বই এনেছিল। নৌকায় থাকতে হবে - পড়াশোনাও হবে, সময়ও কেটে যাবে। কিন্তু পড়তেও পারে না। দুপুরে হামিদ রান্না করেছে ভাত। নদীতে জাল দিয়ে ধরা পারশে মাছের ঝাল, খেতেও রুচি হয় না। মুখে তার আতঙ্কের ছাপ ফুটে ওঠে। অজয়দা বলেন —তোমাকে এনে দেখছি বিপদে পড়লাম। এত ভয় করে কী হবে?

সমীর জবাব দেয় না।

ওদের নৌকা ভেসে চলেছে। এখন দুদিকেই ঘনবন। এসব বন বাঘের আস্তানাই নয়, জলদস্যুদেরও আস্তানা। যে কোন সময় তারা ছিপ নিয়ে বন্দুক হাতে এসে পড়তে পারে - সর্বস্ব লুট করে যাত্রীদের নিঃস্ব করে ফেলে রেখে যাবে এই গহন বনে।

মাঝিরাও সাবধানে নজর রেখে চলেছে। এদিকে ভাটার টান শেষ হয়ে আসছে। এবার শুরু হবে জোয়ার।

আর যাওয়া যাবে না। বিকাল নামছে, নদীর ধারে সবুজ ঘাসে ঢাকা চরভূমি - ওই ঘাস হরিণের প্রিয় খাদ্য।

ওই চরভূমির পরই ঘন বন। বৈকালের সোনারোদ ক্রমশ বেগুনী রং হয়ে নদীর বুকে ছড়িয়ে পড়ে। সন্ধ্যা নামে-নামে রাত্রি।

ওই অচেনা রহস্যময় গহন অরণ্যের ধারে ওদের নৌকাগুলো নোঙর করে রইল। সন্ধ্যার মুখেই রান্না শেষ, খাওয়াও। তারপরই ওই অতল অন্ধকারে কুপি নিভিয়ে দেয়। কোন আলো দেখলে জলদস্যুর দল হানা দিতে পারে। তাই অতল অন্ধকারেই মিশে গেল তারাও।

সমীরের ঘুম আসে না।

রাতের খাবারও খেতে পারেনি, আতঙ্ক যেন তাকে গ্রাস করেছে। স্তব্ধ রাতের অন্ধকারে হঠাৎ হরিণের কর্কশ ডাক শোনা যায়। বনের মধ্যে ঝটপট শব্দ - তারপরই একটা চাপা হুঙ্কার ওঠে। নৌকার থালাবাসনও যেন ঝনঝনিয়ে ওঠে। সর্দার মাঝি হাঁক পাড়ে - হুঁশিয়ার।

চমকে ওঠে সমীর। অজয়দাও জেগে উঠেছেন। আবার স্তব্ধতা নামে। অজয়দা বলেন —বাঘে শিকার ধরেছে বোধহয়। শুয়ে পড়ো।

আবার স্তব্ধতা নামে বনরাজ্যে। ঝিঁঝিগুলো ওড়াউড়ি করছে—এরা এসব ব্যাপারকে সহজ ভাবেই নেয়। সমীর পারে না। কি জমাট আতঙ্কে যেন দমবন্ধ হয়ে আসে তার।

নৌকার পাটাতনে এসে বসে, রাত কত জানে না।

কুয়াশা নামছে। কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে থাকে সে এই স্তব্ধতার মাঝে।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল জানে না। হঠাৎ ঘুম ভাঙে পাখিদের কলরবে। ঠাণ্ডার মাঝেই কম্বল মুড়ি দিয়ে সে নৌকার পাটাতনে পালের কাপড়গুলোর উপর শুয়ে পড়েছিল জানে না। কম্বলের ফাঁক দিয়ে চেয়ে দেখে পুব আকাশে তখন রং এর হোলি খেলা শুরু হয়েছে, ঝিনুক রং থেকে আলোর তুফান - সবুজ হলুদ বনরাজ্য - সেই তৃণভূমিও রঞ্জিত, দু'চারটে হরিণ নিশ্চিন্ত মনে চরছে। পাখিদের কাকলিতে কি সুর ওঠে।

সমীর যেন এক রূপ জগতে হারিয়ে গেছে। শান্ত সুন্দর প্রকৃতির এই রূপকে আজ জীবনের পরম লগনে যেন প্রত্যক্ষ করে - কি এক পরম তৃপ্তিতে ভরে ওঠে সারা মন।

সবাই তখন ঘুমুচ্ছে। জেগে উঠেছে সমীর।

মুগ্ধ বিস্ময়ে সে চেয়ে দেখছে ওই সুন্দরের জগতকে। মন থেকে সব আতঙ্ক মুছে গেছে। সমীরের মনে হয় জীবনের শেষ চরম পরিণতি তো মৃত্যু। তার ভয়ে মনকে আগলবদ্ধ করে এই রূপ জগৎ থেকে সে নিজেকে নির্বাসিত করেছিল। প্রকৃতি আজ তার অসীম দাক্ষিণ্যে যেন সেই অধরা রূপকে তার সামনে উদ্ভাসিত করেছে - এই আনন্দ অনুভূতির তুলনায় মৃত্যু যেন তুচ্ছ। মরণকেও যেন আজ তুচ্ছ করে দেখতে পেরেছে এই রূপজগতে এসে। এই অনুভূতি আজ চমকিত করে সমীরকে।

উঠে বসে সে। সেই আগেকার ভীত আতঙ্কিত সমীর আজ কি এক পরম সম্পদের সন্ধান পেয়েছে। বেশ ক'দিন পর আজ সে গুনগুনিয়ে ওঠে—

আলোকে মোর চক্ষু দুটি মুগ্ধ হয়ে উঠল ফুটি
হৃদগগনে পবন হোল সৌরভেতে মন্থর''
সুন্দর হে সুন্দর''
এই লভিনু সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর।

অজয়দা বের হয়ে আসেন ছই থেকে। দেখছেন তিনি নতুন এক সমীরকে সেই আতঙ্কের ছাপ আর নেই ওর মুখে চোখে। সে যেন এক নতুন সত্তা।

আবার যাত্রা শুরু হয় তাদের, এবার গোসাবা নদী ধরে ওরা বিকাল নাগাদ পৌছতে পারবে সমুদ্রের মোহনায়। সেখানে জোয়ার শেষ হবে, আবার প্রতীক্ষা - শেষ রাতের ভাটায় তারা ভেসে যাবে সেই কেদো দ্বীপের উদ্দেশে।

সমীর এখন এই জীবনের সঙ্গে মিশে গেছে। হামিদের সঙ্গে গল্প শুরু করে। সর্দার মাঝি শোনায়। নৌকায় শুয়ে আছে, বাঘ এসে পাশের লোকটাকে নিয়ে চলে গেল। নৌকা নড়তে ওদের খেয়াল হয়। দেখে পাশে ছিল গোলার সেইই নাই।

পরদিন সকালে তারা পৌছল সমুদ্রের মধ্যে সেই দ্বীপে ছোট দ্বীপ গহন অরণ্যে ঢাকা - একটা খাল দ্বীপটাকে ফুড়ে অন্যদিকের সমুদ্রে পড়েছে। সেই খালেই ঢুকলো তারা।

কিছুটা গিয়ে দেখা যায় বেশ কিছু নৌকার সমাবেশ, বিভিন্ন কাঠ মহাজনদের ছোট বড় নৌকা রয়েছে। রয়েছে বনবিভাগের বোট। ওই নৌকায় বসতেই অজয়দার নৌকাও ঢুকল। সমীরদের নৌকা হাজির হল সেখানে। চারদিন, চার রাত ধরে দীর্ঘ বন নদী পাড়ি দিয়ে।

একটা বড় নৌকায় উনান করা, সেখানে ভোর থেকে রান্না শুরু হয়। কাঠুরিয়া - মাঝিদের দলও সকালেই ছোট নৌকায় স্নান সেরে কাপড় বদলে এবার সানকিতে ভাত আর একটা ঝোলমত তরকারি নিয়ে বসে, লঙ্কার দৌলতে তার বর্ণও লাল। নোনা পরিবেশে নাকি ঝাল খেতেই হয়।

সকালে খাওয়া সেরে এবার মাটির মালসায় দুপুরের খাবার, জল আর তামাক নিয়ে ছোট ছোট ডিঙিতে ছ' সাতজনের এক একটা দল বনের মধ্যে গাছ কাটতে বের হয়।

গভীর ঘন অরণ্য। মাঝে মাঝে সরু খাল ওই বনের বুক চিরে গেছে। ওরা খালের ধারের ঘন জঙ্গল ফিট চারেক করে সাফ করে বনে ঢোকে। মাটিতে নাসিক্যমূলগুলো ধারালো ফলার মত জেগে আছে। পলি কাদায় ভরা বনভূমি। ওরা মা বনবিবির নাম নিয়ে বনে ঢোকে। গাছগুলোকে কেটে সাইজ করে খালের ধারে গাদা করে রাখে। পরে নৌকায় করে তুলে এনে নৌকা বসতের কাছে গাদা করে বড় নৌকায় তুলে চালান দেবে।

সূর্য অস্ত যাবার আগেই ওরা নৌকা বসতে ফিরে আসে। সন্ধ্যা নামে। বনভূমি রহস্যময়ী হয়ে ওঠে। নৌকায় পিদিম জ্বেলে তখন একজন কাহিনী বলতে বসে - এক ছ্যাল রাজকন্যে আর এক ছ্যালো রাজপুত্তর আর পক্ষীরাজ ঘোড়া - তেপান্তরের মাঠ পার হই চলছে রাজপুত্তর-

আদিম আরণ্যক পরিবেশে গুহামানবরাও বোধ হয় এই জীবনে অভ্যস্ত ছিল। কোন নৌকায় কে সুর করে পড়ছে - সোজাভানের কাহিনী।

সমীর স্তব্ধ হয়ে নৌকায় বসে থাকে। দিনরাত কোন দিকে কেটে যায়, এদের সঙ্গে। খালটা গিয়ে পড়েছে সমুদ্রে। সেখানে বালিচর - তারপর সমুদ্র। সমীর বাওয়ালিদের সঙ্গে সেই বালুচরে যায় - দেখে সারসগুলোকে। তারাও মানুষদের যেন তাদের মতই কোন জীব ভেবে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে।

এখানে পয়সা - টাকার কোন দামই নাই। মাঝে মাঝে মাছমারার নৌকা নিয়ে জেলেদের কেউ এসে পড়ে। চাল-খাবার জল - নুন - বিড়ি নাই তাদের।

এখান থেকে জিনিসপত্র দিল - ওরাও দিয়ে গেল দশ-বারোটা সদ্যধরা ইলিশ মাছ। বিনিময় প্রথাই চলে এখানে। পয়সার কোন ভূমিকা এখানে নেই। দিন রাত জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে বাস করে এরা ধর্ম - ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে। পদে পদে অনুভব করে জীবনের কোন স্থায়িত্বই নাই। তাই এরা মানবিকতাকে ভোলেনি। ওই মূল্যবোধ আর জীবনকে তুচ্ছ করার সাহস নিয়েই এরা বাঁচার লড়াই চালিয়ে যায়।

দিনরাতের হিসাবে ওই সূর্যওঠা নিয়ে সমীরও ভুলে গেছে যেন সভ্য জীবনের কথা। এদের জীবনের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে নিয়েছে।

এদের কাঠে নৌকাগুলো বোঝাই হয়ে গেছে। এবার ফিরতে হবে। সেবার নেমেছিল ভাটার টানে আর ফিরে আসছে জোয়ারের হিসাবে। পিছনে পড়ে থাকছে সেই রূপ জগৎ।

প্রায় পঁচিশ দিন পর ফিরেছে সমীর কলকাতায়। শ্যামলী সেদিন এসেছিল বাসন্তীদেবীর ওখানে সমীরের খবর নিতে। বাসন্তীদেবী বলেন —চিঠিপত্তর তো পাইনি ওর।

শ্যামলী বলে —গেছে তো একেবারে সভ্যজগতের বাইরে কোন গহন বনে। বলেছিল এর মধ্যে ফিরবে।

বাসন্তীই বলে —এবার ওকে বৌমাকে আনতে বলো। পিছনের দিকের দুটো ঘর বাথরুম রান্নাঘর রয়েছে। ওখানেই থাকবে। বৌমা না থাকলে ও এমনি যাযাবরের মতোই ঘুরবে।

এমন সময় এসে হাজির হয় সমীর।

শ্যামলী দেখছে ওকে। বাসন্তীদেবী চমকে ওঠেন—কি দশা করেছ সমীর? গায়ের বর্ণ কালি হয়ে গেছে। মাথার চুল গুলোয় খড়ি ,পড়ছে - একগাল দাড়ি।

শ্যামলী বলে —সন্ন্যাসী হবেন এইবার। তা এবার কি হিমালয়ের দিকেই যাবে নাকি সমীরদা?

সমীর বলে —বাদাবনে সভ্য সেজে থাকার কোন দরকারই ছিল না। দাড়ি ত কামাই নি। নোনা জলে স্নান করাও হতো - ভালোই ছিলাম।

—তা দেখছি। যাক্ - বাড়িতে চিঠি দিও এবার। এখন ভদ্রলোক হও। কাল কথা হবে।

শ্যামলী চলে যায়। বাসন্তীদেবী বলে,

—এসব বদখেয়াল ভালো নয় বাবা। সংসার ধম্ম করেছো। এসব কি ঠিক।

এই হাল দেখে বৃদ্ধা বেশ ক্ষুব্ধই হয়েছে। মা দেখলে মাও ক্ষুব্ধ হতো।

সমীর সভ্যজগতে এসে সুন্দরবনের সেই বিচিত্র অনুভূতিটাকেও হারিয়ে ফেলে আবার এখানের অন্য এক জীবনযাত্রার মিছিলে শামিল হয়েছে।

সুরেশবাবুর ছবির শুটিং শুরু হবে। ক'মাস ধরে সুরেশবাবু চিত্রনাট্য নিয়ে কাজ করেছেন। সমীরও ক্রমশ ওই খামখেয়ালি একটি মহৎ শিল্পীকে ভালোবেসে ফেলেছে। বাইরে থেকে এমনিতে গম্ভীর প্রকৃতির। কথা কম বলেন, লোকে বলে দাম্ভিক। তথাকথিত কিছু দাড়িরাখা কাঁধে ব্যাগ ঝোলানো একটা আতেল সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে সমাজে ইদানীং। এরা সব কিছুই বোঝেন। কফি হাউসেই এদের প্রধান ঠেক অবশ্য এখন বইপাড়ায়, টালিগঞ্জের সিনেমা পাড়াতেও এদের যাতায়ত গড়ে উঠেছে, এরা সাহিত্য সিনেমা সব বিষয়েই সম্যক পারদর্শী সেটা প্রমাণ করার জন্য উল্টোপাল্টা মন্তব্য করে, কাগজে একে তাকে ধরে প্রবন্ধও ছাপায়, তাদের সেই বিভ্রান্ত রুচির সপক্ষে। সুরেশবাবু তাদের দুচক্ষে দেখতে পারেন না। বলেন,

—কিছু করে দেখাবার চেষ্টা নাই, সাহস নেই, সামর্থ্য নেই শুধুই বুকনি সার।

সুরেশবাবুকে তাই সমীরের ভালোলাগে। দরাজ দিল খোলা মনের মানুষ। তার বসার ঘরে এসে হাজির হন অনেক বড় সঙ্গীত শিল্পীরা। নামীদামী অধ্যাপক - বিদগ্ধ বহু মানুষ। সন্ধ্যার পর পাঠের আসর বসে। কোনদিন অবনীন্দ্রনাথের রাজকাহিনী থেকে পড়েন সুরেশ বাবু। পাহাড় ঘেরা রাজস্থানের সেই ঐতিহাসিক চরিত্রগুলো যেন প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। কোনদিন পড়া হতো বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক'। সুরেশবাবুর পড়ার মধ্যেই যেন সেই লবটুলিয়া - নাড়া বইগার অরণ্যভূমি, সেই সব বিচিত্র চরিত্র যেন প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। সুরেশবাবু বলেন,

—যদি কোনদিন সুযোগ পাই 'আরণ্যক' নিয়ে ছবি করবো। পথের পাঁচালীর পর এটাও একটা স্মরণীয় ছবি হবে।

ওই আড্ডায় সমীরও জমে যেতো। কোনদিকে সময় কেটে যেতো জানে না। তার সৃজনশীল মন ওই মানুষটির সান্নিধ্যে এসে অনেক কিছুই পেয়েছে তাঁর ভাঁড়ার থেকে যা সমীরের লেখাকেও সমৃদ্ধ করেছে নানাভাবে সৃষ্টির কাজে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে।

সমীর অফিসে যায় তখন অন্য মানুষ, সেখানে ও মন দিয়েই কাজ করে, সে যে লেখক - একজন পরিচিত সাহিত্যিক সেই পরিচয়টা সেখানে ভুলে যায়। সহজেই মেশে

সকলের সঙ্গে।

আবার অফিসের বাইরে সেই জগৎকে ভুলে নিজের লেখার জগতে হারিয়ে যায়। তার উপন্যাস এখন নামী দামী প্রকাশকদের ওখান থেকে বের হচ্ছে।

শ্যামলী পোস্ট গ্রাজুয়েশন করেছে। এম - এতে ফার্স্টক্লাশই পেয়েছে। সেদিন সমীর ওকে কোন নামী রেস্তরাঁয় নিয়ে যায়। শ্যামলী বলে

—কী ব্যাপার?

সমীর বলে —আজ তোমার অনারে এখানেই এলাম।

— খুশি হয়েছো তুমি?

শ্যামলীর প্রশ্নে সমীর বলে —নিশ্চয়ই। এটা তো আমি পারিনি। তুমি পেরেছো।

শ্যামলী বলে —এখন বইপত্র থেকে, সিনেমা থেকেও বেশ আমদানী হচ্ছে বলো?

সমীর বলে —বুঝলে সরষের খেত দূর থেকে দেখতেই ঘন মনে হয়। কাছে যাও, দেখবে ফাঁকা ফাঁকা। আমাদের দেশে লিখে সংসার চালানো খুবই কঠিন। কোন নামী সাহিত্যিকদের ক'জন লেখার ওপর ভরসা করে বেঁচে আছেন বলো তো? তাদের অন্যকিছু করতেই হয়। তাই চাকরিটা বজায় রেখেই চলেছি। তারপর লিখে যা আসে।

শ্যামলী কী ভাবছে।

রাত নেমেছে। ওরা ফিরছে দুজন। সমীর বলে

—এরপর কী করবে শ্যামলী?

শ্যামলী বলে—বাঁকুড়া কলেজে একটা প্রফেসরি পাচ্ছি।

—চলে যাবে এখান থেকে? সমীরের মন যেন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। ওর কণ্ঠস্বরের আর্তিটা শ্যামলীর কাছে ধরা পড়ে যায়। সমীরের মন আজ কোন সঙ্কোচ করতেও চায় না। শ্যামলী কি ভাবছে। সমীরের ওই ব্যাকুলতা তার মনকেও ছুঁয়েছে।

শ্যামলী হোস্টেলে ফেরে। আজ মনে হয় তার মনও এখান থেকে ওই প্রফেসারি নিয়ে চলে যেতে চায় না। তাকে আরও বড় হতে হবে। সমীর এগিয়ে চলেছে তার পথে। শ্যামলীও থামবে না। সেও আরও কিছু করবে। সমীরের পাশাপাশিই চলবে সে - যেন রেলের দুটো লাইন, দূর দিগন্তের দিকে এগিয়ে চলেছে এক সঙ্গে পাশাপাশি, কিন্তু তাদের মিলন কখনও ঘটে না - দুজনের অস্তিত্বই সেখানে প্রকট - তবু তারা দূরেও সরে যায় না, এগিয়ে চলে সমান্তরালভাবেই।

শ্যামলীও তেমনি এগিয়ে যাবে। তাই কলকাতাতেই থাকতে হবে তাকে। মফঃস্বল শহরের জীবনের বেড়াজালে সে নিজেকে বন্দী করে রাখতে পারবে না।

সমীরকে সেদিন সুরেশবাবু বলেন,

—কালই আউটডোর যাচ্ছি। শিলং—আপনাকেও যেতে হবে অথর।

সামনেই পুজো। সমীর প্রতিবার পুজোর ছুটিতে বাড়ি যায়। মা তার পথ চেয়ে আছে। সীমাও লিখেছে এবার পুজোয় পর বাবার ওখানে যাবে তাকে নিয়ে। সমীরও সেইমত চিঠি দিয়েছে।

কিন্তু সুরেশবাবু বলেন —না গেলে ছবিটাই হবে না। প্রযোজক অন্যরাও গড়বড় করছে। আর পুজোর মধ্যেই বাড়ি যেতে পারবেন। আপনাকে সাত আটদিন বড়জোর

থাকতে হতে পারে। চলুন।

তখন শিলং অবধি প্লেন যেতো না। গৌহাটি অবধি যেতো ছোট ডাকোটা প্লেনগুলো। ওগুলো তখনও খুব উন্নতমানের নয়। খুব উঁচুতে উঠতে পারে না - এখনকার বোয়িং এর মত। বোয়িং তিরিশ হাজার ফিট উপর দিয়ে যেতে পারে ফলে নীচেকার খারাপ আবহাওয়াতেও তাকে কাবু বিশেষ করতে পারে না। কিন্তু ডাকোটা সাধারণ আট-দশ হাজার ফিটের মধ্যেই যাতায়াত করে, আর খারাপ আবহাওয়ার দাপট তাই বেশিই টানে তাকে। আর ঠিকমত এয়ার প্রেসার প্লেনের ভিতর থাকে না, তাই কানের পর্দাতেও লাগে।

গৌহাটি থেকে সুরেশবাবুর দলবল বাসে শিলং পৌঁছলো এক সন্ধ্যায়। টেকনিসিয়ানদের দল ট্রেনে আগেই পৌঁছে গেছে। সেদিন সন্ধ্যাতেই হোস্টেলের ঘরে সব টেকনিশিয়ান - অভিনেতা অভিনেত্রীরা হাজির। চিত্রনাট্য পড়া হবে। প্রযোজকও গেছেন, তার চামচেও গেছে।

সুরেশবাবু চিত্রনাট্য পড়লেন। সমীর মুগ্ধ হয়ে শোনে চিত্রনাট্য। ছিন্নমূল পরিবারের একটি মেয়ের সংসারের জন্য - তার আপনজনকে বাঁচাবার জন্য এক সংগ্রামের কাহিনী। মেয়েটি সংসারকে বাঁচিয়ে গেল - কিন্তু নিজে সে শেষ হয়ে গেল, সংসার তাকে কিছুই দেয়নি। নিয়েছেই সব।

চিত্রনাট্য পড়ার পর এবার গুঞ্জন উঠলো। প্রযোজক এবং তার সঙ্গী দু'একজন - এমনকি কলাকুশলীদের অনেকেই বলে,

—ওই মেয়েটিকে বাঁচাতেই হবে। ট্রাজেডি নয় কমেডিতে শেষ করতে হবে এই ছবি, না হলে দর্শকরা এ ছবি কিছুতেই নেবে না।

সমীর তো অবাক। এই তো বাস্তব সত্য - উপন্যাসে তাই ই লিখেছে সে। দেখিয়েছে সেই মেয়েটি মারা যায় কিন্তু তার মতো অনেক মেয়ে সব জেনেও সংসারকে বাঁচাবার জন্য আজও লড়াই করছে, তাদের সংগ্রাম থামে না।

এই গল্পের মিলনাত্মক পরিণতি হলে কাহিনীর মূল্যই থাকবে না। কিন্তু সিনেমা নাকি লাখ লাখ টাকার ব্যাপার। প্রযোজক চাইবেন যাতে তাঁর টাকা ফিরে আসে, শিল্প সাহিত্য নয়—টাকাটাই এখানে বড়।

অবশ্য এদের মধ্যে কয়েকজন বসেন যা শেষ রয়েছে সেইটাই বাবুক।

অন্যরা তাতে রাজি নয়, শেষকালে কথা হলো ভোট হোক, হাততুলে যথারীতি ভোট ত হলো' সুরেশবাবু নিরপেক্ষ রইলেন, ভোটে এই নিনসনাত্মক শেষের সই নিতালা' সমীর নীরব,

রাতে ঘরে এসেছে সমীর, এসব যে হবে তা সে জানতো না, কিন্তু সুরেশবাবু সে খবর টের পেয়েই সমীরকে ধরে এনেছেন, রাতে সুরেশবাবু সমীরের ঘরে আসনে, সমীর বলে এর পর কি হবে?

সুরেশবাবু বলেন —এটা বুঝেছিলাম তাই আপনাকে এনেছি। যে শেষ আছে সেটাও সুটিং করবো, আর এই ক'দিনে আপনি কাহিনীর মিলনাত্মক একটা শেষ ভাবুন মেয়েটিকে বাঁচিয়ে তুলে একটা জীবনের ইঙ্গিতের কথা ভেবেই লিখুন। আমি সেটাও স্যুট করবো।

তারপর দুটো ভাবেই এই ফিল্ম এডিট করে দেখালে তখনই এরা বুঝবে যা শেষ আছে সেইটাই এই কাহিনীর নায্য পরিণতি। তখনই মানবে এরা - এখন প্রতিবাদ করলে স্যুটিং বন্ধ করে দেবে। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি - কাহিনীর যে পরিণতি আছে তাই থাকবে। সেটাই আমি রাখবো। তবে এখন এটা করতে হবে।

ওরা পরদিন থেকেই পাহাড় বনে স্যুটিং করতে শুরু করে আর সমীর হোটেলের ঘরে বসে তখন কাহিনীর অন্য পরিণতির কথা ভেবে লিখে চলেছে। তিন-চার দিন পরিশ্রমের পর একটা বেশ জমজমাট মিলনের ব্যাপার ঘটানো হলো। প্রযোজক তস্য দলবল সব শুনে বলে —ঠিক এ্যাইসা হোনা চাহিয়ে। দেখিয়ে সুরেশজী ক্যায়সা জম গিয়া স্টোরি।

সুরেশবাবু আড়লে সমীরকে বলেন,

—এইসব মালদের নিয়ে ছবি করতে হয়, দেখছেন তো? এরা টাকার জোরে বাঙালি সংস্কৃতিকে কিনতে চায়।

এদিকে কয়েকটা দিন স্টোরি জমাতে কেটে গেছে। সব লিখে কাজ শেষ করতেও সময় লাগে। শিলং এ বাঙালিদের পুজো শুরু হয়।

সমীর ছটফট করে, এই পাহাড় - পাইন বন ঘেরা জগত থেকে তার মন টানে সেই লালমাটি শালবনের দিকে তার গ্রামে পুজোর সময়। সীমা - মা তার পথ চেয়ে আছে।

শ্যামলীও বাড়ি গেছে। বাঁধের নীচে দিগন্তপ্রসারী সবুজ ধানখেতে এসেছে ধানের মঞ্জরী। বাতাসে ধান ফুলের সুবাস, সবুজের বুকে আলের মাথায় কাশবনে এসেছে সাদা ফুলগুলো - পেঁজা তুলোর মত মেঘ জাগে নীল বিস্তীর্ণ আকাশ প্রাঙ্গণে। প্রতিবার মা তার পথ চেয়ে থাকে এমনি দিনে। আজ সমীর দূরে।

সমীর কোনরকমে কাজ শেষ করে। প্লেনের টিকিট পায় নবমীর দিন। সুরেশবাবু বলেন —সকাল এগারোটায় গৌহাটির প্লেন - বৈকাল দুটোর মধ্যে দমদম পৌঁছে একটা টাক্সি নিয়ে সোজা হাওড়া পৌঁছে চার - সাড়ে চার টার ট্রেনে উঠলে সন্ধ্যার পরই বাড়ি পৌঁছবেন।

সমীরকে তাই করতে হবে।

ভোরেই শিলং থেকে বের হয়ে পড়ে সমীর। তখন শিলং থেকে গাড়ি একসঙ্গে সব নামে, মাঝ পথে উপরে যাবার গাড়িগুলো অপেক্ষা করে গেটে, উপরের সব গাড়ি নেমে গেলে তখন এরা উপরের দিকে চলে যায় - আর নীচের গাড়ি সব ছোটে গৌহাটির দিকে।

সমীরকে আজ সন্ধ্যা নাগাদ বাড়ি পৌঁছতে হবে। তবু নবমীর সন্ধ্যাতে পৌঁছলেও কিছু রক্ষা যাবে। গৌহাটি থেকে দূরে ওখানের এরোড্রাম। আকাশ মেঘে ঢাকা, বৃষ্টিও চলছে। চলছে দমকা হাওয়া।

এরোড্রামে এসে দেখে প্লেনটা রয়েছে। কিন্তু ঘোষণা করা হচ্ছে খারাপ আবহাওয়ার জন্য এগারোটাতে প্লেন ছাড়া হবে না। পরে সময় জানানো হবে। যাত্রীদের লাঞ্চ টিকিট নিতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

আর লাঞ্চ, সমীরের হিসাবে সব কেমন গোলমাল হয়ে যায়, তবু লাঞ্চ খেতে গেল ক্যানটিনে আর চেয়ে থাকে আকাশের দিকে। ঘন কালো মেঘগুলো ক্রমশ সরে যাচ্ছে

বড়ঝাড় পাহাড়ের মাথা থেকে।

এবার ঘোষণা করা হয়—প্লেন একটা পাঁচে ছাড়বে, যাত্রীদের প্লেনে উঠতে অনুরোধ করা হচ্ছে। সমীর হিসাব করে বেলা চারটার আগে দমদম পৌঁছতে পারলে তবু কোলফিল্ড এক্সপ্রেস ধরতে পারবে। রাত আটটা নাগাদ গ্রামে পৌঁছবে যেভাবে হোক।

প্লেন ছাড়লো। কিছু রোদ উঠেছে তবু মেঘের আনাগোনা থামেনি। প্লেনটা আগরতলায় থেমে ওখান থেকে দমদম যাবে।

নীচে পাহাড় - গারো হিলস - উপরে দু' একঘর বসতি দেখা যায়। কোন নদী চলেছে এঁকেবেঁকে। কিন্তু ক্রমশ আবার মেঘ নামে, পাইলট জানায়, খারাপ আবহাওয়ার জন্য প্লেন আগরতলায় নামবে না, আমরা সোজা দমদম চলেছি।

বেলা তখন দুটো বাজছে। এখানে না নেমে চলেছে দমদমের দিকে। সাড়ে তিনটার আগেই দমদমে নেমে পড়তে পারবে।

প্লেন এসেগেছে, নীচে গাছ দেখা যায়। রেল লাইনও। ওরা দমদমের কাছাকাছি এসেছে - হঠাৎ সাদা ধোঁয়ার মত জমাট মেঘে সব ঢেকে যায়। নীচের আর কিছুই চোখে পড়ে না। সিগন্যাল জ্বলে ওঠে

—সিট বেল্ট বেঁধে নাও।

তারপরই শুরু হলো প্লেনের নাচন। কে যেন শূন্যে প্লেনটাকে নিয়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে। প্লেনটা একবার ওই মেঘের বেড়াজাল ছিঁড়ে উপরে উঠতে চায় - পরক্ষণেই নীচের দিকে পড়ছে. পড়তে পড়তে কোন রকমে সামলে নিতেই আবার এক থাপ্পড়। প্লেনটা বার কতক উপর নীচে ওঠা নামা করে - একাত ওকাত হয়। উপরের র‍্যাক থেকে দু' একটা ব্যাগ ছিটকে পড়ে নীচে - কারও ঘাড়েই পড়েছে কার ব্যাগ।

সমীর স্তব্ধ। বেশ বুঝেছে একটা চরম বিপর্যয়ই ঘটতে চলেছে। কিন্তু দেখা যায় প্লেনটা এবার সোজা অ্যাবাউট টার্ন করে ওই মেঘের জাল কেটে পালাচ্ছে ভীত সন্ত্রস্ত প্রাণীর মত।

প্লেনের যাত্রীরা স্তব্ধ - হতবাক। একজন কো পাইলট এসে বলে,

—আমরা খারাপ আবহাওয়ার জন্য দমদম ল্যান্ড করতে পারলাম না, বাগডোগরা যাচ্ছি।

অর্থাৎ আজ আর দমদম নামাই হল না, তারা চলেছে শিলিগুড়ির দিকে। সেখানের বাগডোগরা এয়ারপোর্টেই নামবে।

সমীর বলে —আগরতলা, দমদমে তো নামতে পারলাম না। বাগডোগরাতেও যদি না নামতে পারি?

কো পাইলট বলেন —আমাদের পাটনা পর্যন্ত যাবার তেল আছে - ভয় নেই।

সন্ধ্যার পর গিয়ে প্লেন নামল বাগডোগরা এয়ারপোর্টে। জঙ্গলের ধারে একফালি এয়ার স্ট্রিপ, একটা হলঘর নিয়ে বাগডোগরা এয়ারপোর্ট। ধারেপাশে কোন বসতি নাই। জঙ্গল আর বড় বড় টাইগার গ্রাসের বন। ওখানে এর মধ্যেই গোটা তিনেক প্লেন যাত্রী নিয়ে নেমেছে। সমীররা পৌঁছাল চার নম্বরে।

হলঘরটা তখন চারটে প্লেনের যাত্রীদের ভিড়ে ঠাসা। ঘোষণা করা হচ্ছে - কেউ বাইরে

বের হবেন না। বন্যজন্তুদেরও আনাগোনা আছে এখানে। ছোট চায়ের স্টলের মালও শেষ। লিকার চা চিনিছাড়া - এই মিলছে। দুপুরে গৌহাটিতে খেয়েছে তারপর আর কিছুই তেমন জোটেনি সকলের।

এয়ারলাইনস্ কর্তৃপক্ষ শিলিগুড়ি থেকে কোনমতে রাতের খাবার আনায় ডাল ভাত আর ধোকার তরকারি। এই দিয়েই ডিনার সেরে হলঘরে শুয়ে বসে কাটায় রাত ভোর সকালে।

সমীরও ভাবনায় পড়ে। তার পরেও একটা প্লেন এলো কোথা থেকে ঝড়ের তাড়া খেয়ে - তাকে এখানে নামতে দিল না। এখানের কনট্রোল তাকে নিগা এয়ারস্ট্রিপেই পাঠালো। সেটা আসানসোলের কাছে।

নবমীর নিশি পোহায় ওদের ওই বনের ধারের এয়ারপোর্টে। ভোর হচ্ছে। হিমালয় পাহাড়ের রেখা ফুটে ওঠে চোখের সামনে। আকাশ ভরে ওঠে দিনের আলোয়।

এবার, প্লেন ছাড়লে তবু বৈকাল নাগাদ পৌঁছবে সমীর। সাহিত্য করতে গিয়ে ক্রমশ বিড়ম্বনাই বাড়ছে। কাল রাতে তাদের প্লেন নাকি জোর বেঁচে গেছে, আর একটু হলেই প্লেন ছিটকে পড়তো নীচে। পাইলট কোনমতে পালিয়ে বেঁচেছে প্লেন নিয়ে।

ঝড়ে পড়া প্লেনে এমনিতে যাত্রী নিয়ে উড়তে পারবে না, দমদম থেকে সকালেই একটা প্লেনে ইনঞ্জিনিয়াররা আসে। তারা এক একটা প্লেন চেক করে অনুমতি দিচ্ছে, যাত্রীরা উঠছে। সমীরদের প্লেন ঠিক করা হয়েছে, যাত্রীদের প্লেনে উঠতে বলা হচ্ছে, সমীররা টারম্যাকে প্লেনের দিকে এগোচ্ছে। হঠাৎ কার ডাক শুনে চাইল বিরক্তি ভরে। একজন এগিয়ে আসছে।

সমীরের মনটা খিঁচড়ে ওঠে - কাল দিনভোর ধকল গেছে, আবার এই সময় পিছনে ডাক শুনে চাইল। ভদ্রলোক বলে,

—দাদা, দমদমে নেমে দেখবেন কালিঘাট থেকে কারা এসেছেন, তাদের বলবেন বর কাল পৌঁছতে পারেনি, পরের প্লেনে আসছে। কাল বিয়ের তারিখ ছিল - এখানে পড়ে রইলাম।

সমীর ভদ্রলোকের জন্য এবার রাগ নয় সমবেদনাই প্রকাশ করে।

বেচারার বিয়ে কাল হল না, লগ্নভ্রষ্ট হয়ে রাতভোর এখানেই শূন্য বাসর জেগেছে। বলে সমীর - ভাববেন না, কন্যাপক্ষকে জানিয়ে দেব।

বিসর্জনের বাজনা বেজে ওঠে। গ্রামে প্রভাদেবী ক'দিন সমীরের পথ চেয়ে থাকে। এখানে এসে অবধি সমীর পুজোর সময় মায়ের কাছেই থাকে ক'দিন। এখন সীমাও এসেছে।

সীমাও জানে সমীর আসবে পুজোর আগেই। মিনাও এসেছে শ্বশুড়বাড়ি থেকে। কিন্তু পঞ্চমী - ষষ্ঠী - সপ্তমী কেটে যায়, সমীরের দেখা নাই।

সীমা গেছে শ্যামলীদের ওখানে। শ্যামলীই বলে,

—শিলং গেছে স্যুটিং এ। বলেছে সমীর - পূজার মধ্যেই ফিরবে। সীমা বলে—

ওটাই বড় হল? শ্যামলী ওটাও একটা কাজ রে। সাহিত্য, সিনেমা দুটো কাজ নিয়েই ব্যস্ত এখন সমীর।

—তাই বলে বাড়ির কথাও মনে থাকবে না? সীমা অনুযোগ করে। শ্যামলী জানে সীমার সীমাবদ্ধতা। সাহিত্যকর্মের জন্যও সংসারকে ঠিকমত দেখতে পারবে না এটা বুঝেছে শ্যামলী। তাই বলে — সীমা, সেও আটকে পড়েছে কাজে। এটা নিয়ে আর যে যা বুঝুক, তুই ভুল বুঝিস না।

—একটা জীবনে সে এগোতে চায়—তাকে কিছু ত্যাগস্বীকার করে তোকেই এগিয়ে দিতে হবে।

শ্যামলীর কথাটা ভাবছে সীমা। বলে সে,

— আমার প্রতি তারও কর্তব্য তো আছে। সবটা কি আমাকেই করতে হবে - সে কিছু করবে না?

শ্যামলী বলে —সমীরকেই শুধোবি। তবে তার উপর অবিচার করিস না। দেখেছি কি কঠিন পরিশ্রম করে সে দিন রাত।

পারুল বৌদি এখন প্রভার কাছেই রয়েছে এবাড়ির একজন হয়ে। সেও বলে — ঠাকুরপো এখনও এলো না। প্রভাদেবী বলে —দূরে গেছে।

পুজোর পর্ব শেষ। বৈকালে মেয়েরা দেবীবরণ করতে যায়। সীমাও গেছে। মনে হয় আজ সীমা যেন আজকে নিঃস্ব। সমীর আসেনি, পুজো এলো চলে গেলো। সীমা আশা করেছিল পুজোর পর বাবার ওখানে যাবে সমীরকে নিয়ে। কিন্তু এখনও তার পাত্তাই নাই।

বিসর্জনের বাজনা বাজছে। প্রতিমা বের করা হয়েছে মণ্ডপ থেকে নিরঞ্জনের জন্য।

প্রভাদেবী বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। এসে পড়ে সমীর হন্তদন্ত হয়ে।

—মা।

প্রভা ছেলের দিকে চাইল। মিনা বলে—এই এলে দাদা? পুজো শেষ করে? মা দেখছে সমীরকে। দুদিন তার ঝড়ের মধ্যে কেটেছে। মা বলে,

—ভিতরে চল।

শ্যামলীও এসে হাজির হয়। শুধোয় —শ্যুটিং কেমন হলো? সমীর বলে —ওরা করছে এখনও।

তারপর গতকাল থেকে ওর পরিক্রমার কথা শোনাতে মা বলে,

—ঠাকুর রক্ষে করেছেন। যা মাকে দেখে আয়।

বিজয়ার রাতেই এদের বাড়িতে আনন্দের ঢল নামে। প্রভার বাড়িতে অনেকেই প্রণাম করতে আসে।

বিসর্জনের পর প্রণামের রীতি। সমীর সীমাকে নিয়ে গেছে শ্যামলীদের বাড়ি মেসোমশাই-মাসীমাকে প্রণাম করতে।

বিভূতিবাবু বলেন—জীবনে প্রতিষ্ঠিত হও বাবা।

শ্যামলী সীমাকে বলে—কি রে বলিনি সমীর নিশ্চয়ই আটকে পড়েছে। না হলে আসতোই। এখন রাগ পড়েছে তো?

সীমা বলে—তোমাকে যা বলেছি ওসব কথা ওকে বলো না শ্যামলীদি।

শ্যামলী হাসে—এর মধ্যে রাগ-অভিমান সব মুছে গেল? খুব অল্পতেই তোরা খুশি,

তাই ভালো রে। ওতে শান্তি পাওয়া যায়। বেশি চাইলে অশান্তিই বাড়ে।

এটা যেন শ্যামলীর নিজের মনের কথাই। জীবনে সে সামান্য নিয়ে খুশি থাকতে সে চায়নি। সীমার জীবনের পূর্ণতা - তৃপ্তিটুকু দেখে আজ যেন শ্যামলী নিজের শূন্যতাকেই বড় করে দেখে।

চাঁদের আলোয় ভরে উঠেছে গ্রামের পথ। ওদিকে সবুজ ধানখেতের বিস্তৃতি। পথে গাছের নীচে আলোছায়ার আকিবুঁকি দিয়ে মায়াজাল বোনা। ফিরছে সমীর সীমা।

সীমা বলে —যা ভয় করছিল।

—কেন?

—তুমি এলে না। কোথায় আটকে রইলে। পুজোর ক'দিন যা বিশ্রী কাটলো।

সমীর বলে—কাজে আটকে পড়লাম। জানো সীমা - আমরা কষ্ট করেছি এই ছবির জন্য। যদি ছবিটা হিট করে--সব পরিশ্রম সার্থক হবে।

সীমা দেখছে সমীরকে। ওযেন কেমন দূরের মানুষ। চোখে তার সৃষ্টির জগতের স্বপ্ন। সীমার যেন সেখানে প্রবেশ অধিকার নেই।

শ্যামলীদির কথা মনে পড়ে। শ্যামলীই বলেছিল —ওর একটা আলাদা জগৎ আছে রে। সংসার ছাড়াই সেটার অস্তিত্ব, সেখানে একা।

সীমার মনে হয় যেটুকু পেয়েছে সে তাই নিয়েই তৃপ্ত থাকবে। সবটাকে দখল করার লোভ তার নাই। তার সীমিত প্রাপ্যটুকু নিয়েই তৃপ্ত থাকবে সে।

মালতী জেঠিমাকে প্রণাম করতে গেছে সমীর। বাড়িটা নিস্তব্ধ। ওদিকের দাওয়ায় বসে আছে মালতী, করালী রান্নাঘরে। দেবেনকে দেখেছিল হরির আটচালায়, দেবেন সেখানে কি লেকচার দিচ্ছিল। সমীরকে দেখে চাইল মাত্র। মুখটা কঠিন হয়ে ওঠে। কে বলে — সমীরদা - শুনলাম তোমার লেখা বই-এর সিনেমা হচ্ছে? কাগজে ফলাও করে লিখেছে। বাইরে শ্যুটিং করতে গেছলে?

সমীর এসব কথা নিয়ে বিশেষ আলোচনা করতে চায় না। শুধোয় —কেমন অছিস সোনা? এবার পুজোয় থিয়েটার হবে না? সোনা বলে —কই আর হলো? রমেনদা চলে যাবার পর থেকেই থিয়েটার আর হয় না। কে ওসব ঝামেলা সইবে বলো। তবে গুপী লোহারের দলের কেষ্ট যাত্রা হবে লক্ষ্মীপুজোর রাতে। শুনলাম রমেনদার সাজ-পোশাক পত্র সব ওকেই দিয়ে গেছে। ওরা মাথুর পালা গাইবে। রমেনদার পালাই।

দেবেন বলে —ছাড় তো ওঁদের গান। সেদিন বাড়োয় সিনেমা দেখে এলাম - তার কাছে এসব!

মনু মুখুয্যে ঝড়ের আগে উড়ে আসা খড়কুটোর মত এসে হাজির হয় পরদিনই। সমীর প্রবীররা সকালে চা খাচ্ছে, পারুল বৌদিও রয়েছে। প্রভা পুজো না করে জল খায় না। সে পুজোর ঘরে। মনু মুখুয্যে ঢোকে - কই গো বউঠান। বিজয়ার পেন্নামটা করি এসো। কাল তো যজমান বাড়ি থেকে ফিরতে রাত হলো।

মনু মুখুজ্যে ভক্তিভরে প্রভাকে প্রণাম করে। সমীরের ইচ্ছা করে না এই ধূর্ত লোকটাকে প্রণাম করতে। সে কোন ছুতোয় ঘরের ভিতরে যায়। মনু মুখুয্যে দেখে মাত্র। কিন্তু তার চটলে চলবে না - সে যা করে ঠাণ্ডা মাথায় হিসাব করেই করে।

ওদিকে পারুল চা এনেছে। মনু মুখুয্যে বলে —আহা বেঁচে থাকো মা। তারপরই প্রভাকে বলে,

—বৌঠান তোমার দয়ার শরীর, তাই মাকে ঠাই দিয়েছো। কিন্তু ওদিকে বড় ঠাকরুণ - দেবেনের মা তো অগ্নিশর্মা গো। দেবেনও খুব চটে আছে। জানোতে কি প্রকৃতির ছেলে, ওসব মামলা মোকদ্দমায় কাজ নেই। তুমি তো পুষছই ওকে - ওসব মামলা তুলেই নাও। দেবেনকে বিশ্বাস নাই।

মনু মুখুয্যের কথায় সুবীর বলে।

—শাসাতে এসেছেন নাকি? কি বলেছে দেবেন?

সুবীর এবার বি - এস সি দিয়েছে। তাজা তরুণ। তাই রুখে ওঠে। মেজভাই প্রবীর বলে —দেবেন কি বলেছে? বলুন?

মনু মুখুয্যে ভাবতে পারেনি যে এরাও রুখে উঠবে. পারুলের ওই সম্পত্তির দাবি জানিয়ে মামলার দিন পড়েছিল। মনু মুখুয্যেই দেবেনকে নিয়ে তার পরিচিত কোন উকিলের কাছে গেছল। উকিল মামলার নথিপত্র দেখে বলে - আপনারা এ মামলায় জিততে পারবেন না, আইন ওই বিধবার পক্ষে। মিটমাট করে নিন।

মনু মুখুয্যেও বুঝেছে ব্যাপারটা, দেবেন গ্রামে ফিরে ক'দিন চীৎকার। ওতরফ থেকে মালতী করালীর গলাও উঠছিল। কিন্তু মনু মুখুয্যে বলে —দেখে কিছু করা যায় কিনা। মালতী ঠাকরুণের থেকে কিছু খরচাও নিয়ে এসেছে সমীরের কাছে।

সমীর ভাইদের চীৎকার শুনে বের হয়ে আসে। মনু মুখুয্যেকে সুবীর বলে —দেবা শাসিয়েছে আমাদের, এত বড় সাহস ওর!

মনু মুখুয্যে বলে - না - না।

সমীর বলে —মামালা তুলতে বলেছে? কে বলেছে?

বৌদির ন্যায্য ভাগ পাঁচজনকে ডেকে ফেলে দিক মামলা তুলে নোব। যতক্ষণ না তা হচ্ছে মামলা চলবে ওকে বলে দেবেন।

আর তাতে যদি দেবেন আমাদের হুমকি দেয় - থানায় ডাইরি করে রাখবো। তারপর যা করার করতে হবে।

মনু মুখুয্যে বলে —না - না, সে সব কিছু নয়, এমনি বলছিলাম।

সমীর বলে —সেটা দেবু, জেঠিমাকেই বলতে বলুন। আপনি এতে কত কমিশন পেয়েছেন?

মনু মুখুয্যে বলে —একি বলছ বাবা।

—আপনি সব পারেন।

প্রভা বলে —থাম সমীর, বিজয়ার পর এলো মানুষটা, তোরা তিন ভাইয়ে কি শুরু করলি?

প্রবীর বলে —আমরা শুরু করি নি মা। শুরু করলেন তো উনিই।

মনু মুখুয্যে বুঝেছে এখানে ডাল গলবে না। তাই বলে।

—না, কথাটা উঠেছিল তাই জানিয়ে গেলাম বাবা।

দেবেন এবার বিপদে পড়েছে। এর মধ্যে মালতী ঠাকরুণ দেবেনের বিয়েও দিয়েছেন। সমীরের বিয়ে হবার পর করালীই বলে,

—দেবারও বিয়ে দিতে হবে মা।

মালতী জানে রমেনের কোন রোজগার ছিল না - তবু বিয়ে দিয়ে বৌ আনার সাধ তার হয়েছিল। তারপর নানা বিপর্যয়ই ঘটেছে একটার পর একটা। মালতী বলে - এক জনের বিয়ে দিয়ে ঘরে তো বিষবৃক্ষ আনলাম এখন পেটের ভাতে হাত দিয়েছে। আবার দেবার বিয়ে দোব?

এরমধ্যে দুর্গাপুরের নানা কারখানার কাজ শুরু হয়েছে। এই অঞ্চলের ছেলেরা এখন সাইকেলে গিয়ে বাস রাস্তা থেকে বাসে দামোদর নদীর ব্যারেজের উপর দিয়ে দুর্গাপুরের বিভিন্ন কারখানায় কাজের সন্ধানে যাচ্ছে। দেবেনও বুঝেছে কিছু করতে হবে। কিছু রোজগার চাই। গ্রামের কেউ কেউ এর মধ্যে কোনও কারখানায় মজুর - লেবার না হয় অন্য কোন কাজ ও পেয়েছে।

তারা এখন আর হরিতলার আট্‌চালায় লুঙ্গিপরে বসে আড্ডা মারে না। প্যান্ট শার্ট পরে - গাঁয়ে পায়জামা পরে পাঞ্জাবি গায়ে ঘুরে বেড়ায়। সাইকেল নিয়ে ডিউটিতে যায়।

দেবেনের এমনিতে কষ্টই হয়। এতকাল আয়েস করে বসে বসে খেয়েছে আর ঘুমিয়েছে। চাষের সময় মাসখানেক রোদে বৃষ্টিতে ঘুরতে হয়-আর ধান কাটার সময়, কিছুদিনের কাজ।

এখন প্রতিদিন সাইকেল ঠেঙ্গিয়ে বাস স্ট্যান্ড সেখান থেকে বাসে করে দুর্গাপুরে গিয়ে আবার হাঁটতে হয় মিনিট পনেরো। কারখানাতেও রীতিমত লোহার পাটি - পাত এসব বইতে হয়। ওয়েলডিং মিস্ত্রীর সঙ্গে কাজ করতে হয় ওই গরমে তেতে পুড়ে।

মাঝে মাঝে ভাবে সে এ কাজ ছেড়েই দেবে। তাদের পরিবারে এতদিন কেউ চাকরি করেনি। বাবা ছিলেন জোতদার। ঠাকুর্দা ছিলেন ওই অঞ্চলের নামকরা পণ্ডিত। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। সম্মানিত ব্যক্তি, পাঁচখানা গ্রামের লোক তার বাবাকেও মানতো।

কাকাই কলেজ থেকে বের হয়ে চাকরি শুরু করেছিল। দেবেন তাই ভাবে শেষকালে লোহাকাটা মজুর হতে হবে তাকে। তবে ভাবছে সে কথাটা।

তবু বুঝেছে চাকরি না করলে সমাজে ইজ্জত নাই। তাই চাকরিটা করতেই হবে। আর বিয়ের বাজারে চাক্‌রে বরের দাম অনেক। বিয়ে পর্যন্ত এটা চালিয়ে যেতে হবে।

মালতীও এখন ছেলের চাকরির বড়াই করে। আর করালীর শ্বশুরবাড়ির চেনাজানা কোন এক ভদ্রলোকের মেয়ের সঙ্গেই বিয়ের কথা হয়েছে। দেখতেও এসেছিল তারা।

মালতী বলে—বেই মশায় দেখছেন তো আমার ওই এক ছেলে বিষয় আশয় সবই ওর, দুখানা হালের চাষ - ছেলেও ভালো চাকরি করে। বরপণ দিতে হবে পঁচিশ হাজার টাকা নগদ। আর দশভরি সোনা - দান সামগ্রীও তেমনি চাই।

করালী বলে—মেয়েকে সাজিয়ে দিতে হবে তো। ভদ্রলোক বলেন —এত সঙ্গতি তো আমার নাই - তবে কিছু কমসম করতে হবে।

মনু মুখুয্যে এখন এদের হিতাকাঙ্ক্ষী। সে বলে,

ছেলে একবারে হীরের টুকরো, ম্যাট্রিক পাশ—ভালো চাকরে.

দেবেনের বিয়ে হয়ে গেছে, দরদাম করে কিছু টাকা গহনাও পেয়েছে মালতী, সেও শোনায়।

—ছেলের বিয়েও দিলাম। দেখলি তো?

প্রভা নীরবই থাকে। দেবেন ক্রমশ: বুঝেছে যে মামলার গতি প্রকৃতি সুবিধার নয়। দুটো শুনানীও হয়ে গেছে। এবার বুঝেছে দেবেন বড় বৌদি অর্দ্ধেক সম্পত্তি ঠিক বের করে নেবে। তাই মনু মুখুয্যেকে পাঠিয়েছিল যদি ওদের থামানো যায়।

কিন্তু মনু গিয়ে বলে,

—কিছু সুবিধে হবে না ঠাকরুণ। নন্দ উকিলের জামাই তো বলে যা হবে আদালতেই হবে। এখানে আর নয়।

দেবেনও ভাবনায় পড়ে। এর মধ্যে নতুন বৌও বুঝেছে তার শাশুড়ি ননদ কি বস্তু। কথায় কথায় শাসন। সেদিন নতুন বৌ সুষমা রান্নায় একটু বেশি তেল ঢালতে করালীই ফুঁসে ওঠে।

—লবাবের বেটি এলোরে - হড়হড়িয়ে তেল ঢালবে। তেল কি তোর বাবা টিন ভরে পাঠায়?

সুষমা বলে—বাবা তুলছো কেন ঠাকুরঝি? আব তোমাদের সংসারে ওই জলে সেদ্ধ তরকারি চলে - আমার বাপের বাড়িতে তা চলে না। তেলে ভেজেই রান্না হয়।

করালী গর্জে ওঠে—এত বড় মুখ তোর? ঝেটিয়ে মুখ ভেঙে দেবো।

সুষমা রান্নাঘর থেকে বের হয়ে এসে রুখে দাঁড়ায়। বলে সে,

—মুখ সামলে কথা বল ঠাকুর ঝি। তোমারটা খাই না - তুমিই আমাদের খাও। আর শুনে রাখো - বড়দি পাওনি আমাকে। আমার বাপও দুহাত ভরে টাকা দিয়েছে। ফ্যালনা নই - অনাথ আশ্রম থেকেও আসিনি। মালতীও এসে পড়ে - ওমা কিসব বললে লা?

করালী এতদিন এখানে রাজত্ব করেছে। বড় বৌ পারুলকে ঝিয়ের মত খাটাতো - যা তা বলতো। কিন্তু পারুল মুখের উপর কোন কথাই বলেনি। মুখবুজে সব সহ্য করেছে। তাকেও তাড়িয়েছে করালী। মালতীও মেয়েকে সমর্থন করেছিল।

এখন নতুন বৌ এর স্বরূপ দেখে এবার করালী বলে,

—শোন, ছুঁড়ির কথা শোনো। এত বড় সাহস।

—হ্যাঁ, তাই। কি করবে? সুষমাও রুখে ওঠে।

মালতী মেয়ের অপমানে এবার এসে সুষমার চুলের মুঠিই ধরে গর্জায়।

—দূর করে দেবো। আমার মেয়েকে এইসব বলবি।

সুষমা সেও ভাবতে পারেনি ওই করালী তার সঙ্গে এই ব্যবহার করবে।

দিনভোর না খেয়েই থাকে সুষমা। এখানে এসে ক্রমশ: সবই জেনেছে। জেনেছে পারুল তার বড় জায়ের কথা। তাকে এরা বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে। এবার তার সঙ্গেও এই সব ব্যবহার শুরু করেছে।

এবার সুষমা একটা হেস্তনেস্ত করতে চায়।

দেবেন খেটেখুটে বাড়ি ফিরেছে। তার মন-মেজাজও ভালো নাই। এত খাটুনি তার পোষাচ্ছে না। আর নতুন ম্যানেজারও যেন সব সময় পিছনে লেগে থাকে।

বলে সে —ঠিকমত কাজ না করলে মাইনে কাটবো। যাও, মাল বানাও আগে।

দেবেন মুখ বুজে কাজ করে বাধ্য হয়েই। মন মেজাজ ভালো নেই তার। বাড়ি ফিরেছে। থমথমে পরিবেশ। করালীও খায়নি। মালতী এখনও তাকেই সাধছে —চল, দুমুঠো মুখে দিবি মা, এবার দেবেনকে দেখে মালতীই বলে,

—ওই পাপকে দূর কর ঘর থেকে।

—কী হলো?

করালী এবার সাতখান করে লাগাতে থাকে বৌ এর নামে। দেবেন কিছু বলার আগে সুষমাই বলে,

—কালই আমাকে বাবার ওখানে পাঠিয়ে দাও। এ বাড়িতে আর থাকবো না। ওই মা - আর বোনকে নিয়েই থাকো। এখন বুঝেছি বড়দিকে কারা তাড়িয়ে ছিল। তাকে টিকতে দেয়নি এরাই দুজনে-

করালী গর্জে ওঠে। দেবেন এবার হুঙ্কার ছাড়ে করালীর দিকে।

—চোপ, চুপ কর তুই।

করালী অবাক, মালতী বলে—কার দোষ আর কাকে বকছিস?

তারপরই সুষমাকে বলে—ক'মাসেই ভাতারকে বশ করেছিস নাকি লা? তখনই জানতাম আর এক আপদকে আনলাম। ওটাকে বিদেয় কর দেবা।

দেবেন তেতেপুড়েই ছিল। ওদিকে বড়বৌদিকে ওদের কথায় বের করে দিয়ে এখন কঠিন বিপদে পড়েছে। মা-বোনের উপর দেবেন খুশি ছিল না। এর পর আবার তার বৌকেও মারধর করতে শুনে দেবেন বলে ওঠে,

—একদম মুখবুজে থাকবে। তোমরা দুজনে মিলে অনেক কাণ্ডই করো। এতদিন সব সয়েছি। আর সইব না।

মালতী এবার গলা পঞ্চমে তুলে বলে,

—মাগের ভেড়ুয়া হয়ে গেলি - মুখপোড়া।

ওদিকে সুষমাও জেদ ধরে - এখানে আর থাকবো না। থাকো ওই দুজনকে নিয়ে। কালই বাপের বাড়ি গিয়ে এই হেস্তনেস্ত করবো। আমাকে ওই বড়দি পাওনি।

ওই বাড়ির গোলমালের খবর এখানে সবই পৌঁছায়। সমী দোতলার বারান্দা থেকে এদিকে চেয়েছিল, ওদের বারান্দা থেকে এ বাড়ির সব কিছুই দেখা যায়, সীমা দেখছে এদের কাণ্ড। পারুলই বলে—সরে আয় সীমা-এখুনি তোকেও যা তা বলে দেবে ওরা।

সীমা বলে—নিজেদের বারান্দায় দাঁড়াতে পারবো না? বুঝলে দিদি—ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। ওরা তোমাকে তাড়িয়ে আবার সুষমার বাবার টাকা-গহনা সব নিয়ে এবার তাকে ও তাড়াতে চায়। আর বেধেছে সেই খানেই।

তুমি কিছু করতে পারোনি, সুষমাই এবার ওদের মুখের মত জবাব দিয়েছে।

পারুল বলে—দেবু ঠাকুরপো ওই মা দিদিকেই বেশি মানে। ফিরে এসে সুষমাকেই

কিছু না বলে।

কিন্তু দেবেন এবার বুঝেছে সুষমাকে চটানো ঠিক হবে না। ওর বাপের দৌলতেই ওই কারখানায় কাজ পেয়েছে, টাকাও কিছু পেয়েছে, আর এর মধ্যে সুষমাকেও মেনে নিয়েছে দেবেন, তাই মায়ের কথায় দেবেন বলে,

—এবাড়িতে আমার রোজগারেই খাও তোমরা। আমার জমির আয় থেকেই করালীও খায়, এবার আমার সংসার হয়েছে, ওকে চিরকাল পুষতে পারবো না। ওকে নিজের শ্বশুরবাড়ি যেতে বলো।

করালী এবার বুঝেছে হাওয়া বদলেছে। এতদিনের প্রাধান্য এবার ঘুচে যাবে তার। মালতী এবার কপাল চাপড়ে ঠুকতে থাকে।

—ওগো তুমি কোথায় গেলে গো, দেবার কথা শুনে যাও গো-বলে কিনা দূর করে দেবে তোমার করালীকে? আমাকে এবার ডেকে নাও গো—

তারপরেই সুষমার দিকে চেয়ে গর্জে ওঠে,

—তুই-ই যত নষ্টের মূল। বেরো—

দেবেন এবার মাকেই বলে —কোন কথা বলবে না ওকে। ওর কোন দোষ নাই। ওকে এবাড়ি থেকে বের করার আগে তোমার মেয়েকেই দূর করবো-তারপর—

শেষ কথাটা আর বলতে হয় না। মালতীর আর্তনাদে সারা বাড়ি কেঁপে ওঠে।

প্রভা বলে সবশুনে অন্যায়ের বিচার ভগবানই করবেন রে পারুল। তার বিচার বড় সূক্ষ্ম। এবার বড়দি আর করালী ঠাণ্ডা হবে।

লক্ষ্মীপুজো এ গ্রামে বেনেদের পাড়ায় বেশ ধূমধাম করেই হয়। আলাদা লক্ষ্মী মেলা আছে। ক'দিন সেখানে পূজা-খিচুড়ি ভোগ এসব হয়। আর সন্ধ্যায় যাত্রা—কেষ্টযাত্রার আসর বসে।

আগে গ্রামের ছেলেরাই যাত্রা করতো। রমেন ছিল যাত্রার মূল পাণ্ডা। রজনী ভটচায-করুণা-কালীকেষ্ট আরও কিছু ছেলের দল ছিল। এখন রমেন নাই। করুণা-রজনী ভটচায-কালীকেষ্ট মারা গেছে টিবিতে। আর সেই উৎসাহ নাই। ফলে ভিন গাঁয়ের যাত্রার দল এনে যাত্রা করাতে হয়।

আর কেষ্ট লোহার ছিল রমেনের দলের মূল পাণ্ডা। কেষ্ট মুখুয্যে বাড়িতে মাহিন্দারী করে, সেইই বাকি সময় থাকতো রমেনের সঙ্গে তার কেষ্টযাত্রার দলের ছেলেদের জুটিয়ে আনতো। শশী বেহালাদারের গাঁজার পয়সা যুগিয়ে দিত-আর পিকু বাজাতো বাঁশের বাঁশি। কেষ্টই রমেনদার সাজপত্রগুলো যত্ন করে রেখেছে। এখন তার স্বপ্ন আবার দল গড়বে রমেন ঠাকুরের দল।

এবার তোড়জোড় করে সেইই দল গড়েছে। লক্ষ্মী মেলার আসরে পালা গান গাইবে। মাথুর পালা। কেষ্ট লোহার সমীরকেই বলে,

—আসবেন গো। রমেন ঠাকুরের সাট, পালা একটু দেখবেন।

•

গ্রামের এই আসরে অনেকেই এসেছে। পল্লীগ্রামে-যাত্রা-কেষ্টযাত্রার দর্শকের অভাব হয়

না। কেষ্ট লোহারের দলে গান শুরু হয়েছে। রাখাল বাগাল ছেলের দল, গরু চরায় না হয় মাঠে কাজ করে দিনভোর নিজের অন্ন সংস্থানের জন্য। তারাই সন্ধ্যাবেলা নিজেরাই কেষ্ট আর শশী বেহালাদারের নির্দেশমতো মহড়া দেয়, শশী গাঁজা টেনে বাঁশের কঞ্চি হাতে ছেলেদের নাচের মকশো করায়-এক দুই তিন, পা ফেলে তালে তালে শালো।

না পারলেই পায়ে কঞ্চির বাড়ি পড়ে।

তারাই রাধা কেষ্ট সেজেছে। ওইসব পোশাকগুলো রমেনদা বুক দিয়ে আগলে রেখেছিল দেখেছে সমীর। বড় আশা ছিল তার আবার সেরে উঠে সে যাত্রার দল করবে। আসরে হেসাক বাতি জ্বলবে-উঠবে বেহালার সুর। তার নাটক গান হবে।

আজ রমেনদার কথা মনে পড়ে সমীরের। গানগুলো বেঁধেছিল রমেনদা, সুরও তারই দেওয়া, আজ সেই নাটক গানকে প্রাণবন্ত করে তুলেছে কেষ্ট লোহার তার দল বল নিয়ে।

শশী বেহালাদার-এর বেহালার করুণ সুর ওঠে, কৃষ্ণ বিরহে বিরহিনী রাধা-সখীদের গানের সুর ওঠে, আজ রমেনদা নাই।

সমীরের বারবার মনে পড়ে সেই বেদনা বিধুরমুখখানা।

—আবার সেরে উঠলে কেষ্টযাত্রার গান করবো সমীর। দেখবি কেমন পালা লিখেছি।

সমীর উঠে আসে। একটা করুণ পরিণতি তার চোখের সামনে ফুটে ওঠে।

দেবেন এবার বুঝেছে তার বড়বৌদি মামলায় জিততে চলেছে। এতদিন চেষ্টা করেও সে কোন সুরাহা করতে পারেনি। এর মধ্যে সুষমার বাবাও এসেছেন মেয়ের এখানে। কিছু কথাও কানে গেছে তার।

দেবেনকে বলেন তিনি,

—দরকার হয় সুষমাকে নিয়ে যাবো, এসব অশান্তির মধ্যে মেয়েকে রাখবো না বাবা।

মালতীও চুপ করে গেছে এবার। করালীও বুঝেছে যাদের জন্য এত করেছে আজ সেই দেবেনও চায় না করালী এখানে আর থাকুক।

দেবেন বলে—আর কোন গোলমাল হবে না।

শ্বশুরমশাইও সাবধান করে যান—এর পর কিছু ঘটলে আর চুপ করে থাকবো না।

এরপরই দেবেন কোর্টের নোটিশ পায়। পারুলদেবী যে এই সম্পত্তির অর্ধেকের মালিক এবং তার প্রাপ্য তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে এই নির্দেশ আসতে দেবেন এবার মা বোনের উপর ক্ষেপে ওঠে, বলে সে,

—এরপর কী হবে? তখন তো পিছনে লেগে তাড়ালে।

করালী বলে আমরা তাড়াইনি, তুই বের করে দিলি বৌদিকে।

—এবার তোকেই বের করবো। দেবেনও শোনায়।

মালতীর চোখে জল নামে। বেশ বুঝেছে এরপর বিপদই হবে বাকি জমি-জায়গা দুভাগ হয়ে গেলে। তাই এবার দেবেনের হয়েই করালীকেই বলে মালতী,

—তুইই তো এসব করলি তখন? বললাম চুপ করে থাক। এখন?

করালীর স্বামী ললিত মাঝে মাঝে আসে এখানে, কোন কোলিয়ারিতে কাজ করে।

এবার করালীই বলে,

—আর ঢের হয়েছে, এবার নিজেদের ব্যবস্থাই করো। যাদের জন্য করি চুরি তারাই বলে চোর। এসবে আর দরকার নাই। ললিত বলে—তাই চলো। সেই কোলিয়ারির বাসাতেই থাকবে।

করলী বিয়ের পর দু'একবার সেখানে গেছে। স্টেশন থেকে দূরে বনতুলসী আর পলাশগাছ ঘেরা কিছুটা বসতি-ছোট কোলিয়ারি। হাটবাজারও দূরে, সেখানে ছোট্ট দুটো ঘরের বাসা—একেবারে অজ পাড়াগাঁ।

সেখানেই চলে গেল করালী এই বাড়ি ছেড়ে।

মালতী কপাল চাপড়ে কাঁদে—ক্যামন বউ আনলাম গো মেয়েকেই দূর করলো। এবার আমাকেই না পথে বের করে দেয়।

দেবেন এখন বিপদেই পড়েছে। বড়বৌদিকে তার অংশ দিতেই হবে। এবার সে মাকেই বলে,

—তোমার জন্যই এসব হয়েছে। ওই বার বাড়িতে পড়ে থাকবে। দুবেলা দুমুঠো খেতে পাবে। কোন কিছুতেই থাকবে না।

মালতী আজ ছেলের দিকে চেয়ে থাকে অবাক হয়ে। রমেন কোনদিন তাকে কড়া কথা বলেনি। সবকিছু মুখবুজে সয়ে গেছে সে আর পারুল। আজ ছোট ছেলে আর বৌ করালীকে তাড়িয়েছে, এবার তাকেও পর বাড়িতে ফেলে রেখেছে। নীরব কান্নায় ভেঙে পড়ে মালতী। তার আগেকার তেজ, দর্প সব নিশেষে হারিয়ে গেছে।

করালী ছিল তার সব কুকর্মের দোসর, আজ সেও নাই। এখন মালতী বাইরে পারুল যে ঘরটাতে থাকতো সেই ঘরেই থাকে একা, দেবেন কাজে বের হয়ে যায়, সুষমাই ওর খাবার দিয়ে যায়। আজ পারুলকে সে কত কষ্ট দিয়ে তাড়িয়েছিল তাই মনে হয় বারবার।

সমীরের সেই উপন্যাস এর চিত্ররূপ যা সুরেশবাবু দিয়েছিলেন সেটা মুক্তি পেয়েছে। ছিন্নমূল মানুষদের সমস্যা এখন সমাজের একটা কঠিন সমস্যা হয়ে উঠেছে।

কলকাতার আশপাশের রূপও বদলে গেছে। লাখো লাখো মানুষের বাঁচার লড়াই। দেশ ছেড়ে আসার বেদনা তাদের মনে। সংসার সমাজজীবনে একটা আলোড়ন এনেছে এই সমস্যা। অর্থনৈতিক সামাজিক রূপটাই বদলে গেছে।

এই সময় ওই বিষয়বস্তু নিয়ে লেখা ওই উপন্যাসের চরিত্রগুলোকে নিপুণভাবে ফুটিয়েছিল সমীর। মানবিক দৃষ্টি কোন থেকে দরদী কথা সাহিত্যিকের মত, আর সুরেশবাবুর মত দক্ষ পারিচালক তাকে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন, যেমন অভিনয়, তেমনি নির্মাণশৈলী। তাই ওই ছবিও যেন একটা সার্থক শিল্পসৃষ্টিতে পরিণত হয়।

জনসাধারণ এই ছবিকে সাগ্রহে দেখে আর তাদের জীবনের এই কাহিনীকে স্বীকৃতি দেয়। কলকাতার কাগজেও সমালোচকরা উচ্ছাসিত প্রশংসা করেন এই ছবির। সমীরের প্রথম চিত্রায়িত কাহিনী অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছবির সম্মান পায়।

সমীর দেখেছে অনেক শিল্পী সাহিত্যিক কবিকে। দু চারবার কলেজ স্ট্রিট পাড়ার কফি হাউসেও গেছে রোহিণীর সঙ্গে আগে।

খবরের কাগজের অফিসেও গেছে-কলেজ স্ট্রিটেও দেখেছে কিছু সাহিত্যিক-কবিদের। যারা নামী-প্রতিষ্ঠিত দেখেছে সমীর তাদের মানসিকতা স্বতন্ত্র। অন্যদের সঙ্গে তারা সহজ-সরল ব্যবহারই করেন।

কিন্তু সেই যুগের পর তাদের সময়ের উঠতি কবি দু' একজন সাহিত্যিককে দেখেছে। তারা দু'একখানা কবিতা উপন্যাস লিখেই নিজেদের একটা কিছু মনে করতে শুরু করে। তখন অন্যদের দিকে চেয়ে দেখে যেন কোন গজদন্ত মিনার থেকে নীচে স্তাবকদের প্রতি কৃপা সৃষ্টি করছে। কথাবার্তাতে কেমন একটা উদ্ধত ভাব। দু'একজন কোন সংবাদপত্রে চাকরিও করেন। তাদের ঘিরে থাকে স্তাবকদের দল। তাদের পত্র-পত্রিকায় যদি একটা গল্প ছাপেন এই আশায়।

সমীরদের পাড়ার ওদিকেই কোন পত্রিকার সহকারী সম্পাদক থাকেন। তিনি নিজেও লেখেন টেখেন। তাকে। ঘিরে বেশ কিছু তরুণ কফি হাউসে যান। তিনিই মধ্যমণি, সমীর নমস্কার করে তাকে তিনি তখন কোন স্তাবকের মুখে তার কোন রচনার গুনগান শুনছেন। সমীরের দিকে চাইবার সময় তার নেই। সমীর ঘরে আসে। অন্য টেবিলে বসে।

ওদিকে তখন শহুরে তরুণ-অনেক হবু লেখকদের ভিড় সেই ভদ্রলোককে ঘিরে। তার পত্রিকায় লেখা ছাপা হলেই নাকি আসল সাহিত্যিকের তক্‌মা জোটে, কফি হাউসে তো বটেই।

সেদিন সকালে সমীর বাজারে গেছে, দেখে এক তরুণ অধ্যাপককে থলি হাতে বাজার করছেন। সমীরের চেনা-দু একটা পত্র পত্রিকার অফিসে দেখা হয়েছে, ইদানীং কফি হাউসেও আসেন তিনি। সমীরই শুধায়—সকালে, এখানে?

ভদ্রলোক ভবানীপুরের দিকে থাকেন। সমীরের কথায় বলেন,

—কাল রাতে দাদার বাসাতেই ছিলাম, ওঁর একটা লেখার কপি করে দিতে হলো। সকালে বাজারেই এলাম।

সমীর অবাক হয়। পত্রিকায় নিজের লেখা ছাপাবার জন্য এরা এত কিছু করেন - সুতরাং লেখা ছাপা হবার পর অমনি কেউকেটা মনে কেন করবেন না নিজেদের।

সমীর গ্রামের মানুষ—সেই গ্রাম্য সারল্য, মানবিকতা মূল্যবোধটুকুকে শহরে এসে স্বার্থের তাগিদে হারায়নি। সে সাহিত্য করে সাহিত্যকে ভালোবাসে বলে—জীবনকে দেখেছে নানা রূপে নানা পারিপার্শ্বিকের মধ্যে।

সেই জীবনকেই সে তুলে ধরতে চায়। আর তার মনের অতলে একটা কঠিন সত্তাকে সে দেখেছে। সে আপস করতে চায় না, স্বার্থের জন্য বিকিয়ে দিতে পারে না। তাই শহরের মানুষের মত অন্ধ স্তাবকতাকে সে পছন্দ করে না। ওটা করতে তার বিবেকে বাধে।

তার ছবি এখন খুবই নাম করেছে।

সুরেশবাবুর এই ছবি দু' তিনটে সাধারণ ছবির পর সুপারহিট হয়েছে।

তিনিও খুশি।

এবার সমীরের অন্য একটা উপন্যাসের চিত্ররূপ দেবার কথাই ভাবছেন। এনিয়ে শুরু করেছেন চিত্রনাট্য লেখার কাজও।

প্রকাশকদের চাহিদাও বাড়ছে। সমীর এবার সুন্দরবন—সেখানের মানুষের জীবনযাত্রা

—তাদের আশাস্বপ্নের কাহিনী নিয়েই লিখতে শুরু করেছে নতুন উপন্যাস।

কয়েকটা পত্র-পত্রিকা থেকে ছোট গল্পের তাগিদেও আসছে। সমীর ছোটগল্পও লেখে নিজস্ব ভঙ্গিতে। শহরে বাস করে সে বাধ্য হয়ে, কিন্তু নিজেকে মনে করে গ্রামের মানুষই।

শুধু গ্রামই নয়-সে সময় পেলেই বের হয়ে পড়ে অরণ্যপর্বতে। বিভূতিভূষণবাবুর চোখে দেখা সারান্দা বনরাজ্যের জীবন-সেই সাতাশো পাহাড়ের দেশকেও দেখতে চায়। তার মনে হয় মানুষের জীবনচর্যা এক চলমান পরিবর্তনশীল চরিত্রের। যে যেমন পরিবেশে থাকে-বনে, পাহাড়ে-সুন্দর বনে, মরু অঞ্চলে তার জীবনচর্যাও সেই সঙ্গে বদলে যায় সেই রূপেই। মানুষের অন্তরসজ্জা একই। বাইরের রূপবদলায মাত্র।

সেই জীবনকেই রূপে রূপান্তরে দেখতে চায় সমীর। তাই সারান্দা যাবার কথাই ভাবছে। তার সাহিত্যে নতুন মাত্রা আনার জন্যই ওই বিচিত্র সব জগতকে দেখা দরকার।

অফিসের চাকরি-ওদিকে লেখা, তারপর ছবির কাজও করতে হচ্ছে। শ্যামলী এখন কলকাতারই একটি মেয়েদের কলেজে অধ্যাপনা করছে। মাঝে মাঝে আসে সমীরের বাসায়।

এখন জগন্নাথ বিয়ে করে অন্যত্র বাসা করে চলে গেছে, একা মৃগেনই রয়েছে। সেই চাকরিতে পরীক্ষা দিয়েছে নানা সরকারি কিতাবপত্র পড়ে।

বলে সমীরকে —তুইও পরীক্ষা দে। প্রমোশন পেলে গেজেটেড র‍্যাঙ্কে যাবি।

সমীরের ওইসব আইনের বইপত্রগুলো দেখলে গায়ে জ্বর আসে। এমনি সাহিত্য ইতিহাস এসব নিয়ে অনেক বই পড়ে। দেশবিদেশের লেখা নামী লেখকের বহু বই। দরকার হলে ইতিহাস সাহিত্যের বই পড়ে লাইব্রেরিতে বসে নোটও নেয়। সেগুলো তার লেখার কাজে লাগে।

কিন্তু ওই নীরস আইনের বই পড়ে চাকরিতে উন্নতির পরীক্ষা দিতে সে পারবে না। দেখেছে সমীর উপরের থাকের চাকুরিয়াদের অবস্থা - তারা উর্ধ্বতন কর্তাদের যেন হাতের পুতুল আর ঠ্যালা খায় নীচের কর্মীদের কাছে। আলাদা চেম্বার-বড় টেবিল সব আছে —কিন্তু স্বাধীনতা নেই।

ওই চাকরির ওপর তার কোন মোহই নেই। বলে সমীর —পরীক্ষায় পাশ করলেই তো হুকুম হবে ভুবনেশ্বর-পাটনা না হয় জব্বলপুরে গিয়ে খাস কামরায় বসে গোলামী করো গে। কলকাতা ছাড়া আমার পক্ষে মুশকিল।

মৃগেন বলে—ওই লেখালেখির রোগে ধরেছে তোকে? আরে বাবা কি পাবি ওর থেকে। ওতে তো খাটতে হবে-ছুটোছুটি করতে হয় কত তাও দেখেছি। এতো অফিসে বসে চাকরি —গেজেটেড র‍্যাঙ্ক।

সমীর জানে মৃগেন পড়াশোনায় ভালো, স্টার পাওয়া ছাত্র। ও অধ্যাপনার লাইনে যায়নি। এম-এ করতে পারেনি বলে এখন চাকরিতেই উন্নতি করতে চায়।

ওই পথে ও চলুক। সমীর সাহিত্য ছেড়ে চাকরিতে উন্নতির কথা ভাবতে পারে না। রোহিণী তার সৃষ্টির কাজের জন্য চাকরিই ছেড়ে দিল। সেদিন সমীর তাকে সমর্থন করেনি। বাঁচার জন্য সামান্য রসদের যোগানটা ঠিক রাখতেই হবে, তার বেশি দরকার নাই।

সাহিত্য সৃষ্টি নিয়েই থাকবে সে। মৃগেন বলে,

—ভুল করছিস সমী। আমাদের ব্যাচের অনেকেই পরীক্ষা দিচ্ছে। তুই দিলে সিওর পাশ করবি। সমীর চুপ করে থাকে।

শ্যামলীও আসে। এখন সে অন্য লেডিজ-হোস্টেলে থাকে। বেশ বড় বাড়িটা, একটু বাগান গাছ-গাছালিও আছে, আর এখানে কলেজ হোস্টেলের মত বুলডগমার্কা কোন সুপার নাই।

সমীর বলে —বাঁচা গেছে, সেই মহিলা চশমার ফাঁক দিয়ে চাহনি মেলে যা চাইত ওরে বাবা।

শ্যামলী হাসে, বলে এখন আর ছাত্রী নই- ছাত্রীদের ম্যাস্টারনী তা জানো না? কিছু দিন পর আমিই ছাত্রীদের তোমার মত গার্জেনদের দিকে ওমনি চাহনিতে চেয়ে থাকবো পুলিশের মত।

হাসে সমীর।

—ওরে বাবা। ওটি হয়ো না শ্যামলী। তবু একটু ঠাট্টা ইয়ার্কি করার একজন আছে। সেটিও হারাতে পারবো না। শ্যামলী বলে — চাকরির পরীক্ষা দিচ্ছ না? প্রমোশন পেতে-

সমীর বলে—ওতে দরকার নাই তারপর কিছু টাকা বাড়তি দিয়ে সারা ইন্ডিয়ায় নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাবে। লেখা টেখা মাথায় উঠবে। ও আমি পারবো না।

শ্যামলী দেখছে ওকে। বলে সাহিত্যের জন্য নিজের কেরিয়ারের কথাও ভাববে না? গেজেটেড অফিসার হতে—

—কিছু ত্যাগ না করলে কিছু পাওয়া যায় না শ্যামলী, তাই সাহিত্যের ক্ষেত্রে কিছু পেতে গেলে এই ত্যাগটুকু করতেই হবে।

—যদি ঠকে যাও?

শ্যামলীর কথায় সমীর বলে —জানি না সাহিত্য জগতে কিছু দিতে পারবো কি না - তবু নিজের মনের তাগিদে এই সিদ্ধান্ত নিতেই হবে। বেশি কিছু আমি চাই না-বাঁচার মত রসদ পেলেই খুশি। তবু মনে সান্ত্বনা থাকবে ফাঁকি দিয়ে সাহিত্য করতে আসিনি, তার জন্য কিছু ত্যাগও করেছি।

—সীমা জানে এসব? শ্যামলী বলে।

সমীর বলে—সীমাকে যতটুকু জেনেছি, ও এনিয়ে ভাবে না। আমার কাজে সে বাধা দেবে না।

শ্যামলী কি ভাবছে। সন্ধ্যা নেমেছে বাগানে। কাঁঠাল ফুলের তীব্র মদির সুবাস ওঠে। ওই সুবাসে মনে পড়ে সমীরের তাদের বাড়ির কথা। উঠানে কাঁঠাল গাছে ফুল এলে এমনি মিষ্টি সুবাস জাগে।

সমীর বলে—শ্যামলী, জীবনটাকে বাধ্য হয়েই জুয়ার ছকে বাজি ধরেছি - সীমাকে ভাবিনি, তবু সে এসেছে আমার জীবনে। তার জন্য মূল্যও অনেক দিতে হবে, তবু নিজের পথেই চলতে হবে হয়তো - এই জীবন দেবতার নির্দেশ। শান্তির জীবনের আশ্বাস আমার নেই—সংগ্রামই করে যেতে হবে। সাফল্যের সন্ধান পাবো কি না জানি না।

শ্যামলীর হাতখানা ওর হাতে। সমীর বলে,

—সীমার হয়ে দেখছি দারুণ ওকালতি শুরু করলে?

শ্যামলী চাইল ডাগর চোখে ওর অতল চাহনিতে কী নীরব বেদনার ছায়া, ওর মনের সেই বেদনাটাকে আজ যেন সেও আর চেপে রাখতে চায় না।

শ্যামলী বলে —কারো হয়ে ওকালতি করছি না সমীর, নিজের জন্যও সেটা কোনদিন করিনি। আজ তোমাকে বাধা দেব না - নিজে সৃজনশীল মন নিয়ে জন্মাইনি, সৃষ্টির উন্মাদনা, বেদনা-তীব্রতা এসব আমার জানা নেই, তবু তোমার এই মনকে শ্রদ্ধা করি। হয়তো এর জন্য দুঃখ পাবে - তবু জেনো একজন তোমার পাশে থাকবেই।

—শ্যামলী। সমীর আজ যেন শ্যামলীর এক নতুন রূপকে দেখে, নিজের জন্য দুঃখই হয়। জীবনদেবতা তাকে এক পরম প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত করেছে। কে জানে - এই বেদনা আঘাতের প্রয়োজন হয়তো রয়েছে তার জীবনে। অনেকে সহজেই অনেক কিছু পাবার ভাগ্য করে আসে। তারা পায়ও অনেক কিছু।

কিন্তু সমীর দেখেছে তার হাতের কাছে সহজে কিছুই আসেনি বরং নিষ্ঠুর জীবনদেবতা তার সামনে থেকে সবকিছু কেড়েই নিয়েছে। বাবা মারা গেলেন তার সব স্বপ্ন, ভবিষ্যৎ হারিয়ে গেল। বের হতে হলো রুজিরুটির সন্ধানে। পিছনে তার উপর নির্ভর করছে সারা পরিবার।

সেই কর্তব্য সে পালন করেছে। ভাইদের মানুষ করেছে, বোনের বিয়ে দিয়েছে। মোটামুটি সুখে শান্তিতে আছে সে। সুবীর বি-এস-সি পাশ করে দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্টে চাকরি পেয়েছে, সেজভাই প্রবীর গ্রামের স্কুলের চাকরি পেয়েছে।

তবু মায়ের প্রতি কর্তব্য ভোলেনি সমীর। সেদিন সীমাকে বিয়ে করেছিল মায়ের ইচ্ছা পূরণ করতে। সেদিন প্রতিবাদ করেছিল—কিন্তু নিজের দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে নি স্বার্থপরের মত।

শ্যামলীর বাবার কাছে সে নানা ভাবে কৃতজ্ঞ। হয়তো তিনিও অমত করবেন। তাই নীরবেই মায়ের কথা মেনে নিয়েছিল।

বেশ বুঝেছে সমীর সে নিজেই আরাম আয়েস—নিশ্চিন্ততার পথ নয় একটা সংগ্রামের পথই বেছে নিয়েছে। তাকে একাই এগিয়ে যেতে হবে এই পথে একক নিঃসঙ্গ পথিকের মত।

সেদিন রোহিণীর কথা মনে পড়ে বারবার। রোহিণী চাকরি ছেড়েছিল তার সৃজনশীল কাজের জন্য। রোহিণী ছবি করছে, সেদিন ওর ফ্লোরে গেছল সমীর।

দেখে একটু বিস্মিতই হয়। সুরেশবাবুর ফ্লোরে কাজ দেখেছে। শিল্পীরা সবাই তটস্থ হয়ে থাকে। যে যার পার্ট নিয়ে ভাবছে। সুরেশবাবু একটা খাকি ফুলপ্যান্ট আর লম্বা সিড়িঙ্গে উর্ধ্বাঙ্গে একটা স্যান্ডো গেঞ্জি পরে বিড়ি ফোঁকে আর টেকনিশিয়ানদের আলো করতে দেরি হলে চিৎকার করে,

—কি হচ্ছে? ঘুমিয়ে গেলি নাকি রে?

ওর ক্যামেরাম্যানও চিৎকার করে—এক কিলোটা দে—সাতনম্বর, ওই ফেস লাইটটা ফ্লোরে পটপট করে আলো জ্বলে ওঠে।

—শিল্পীরাও শ্যুটিং জোনে এসে দাঁড়ায়। সুরেশবাবু তাদের নিয়ে রিহার্সেল শুরু করে।

কোন শিল্পী ডায়ালগ বলার সময় ঠিকমত চলাফেরা করতে না পারলে হাঁক পাড়ে।
—বৃষকাষ্ঠের মত দাঁড়িয়ে রইলি যে, অ্যাই রাঙ্গামূলো হাতের মুভমেন্ট কই?
ক্যামেরা দিয়ে নিজেই শটটা দেখে নিয়ে এবার হাক পাড়ে,
—রেডি?
সারা ফ্লোরে নীরবতা নামে-সুরেশবাবুর গলা শোনা যায়,
—স্টার্ট সাউন্ড-ক্যামেরা-
শ্যুটিং শুরু হয়। ওই সট শেষ হলে ঝটপট তৈরি হতে হয় পরের শটের জন্য। কাজের একটা সুন্দর পরিবেশ গড়ে ওঠে।
রোহিণীর ফ্লোরে এসেছে সেদিন সমীর।
রোহিণীর দু তিনজন সহকারী গুলতানি করছে। ওদিকে ক্যামেরাম্যান সিগ্রেট ফুকছেন আর আলো করছে যারা তারাও তেমনি ধীরগতিতে আলো বসাচ্ছে।
রোহিণী তখনও ওদিকে বসে চিত্রনাট্যে কি জরুরী রদবদল করছে। দু তিনজন শিল্পীও রয়েছে সেটে। এক মোটা ভদ্রমহিলা মেকআপ্ নিয়ে আসতে রোহিণীই নিজের সিট ছেড়ে দেয় ব্যস্তভাবে।
—বসুন ম্যাডাম। আপনার রোলটাকেই একটু গুরুত্ব দিচ্ছি। একেবারে স্যাকরিফাইশিং রোলই করছি।
ওদিকে বসে আছে মুষকো কালো পেটমোটা এক ভদ্রলোক। আদ্দির পাঞ্জাবির ওপর গলায় একটা মপচেন, পরনে কোঁচানো ধুতি। ভদ্রলোক বলে—তাই করুন রোহিণীবাবু, আমাদের কাঞ্চনমালার ড্যান্স ট্যান্সও একটা রাখবেন। দারুণ নাচে মশায়। আর একটো? ফাটিয়ে দেবে। এত ট্যাকা দিচ্ছি ওর জন্যই। ওকে হিরোইন করার খুব সাধ আমার। কি বল কাঞ্চন?
মোটা ওই মহিলা রোহিণীর ছবির হিরোইন! ওই বিশাল চেহারার মেয়ে যদি নাচে পর্দা ফেটে যাবে। আর ওর কথায় একেবারে স্ - সামবাজারের স্-সসী বাবু মার্কা টানও রয়েছে।
সমীর অবাক হয়।
কিছু বলার নাই। তবে বেশ বুঝেছে আর কোথাও ছবি করার টাকা না পেয়ে রোহিণী ওই ভদ্রলোকের কাছে হাত পাততে বাধ্য হয়েছে।
শুনেছে ভদ্রলোকের নাকি তেলকল—হাওড়ার ওদিকে বড় ঢালাইএর কারখানা আরও কি সব দুনম্বরি ধান্দা আছে। টাকাও কামায় ভালো।
দোষের মধ্যে দোষ ওই মালার প্রতি বিশেষ দুর্বলতা। ওর গাড়ি বাড়ি মাসিক মোটা টাকা দিয়ে পুষে রেখেছে। এবার কাঞ্চনমালাকে ছবির হিরোইন করে নিজের একটা সাধ পূর্ণ করতে চায়।
কাঞ্চনমালাকে ডায়ালগ পড়াচ্ছে রোহিণী নিজেই।
ভদ্রমহিলা এক লাইন বলেই বলে—বড় খটমট কতা সব, অ ডাইরেক্টবাবু, একটু সোজা সোজা লিকুন মাইরী।
ভদ্রলোকও বলে ওঠে—তাই লিখে দ্যান মশাই—এত সব শক্ত শক্ত কথার কি

দরকার। ওরে কাঞ্চনকে 'কফি' দিতে বল। সহকারী পরিচালক ছুটে আসে—কফি? এখুনি ম্যাডামের জন্য কফি আনছি স্যার।

রোহিণী তখন সহজ কথার সন্ধান করছে।

সমীর বলে—তুমি কাজ করো। পরে একদিন দেখা করবো।

রোহিণীর তখন রীতিমতো কাহিল অবস্থা। হিরোইনের জন্য যুতসই ভাষা খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

ছবির জগতে আগে রুচিবান বিদগ্ধ পরিচালক, প্রযোজকরা আসতেন। তাঁরা বাংলা সাহিত্যের প্রতিভাবান লেখকদের লেখা থেকে ছবি করতেন। শিল্পী নির্বাচন করতেন নিজেরা চরিত্র উপযোগী করে। সেখানে কোন আপোশ করেননি। সুরেশবাবুকেও দেখেছে সমীর। সেখানে তিনি নিজেই সব। আরও অনেক পরিচালককে দেখেছে সমীর। তাদের কাজও দেখেছে।

তার তুলনায় রোহিণীর কাজ এর ব্যাপার দেখে দুঃখই পেয়েছে সে। রোহিণীর শিল্পীমন কিছু সত্যিকারের শিল্প সৃষ্টি করতেই চেয়েছিল, কিন্তু নানা চাপে পড়ে কিছু করার জন্য তাকে বহু আশেপাশেই করতে হয়েছে, এযেন এক শিল্পেরই অপমৃত্যু। আর একজন শিল্পীর অপমৃত্যুই এ নয়, এই ভাব, এই ধারা যদি সিনেমাজগতে অনুপ্রবেশ করে তাহলে সিনেমা শিল্পেরই সামগ্রিক সর্বনাশই ঘটবে। তখনও নিউথিয়েটার্স এর স্বর্ণযুগ চলেছে, দেবকী বসু—হেমচন্দ্র, প্রফুল্ল রায়—বিমল রায় প্রভৃতি পরিচালকদের পাশে নতুন এক প্রজন্ম উঠে আসছে, পাশাপাশি এই ধরনের বেনো জলও ঢুকছে।

সেদিন রোহিণীর সঙ্গে কথা বিশেষ হয়নি। রোহিণীই বলেছিল —সামনের সপ্তাহে একদিন এসো বাড়িতে। কথা হবে, অনেক আলোচনা আছে। আসতে পারবে সমী? এখন তো তুমি 'বিজি' অথর বড় বড় ডিরেক্টাররা তোমার গল্পের ছবি করছেন। সমীর বলে —যাবো।

রোহিণীর বাড়িতে এর আগে প্রায়ই যেতো সমীর। রোহিণী তখন চাকরি করতো। ঘনিষ্ঠতাও ছিল দুজনের, রোহিণীর বিয়েতেও বরযাত্রী গেছে, হৈ চৈ করেছে। রোহিণীর স্ত্রী উমাও তাকে চেনে—সমীর নতুন ঠিকানা দেখে একটু অবাক হয়, বলে সে —এসো কথা হবে।

ক'টা দিন সমীরের নানা কাজেই কেটে যায়। সুন্দরবনের জীবন নিয়ে লিখতে শুরু করেছে। তার সামনে কলকাতার এই জগৎ মুছে গেছে। রাত নামে, টেবিল ল্যাম্পের আলোটা জ্বলছে ছোট্ট একটা বৃত্তের মধ্যে, ওদিকে মৃগেন পরীক্ষার পড়া করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছে।

সেই সুন্দরী কেওড়া হেঁতাল বনের গভীরে কোন স্রোতের মধ্যে ডিঙ্গি নিয়ে চলেছে সমীর। খড়ি ওঠা গা - চুলগুলো উস্কোখুস্কো কোন বাওয়ালী তার জীবনের নিঃস্ব কাহিনী বর্ণনা করে চলেছে।

—প্যাটে ভাত নাই-পরনে বস্তর নাই, দুমুঠো অন্নির জন্যি পরান হাতে নিই। কোপে আসি বাবু! এহানে শুধু মরণ আর কান্না। বাওয়ালীদের বক্ষের পাণিতে গাং এর পানিও সোনা হই গেছে বাবু।

মনে পড়ে আদিম অরণ্যের অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া ভীত সন্ত্রস্ত মানুষের নৌকা বসতের দিন গুলো। জোনাকি জ্বলে। রাম-হরি আঁধারে হরিণের চোখ টলটল করে। কোথায় বণভূমি কাঁপিয়ে ওঠে মত্ত গর্জন। হিংস্র এক পাশবিক হুঙ্কার যেন সারা অরণ্যকে প্রকম্পিত করে তোলে। সেই আদিম অরণ্যে অস্তিত্বের কোন দামই নেই।

সমীর লিখে চলেছে বাদাবনের মানুষের কঠিন সংগ্রাম তাদের সুখ দুখ-আশা নিরাশার কাহিনী। তার সাহিত্যগুরু বিভূতিভূষণের কথা মনে পড়ে-যে জীবনকে দেখোনি, যে মানুষদের কাছে যেতে পারোনি, যাকে ভালোবাসতে পারোনি-তাদের না দেখা, অজানা জীবনের কথা লিখতে যেও না।

সমীরও তাই পথে পথে, গ্রামে-গ্রামান্তরে ঘোরে, যায় পর্বত অরণ্যে-সুন্দরবনে জীবনকে দেখতে। কয়লাখনি তাদের অঞ্চলেই। সেই কুলি ধাওড়ার জীবন-তাদের কাছ থেকে দেখেছে, তবু সে দিনের পর দিন বন্ডে সই করে ক্যাবল্যাম্প মাথায় সেঁটে কুলিসর্দারদের সঙ্গে মাটির অতলে দেড় দুহাজার ফিট নীচে নেমে মালকাটাদের কাজ—মৃত্যুপুরীতে তাদের লড়াইকে দেখে তবেই কয়লাখনি নিয়ে লিখেছে। সেই উপন্যাসও জনপ্রিয় হয়েছে।

ছিন্নমূল জীবনও তাকে অভিভূত করেছে। সুরেশবাবুর এই ছবির সাফল্যের পর সমীরের মনে হয়েছে সে যাবে দণ্ডকারণ্যের গভীরে যেখানে এই ছিন্নমূল মানুষরা লড়াই করে নতুন বসত গড়ছে। দণ্ডকারণ্যে যাবার জন্য-থাকার জন্য সেখানের কর্তৃপক্ষকেও লিখেছে।

একটা জাতিকে স্বাধীনতার নাম করে তাদের পিতৃপুরুষের ভিটে থেকে উৎখাত করে দেওয়া হল—লাখলাখ অসহায় মানুষ এখন নতুন এক সংগ্রামে রত। এই একটা জাতির এই বিপর্যয়ের কথা তাদের জীবন সংগ্রামের কথা একজন কথাশিল্পী হিসাবেই তুলে ধরবে সে। নতুন দেশ আমেরিকায় তখন সারা ইউরোপ এর বিভিন্ন দেশ থেকে হাজার হাজার মানুষ নতুন জীবনের সন্ধানে গিয়েছিল আমেরিকার বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে।

তখনও সেই বিস্তীর্ণ অঞ্চল অনাবিষ্কৃত, গহন শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে আবৃত। রেডইন্ডিয়ানরা ওখানে আদিবাসী, কিছু অঞ্চলে তাদেরই আধিপত্য। ওই অরণ্য পর্বতে সেই ছিন্নমূল মানুষের দল বিজাতীয় পরিবেশে নতুন জীবন গড়েছিল বহু সংগ্রাম-কঠিন পরিশ্রম করে।

বিদেশী সাহিত্যে সেই সংগ্রামের কথা অমর হয়ে আছে পিলগ্রিমেজ, গ্রোথ অব দি সয়েল, ইমিগ্রাস্টস্-গ্রেপস্ অব র‍্যাথ' নানা উপন্যাস রচিত হয়েছে। সমীরও এই জীবনকে তাই প্রত্যক্ষ করতে চায়, লিখতে চায়।

রাত বেড়ে ওঠে। হঠাৎ কার ডাকে চাইল। ওপরের মাসিমা বাসন্তীদেবীর রাতে ঠিক ঘুম হয় না। নীচে আলো জ্বলতে দেখে নেমে এসে দেখে সমীর লিখে চলেছে। ওদিকে সদ্য লেখা পাতাগুলো। বাসন্তীদেবী অবাক হয়—রাত ভোরই লেখ নাকি সমীর?

—মাসিমা। সমীর চাইল।

বাসন্তীদেবী বলে—না—না, এসব ভালো নয় সমীর। প্রায়ই দেখি তোমার ঘরে আলো জ্বলে অনেক রাত অবধি। দিন ভোর কাজ, চাকরি রাতে ঘুমুবে না? শুয়ে পড়ো।

সমীর দেখে রাত প্রায় দুটো বাজে। বলে সে,

—আপনি যান মাসিমা, শুয়ে পড়ুন আমিও শুচ্ছি।

বুড়ি তখনও গজগজ করে—এসব ভালো বুঝি না বাপু। এত কি কাজ! সমীর ওই মাতৃসমা মহিলাকে ভয়ও করে ভক্তিও করে। সমীরকে উনি বকাঝকাও করেন।

সমীর সেদিনের কথামত রোহিণীর বাসাতেই গেছে। টালিগঞ্জ ট্রাম ডিপোর সামনে তখন সারসার দেওয়া গাছে এসেছে নতুন পাতার সাজ।

টালিগঞ্জের ওদিকে আগে ছিল বিস্তীর্ণ জলাভূমি, যাদবপুরের সীমানা অবধি বিস্তৃত হোগলা বন, জলাভূমি, মাঠ-দু'একটা আমবাগান। এদিকেও গড়িয়া যাবার রাস্তা খালধার অবধি ফাঁকা, ঝোপ জঙ্গল।

ক্রমশ ওইসব জায়গাতেই এসে বসত গড়ছে ছিন্নমূল হাজার হাজার মানুষের দল। বড় বড় কলোনি গড়ে উঠছে। ঝুপড়ি-দরমার ঘর। এদিক ওদিকে পুরনো কিছু বসতিও হয়েছে। তাদেরও রূপ বদলাচ্ছে এবার। ক্রমশ লোকসমাগম বাড়ছে, ভিড়ও। পথের ধারে এখন দোকান-পশারও হচ্ছে। ওদিকে কিছুটা গিয়ে একটা আধা বস্তি মত এলাকা। একতলা জীর্ণ বাড়িও দুচারখান রয়েছে-কিছু দেওয়াল ইটের, উপরে টিন। এমনি ঘরেরও অভাব নাই।

ঠিকানা খুঁজে একটা ওই রকম বাড়িতে গেছে সমীর। বারোঘর এক উঠানের বাড়ি। উঠানের তিনদিকে টানা বারান্দাওয়ালা খোপ খোপ ঘর—মাঝে ওই উঠান, ওদিকে বোধহয় রান্নার চালা-একদিকে বাথরুম কয়েকটা, দরজাও সবগুলোর নাই। চটের পুরু পর্দা ঝুলছে।

ওদিকের বারান্দায় রোহিণীর স্ত্রী উমা বসে কি বুনছে। বৈকালের মুখ। রোদের প্রবেশ ওইখানেই। উমাই সমীরকে দেখে বলে,

—আপনি। আসুন, আসুন।

সমীর দেখছে এই পরিবেশ। আশপাশের ঘর থেকে দু'একজন কৌতূহলী চাহনি মেলে দেখে সরে গেল।

সমীর শুধোয়—রোহিণী নাই?

—দোকানে গেছে। এখুনি এসে পড়বে। বসুন।

সমীর বসলো। সমীর রোহিণীদের বাড়িতে গেছে বহুবার, সমৃদ্ধ-পরিবার। শহরের উপকণ্ঠে বেশ কিছুটা জায়গা নিয়ে ওদের বেশ বড় দোতলা বাড়ি। সামনে পিছনে বাগানও রয়েছে সেই পরিবেশের সঙ্গে এর কোন মিলই নাই।

উমা বলে—অনেক দিন পর এলেন। ভালো আছেন তো? তা কোথায় বাসা করেছেন? মিসেসকে আনলেন না কেন?

সমীর বলে—বৌঠান একসঙ্গে হাফডজন প্রশ্ন করলে কোনটার উত্তর দেবো।

—এক এক করে দিন। উমা বলে ওঠে।

সমীর বলে—বিয়ে করেছি, করেছি নয়, হয়ে গেছে, আর তিনি এখন দেশের বাড়িতে।

উমা বলে—এখন তো অনেক লিখছেন দেখি। নানা পত্র-পত্রিকাতেও লেখা বের হচ্ছে-লাইব্রেরিতেও দেখি অনেক বই আপনার। সেদিনই একটা বই পড়লাম। আপনার গল্প নিয়ে তো দারুণ ছবিও হয়েছে, দেখেছি—খুব ভালো লাগলো।

সমীর বলে--চলছে লেখালেখি।

—চাকরিও করছেন তো? উমা শুধোয়।

—হ্যাঁ, ওটা এখনও রেখেছি।

উমা আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিল, এসে পড়ে রোহিণী। হাতে বাজারপত্র। সমীর বলে,

—বৌঠান, এই ভয়েই সংসার পাতিনি এখানে। ওই মুদিখানার মালের হিসাবপত্র আমার দ্বারা হবে না। রোহিণী বলে—আমিও কি করেছি? বাঁচার তাগিদে কবিকেও মুদিখানার ফর্দ করতে হচ্ছে। রজনীগন্ধার চচ্চড়ি-চাঁদের আলোর সরবৎ খেয়ে তো বাঁচা যায় না।

উমা চা নিয়ে আসে। সমীর শুধোয় রোহিণীকে,

—তোমার ছবির শ্যুটিং আর কত বাকি?

রোহিণী বলে—প্রযোজক পাওয়াই মুশকিল। একজন কিছুটা করে সরে গেল আবার বসে রইলাম। তারপর চেষ্টাচরিত্র করে একে পেয়েছি। এর আবদার রাখতেই প্রাণান্ত। কিছুই বোঝে না-যা তা বলে। এটা কোন রকমে শেষ করতে পারলে বাঁচি।

রোহিণী বলে—নতুন একটা আইডিয়া নিয়ে লিখছি অন্য একটা গল্প। চিত্রনাট্যও করছি। একজন প্রযোজককে গল্পটা শুনিয়েছি। তার খুবই পছন্দ হয়েছে। এটার কাজ শুরু করতে পারলে এবার একটা দারুণ ছবিই করবো। একেবারে নতুন অ্যাঙ্গেল।

সমীর শুনছে ওর কথা। এখনও স্বপ্নের জগতেই রয়েছে রোহিণী। সমীর বলে—গানটান লিখছ? ওইটাই তোমার আসল কাজ। ওই গান যা লিখেছো সেগুলোরই কিছু টিকে থাকবে। গান লেখো।

উমা বলে—তাই বলুন আপনার বন্ধুকে, আমি তো বলেও পারি না। বলে এখন আমি নিজেই একজন ডিরেক্টর। অন্য কোনও ডিরেক্টারকে বলি কি করে—তোমার ছবিতে গান লিখবো?

সমীর জানে রোহিণীর আত্মসম্মান জ্ঞান একটু বেশিই। তবু বলে সমীর—তুমি ডিরেক্টার তোমার ছবির। অন্য ছবির ডিরেক্টরকে গান নিয়ে কথা বলতে কেন বাধবে। তুমি সেখানে গীতিকার। তাছাড়া রেকর্ডের জন্য গান তো লিখতে পারো? সেখানে তোমার গান সুরকাররা নিশ্চয়ই নেবেন।

রোহিণী বলে—গানের জ্যন কত আর দেয়?

—টাকার জন্যই কি গান লিখতে তুমি? সেদিন লেখার আনন্দেই লেখেছো—সৃষ্টি করেছো, সেই আনন্দ কি কম?

রোহিণী চুপ করে থাকে। সন্ধ্যা নামছে।

উমা বলে—তোমরা কথা বল আমি একটু পার্ক থেকে ঘুরে আসি। দিন ভোর এই ঘরে আটকে থাকতে পারি না।

উমা চলে যায়। এবার শুধোয়—বাড়ি থেকে চলে এলে কেন? বাবার কথাও ভাববে তো?

রোহিণী বলে—বাবা ওই সিনেমার কাজকে সমর্থন করেন না। বলেন —লিখছ লেখো। ওইসব বাউন্ডুলেপানা এখানে চলবে না।

সিনেমার ব্যাপারে ঘোরাঘুরি করছে রোহিণী প্রযোজকের সন্ধান। বাড়ি ফেরার ঠিক ঠিকানা নাই।

নিজের লেখার মত মানসিক অবস্থাও নাই। তার অনেক পাওয়ার স্বপ্ন তার চিন্তা জগতে আলোড়ন তুলেছে। এখন গান লেখার সেই মানসিকতাও আর নেই।

সমীর বুঝেছে রোহিণী খুব ভালো অবস্থার মধ্যে নেই। এভাবে থাকার কথাও তার নয়। শিল্পীসত্তাকে ছাপিয়ে আরও অনেক কিছু পাবার স্বপ্নই তাকে ডিরেক্টার হবার পথে এনেছে।

গাড়ি-বাড়ি-বহুলোকের স্তাবকতা যা একজন সফল ডিরেক্টারকে ঘিরে থাকে সেইটাই প্রলুব্ধ করেছিল রোহিণীকে এই ঝুঁকি নিতে।

আজও সেই স্বপ্নই দেখে চলেছে সে। সমীরের কষ্ট হয় উমার জন্য। স্বামীর পথেই চলতে বাধ্য হয়েছে সে। বাড়ির বিলাস-ব্যসন ছেড়ে স্বামীর সঙ্গে এই আধা বস্তিতে এসে রয়েছে। দৈনন্দিন জীবনযাত্রার কঠিন লড়াইএ সামিল হয়েছে।

ওই মেয়েটিকে শ্রদ্ধা করে সমীর, রোহিণীর ছবি শেষ হোক—নতুন ছবির কাজ শুরু করুক খুশিই হবে সমীর।

রোহিণী ওকে এগিয়ে দিতে আসছে। সমীর বলে—রোহিণী জীবনের লড়াই-এ হার মানবে না। দেখবে একদিন ঠিক পথ পাবেই।

রোহিণী বলে—সেই স্বপ্ন আজও দেখি।

—তা দ্যাখো, কিন্তু মূলত তুমি কবি, গীতিকার। গান লেখা ছেড়ো না। রোহিণী নীরব থাকে। তার মুখে চোখে যেন কি বেদনার ছায়া ফুটে ওঠে। নিজেও দেখেছে এই সিনেমার ঝড় তার মনের সেই সুরগুলোকে কেমন এলোমেলো করে দিয়েছে।

সমীরও ভেবেছে কথাটা। সে কোনদিন গাড়ি-বাড়ির স্বপ্ন দেখে না। গ্রামের মানুষ সে, শহরে পড়ে আছে প্রয়োজনে। কোন মোহ-লোভ তার নেই। বেশি কিছু পাবার জন্য সে সংগ্রাম করে না। যেটুকু সহজে স্বাভাবিক ভাবে আসে তাই নিয়েই খুশি থাকতে চায় সে।

ওই জীবনে অনেক কিছু হারাবার বেদনাও তাকে ম্রিয়মান করে তোলেনি। সেই বেদনাকেও সে সহজভাবেই মেনে নেবার চেষ্টাই করেছে।

সিনেমায় তার গল্প যায়—চিত্রনাট্যও লিখছে কিন্তু ওই পর্যন্তই। সে বিশ্বাস করে মূলত সে সাহিত্যিকই। তাই সাহিত্য সৃষ্টিই তার ধর্ম। তারজন্য প্রচুর অর্থের সন্ধান নাই। এর মধ্যে সারান্দা ঘুরে এসেছে। বিভূতিভূষণের সাহিত্যে সারান্দা এসেছে বারবার।

সমীর তার দু'একজন অফিসের অরণ্যপ্রেমী বন্ধুদের নিয়েই সারান্দার অরণ্যভূমিতে গেছে। চাঁইবাসার ডি-এফ-ও অফিস থেকে অলকাবাদ বনবাংলোয় থাকার অনুমতিও মিলেছিল।

সেখানে গিয়ে দেখা হয়েছিল একটি তরুণের সঙ্গে, কলকাতার ছেলে। বিষ্টু দত্তের বাবা কাকার ওখানে মেকানিক্যাল রিপেয়ারিং এর কারখানা। চারিদিকে আয়রন ওর মাইনস-তারই যন্ত্রপাতি তৈরি, সারাই এসব করে তারা।

বিষ্টু দত্ত বিরাট শিকারী। অরণ্যপ্রেমী। বনের হাতি 'রোগ' হয়ে গেলে সে তখন বনের

শত্রু হয়ে ওঠে। বাইসন দলছুট হয়ে পাগলা হয়ে গেলে সে হয়ে ওঠে মৃত্যুদূত। বিষ্টু দত্ত বনের আদিবাসীদের ওদের আক্রমণ থেকে বাঁচাবার জন্য তাদের মেরে ফেলে নিদারুণ ঝুঁকি নিয়ে। মানুষখেকো বাঘের উপদ্রবে অসহায় আদিবাসীদের সেইই বাঁচায়। তাই ওরা বলে মারাং শিকারী। অনর্গল আদিবাসীদের মুণ্ডারি ভাষাতেই কথা বলে। আর এক শহরে মুণ্ডা-সে বনের মধ্যে বাতাসে গন্ধ শুঁকে বন্যপ্রাণীর সন্ধান পায়।

হালকা চালের ঠুংরি তো ওই দিকের শালবন যেন সাতাশ পাহাড়ের দেশ-এক আদিম অরণ্যভূমি এই সারান্দা এদিকে শালবন যদি গুরুগম্ভীর ধ্রুপদ।

বিশাল গুড়ি -সোজা উঠে গেছে। গাছগুলো এক-দেড় ফিট অবধি। এখ'নের অরণ্যে সব গাছ বাঁচার জন্য সোজা উর্ধ্বাকাশে উঠে যায়-আমগাছ নয় যেন দেবদারু। বুনো আমের গাছ ময়-এদের আমদারু বললেই যেন ঠিক নামকরণ করা হয়।

হাতি-বাইসন-সম্বর-হরিণ-বন্যকুকুর সবই আছে এখানে। বাংলোর আশপাশেও দেখা যায় তাদের। ওই অরণ্যেও মানুষ বাস করে। সভ্যজগতের বাইরে তারা তাদের নিজের জগৎ নিয়েই তৃপ্ত রয়েছে।

সমীর অলকাবাদ বাংলোর চাতালে বসে থাকে-চারিদিকে উঁচু গভীর বন ঢাকা পাহাড়। সকাল-দুপুর-বৈকাল-রাত্রে এর এক এক রূপ। পাখির ডাক ভরা বাতাস-নীচে ঝোরার শব্দ মিশেছে ওই সুরে, বাতাসে নাম না জানা কত ফুলের সুবাস।

রহস্যময়তা নিয়ে নামে রাত্রি।

কোথায় একটা জন্তুর ডাক শোনা যায়, বাংলোর জানলা থেকে দেখে হরিণগুলো এসেছে, এদের ডাগর চোখের চাহনিতেই যেন নীরব কোন কবিতা। অরণ্যের আঁধার ভরে উঠেছে জোনাকির ভিড়ে।

ওই আদিবাসী বস্তিতে হাটও বসে। বনের দূর দুরান্ত থেকে আসে হাটের লোকজন-মেয়ে, পুরুষ বেসাতি নিয়ে। সেজেগুজে আসে ওরা দূর-দূরান্ত থেকে। হাটই তাদের মিলন ক্ষেত্র, হাটই তাদের সুখ দুঃখ এর কথা বলার ঠাঁইরাগ অনুরাগের বিকাশক্ষেত্র।

মাদল বাঁশির সুর ওঠে। নেচে গেয়ে ওরা জীবনের সব লোভ-মোহ-জটিলতাকে উড়িয়ে দিতে পারে।

কিন্তু এদের শান্তজীবনে তবু সভ্য মানুষের থাবা এসে পড়েছে। তারাই এদের চোরা শিকার করে বন্যজন্তু মারতে বলে-তারাই এদের দিয়ে বনের দামী গাছ কাটিয়ে লাখ লাখ টাকা মুনাফা করে। এদের সহজ সরল জীবনে তারাই এনেছে লোভ-কামনার কদর্যতা। এরাই অরণ্যভূমিকে শেষ করে মানব সভ্যতাকেই বিপন্ন করতে চায়।

সমীর দেখছে এই জীবনকে, এদের সুখ দুঃখকেও—এদের মধ্যে সদ্য জাগর এই লালসাকেও।

সুন্দরবনে এখনও সে তো যাতায়াত করে। সেই অরণ্যভূমিকেও দেখেছে সে। সারান্দার অরণ্যের চরিত্র আলাদা। এ অরণ্যে মানুষ খাবার মত ফল পায়-তৃষ্ণায় পানীয় পায় অনেক ঝরণা থাকে। সুন্দরবনে সে সব কিছুই নাই। সে অরণ্য প্রাণঘাতী এক জগৎ।

সমীর ওখান থেকে ফিরে বাড়ি এসেছে। মা মেজভাই প্রবীরের বিয়ের ঠিক করেছেন।

সমীর মত দিলেই বিয়ে হবে। তাই মা বলে—তুই একবার মেয়েটিকে দেখে আয় বাবা।

ছোটভাই সুবীর এখন দুর্গাপুরে চাকরি করে। একটা মোটরবাইকও কিনেছে। সেইই বলে—তাই চলো দাদা। পলাশডাঙা তো এইটুকু পথ একেবারে উড়িয়ে নিয়ে যাবো- বৈকালেই ফিরে আসবে।

সমীর বলে—উড়ে গিয়ে কাজ নাই। আস্তে যাবি তো তোর পিছনে উঠবো না হলে নেই।

মা বলে—তাই বল। ওই এক মোটরবাইক কিনেছে, আমার ভয় হয় বাবা।

সুবীর বলে—মায়ের কথা ছাড়ো তো তো দাদা। চলো।

প্রবীরের বিয়ের কথা পাকাপাকিই হয়ে গেছে পলাশডাঙায়। মেয়েটি মাধ্যমিক পাশ—দেখতে শুনতেও ভালো।

প্রভাদেবীর আজ স্বামীর কথা মনে পড়ে। বিদেশেই তাকে রেখে এসেছে ওরা চিরদিনের মত, আর ঘরে ফেরেনি। প্রভাদেবী নাবালক ছেলে মেয়েদের নিয়ে এখানে এসেছিল শূন্যহাতে সব হারিয়ে।

বহু কষ্টে করে আজ পায়ের তলে মাটি পেয়েছে তারা। সমীর সংসারের হাল ধরেছে, প্রবীরও এখন রোজগার করছে, ছোট্ট সুবীর আজ ভালো চাকরি করছে। প্রবীরকে সংসারী করবে এবার। বিয়ের আয়োজন চলছে। মিনাও এসেছে শ্বশুরবাড়ি থেকে।

সমীর সেদিন বাড়িতে রয়েছে। হঠাৎ ওদিক জেঠিমার ঘর থেকে চিৎকার শোনা যায়। দেবেন গর্জন করছে, জেঠিমার গলাও শোনা যায়।

তারপরেই ওঠে কিসের শব্দ আর জেঠিমার আর্তনাদ ওঠে—মেরে ফেললো রে। ওরে মারিস না-ওরে দেবা-

—চোপ। খুন করে ফেলবো। দেবেনের গলা সপ্তমে উঠেছে সেই সঙ্গে এবার দেবেনের বউএর গলাও শোনা যায়।

—ডাইনী বুড়ির এত বড় সাহস। ঝেঁটিয়ে মুখ ভেঙে দেবো।

—তাই দেব, দেবেনও সায় দেয়।

শব্দ ওঠে, কি যেন ছিটকে পড়লো, আর্তনাদ ওঠে মালতীর।

পারুল রান্না করছিল দাওয়ায় বের হয়ে আসে-প্রভাও উৎকীর্ণ হয়ে বলে বা দেবা কি দিদিকে মারধর করছে?

ওদিক থেকে আর্তনাদ ওঠে জেঠিমার—ওরে মারিস না-দেবা—

সমীর এর আগে শুনেছে দেবেনের কীর্তির কথা। জেঠিমাকে আলাদা করে দিয়েছে বৌএর কথায়, তার উপর অত্যাচারও করে। আজ এই বীরত্ব দেখে সমীরই উঠে যায়।

প্রভাও দেবেনের এই অত্যাচারের খবর জানে। বড়দিকে সে দূর করেই দিয়েছে। এবার মারধরও করছে। সমীরকে শুধোয় প্রভা,

—কোথায় যাচ্ছিস?

—আসছি।

সমীর এসে দেখে দেবেনের বৌ এর হাতে উদ্যত ঝাঁটা আর দেবেন একটা গরু তাড়ানো পাঁচন নিয়ে বেশ কয়েক ঘাই বসিয়েছে মায়ের পিঠে।

মাটিতে পড়ে কাতরাচ্ছে মালতী। সমীর গিয়ে দেবেনের হাত থেকে পাঁচনটা কেড়ে

নিতে দেবেন চাইল। মালতী এবার সমীরকে দেখে বলে ওঠে আর্তকণ্ঠে।

—বাবা সমীর, ওই মানসুরে আমাকে শেষ করে দেবে।

আধপেটা খেতেও দেয় না, দুজনে মিলে মারে—অনেক পাপ করেছি-ওই কুলাঙ্গারের জন্য, এ তারই প্রায়শ্চিত্তির, বাঁচা বাবা—

দেবেন গর্জে ওঠে—শেষ করে দোব। আপদ দূর করবো। সমীর বলে —তাই বলে এই ভাবে মারবি?

দেবেন জানায় —আমার বাড়িতে যা খুশি করবো, তুমি বলার কে? খেতে পরতে দাও ওই আপদকে? আমার বাড়িতে পা দেবে না।

সমীর বলে —তুই তাই বলে মারবি মাকে—কেউ কিছু বলবে না? আর তোর বাড়ি এটা নয়।

—মানে? তোমাকেও ঘাড় ধরে বের করে দিতে পারি তা জানো?

দেবেনের বৌও ধুয়ো ধরে—বাড়ি বয়ে এসে অপমান করবে?

সমীর বলে—তোমরা এত বড় অন্যায় করবে, বৌদিকে তাড়িয়েছিস দেবেন, এবার মাকেও তাড়াতে চাস।

—তাই, একজনকে তো নিয়ে গেছো, যাও এটাকে নিয়ে। দেবেন তড়পাতে থাকে। গ্রামের অনেকেই জুটে গেছে। সমীর বলে,

—এখানেই থাকবেন ওঁরা। সেই ব্যবস্থাই করছি এবার। এতদিন করিনি—তুইই বাধ্য করলি।

মালতী তখনও কাঁদছে।

—একটা কিছু কর বাবা, তোর কাছেও কিছু কওয়ার মুখ নাই আমার, জীবনের শেষ ক'টা দিন একটু শান্তিতে থাকতে দে—ভগবান তোর ভালো করবেন।

প্রভাও এসেছে এতদিন পর এই বাড়িতে, পারুলও। এর মধ্যে পারুলকে ওবাড়িতে থেকে জল সরবৎও আনতে বলে প্রভা।

মালতী আজ প্রভাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে।

—তোকেও অনেক কষ্ট দিইছি ওই শয়তানটার জন্য—রমু থাকলে এমনি হাল হতো না রে। রমেন কোনদিন কষ্ট দেয়নি আমাকে—তাকেই আমি মা হয়েও দেখিনি। তাই অভিমানে চলে গেছে সে।

মালতী আজ নিজের সেই ভুলগুলোর জন্য অনুতপ্ত। দেবেন গর্জায় —দেখে নেবো কার কত মুরোদ।

পারুলের মামলার ডিগ্রিটা পেয়েও সমীর কোন কিছু করেনি। পারুলকে আদালত এই সম্পত্তির অর্ধেকের মালিক বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। তবু সমীর পারুল বৌদিকে তার ওখানেই রেখেছিল, দেবেনের সম্পত্তির ভাগও চায়নি।

কিন্তু জেঠিমার উপর এই অত্যাচারের বিহিত সে এবার করবে।

সারা গ্রামের মানুষ দেবেনের উপর চটা। তারপর মায়ের উপর, পারুলের উপর তার অত্যাচারের কথা তারা জানে। আজ দেখেছে মাকে পিটছে সে পাঁচন দিয়ে।

তারা খুশি হয়নি। সমীরও এবার গ্রামের মাতব্বরদের সন্ধ্যায় হরির আটচালায় ডেকে এনেছে। বিভূতিবাবু, শরৎ চাটুয্যে-নরু ভটচায-অন্যরাও রয়েছে। মণি মুখুয্যে আগে থেকেই হুকোটা দখল করে আসর জাঁকিয়ে বসেছে।

দেবেনকেও ডাকা হয়েছে। দেবেন প্রথমে ভেবেছিল যাবে না কিন্তু মনু মুখুয্যে ইদানীং তার পরামর্শদাতা। সে বলে,

—পঞ্চ জনের ডাক, অমান্যি করিস না দেবু। আয়-তারপর ভাবা যাবে কী করবি।

দেবেনও এসেছে। মণি মুখুয্যের পাশেই সে মুখ গোঁজ করে বসে আছে। সমীর আদালতের ডিগ্রির নকলটা এনে শোনায় সকলকে। সারা আটচালা স্তব্ধ।

সমীর বলে—এতদিন আমি বৌদিকে তার সম্পত্তির ভাগ নিতে দিই নি, জেঠিমার মুখ চেয়ে।

একেবারে আদালতের রায়, একে অমান্য করা যাবে না। আর গ্রামের বেশ কিছু প্রবীণ মানুষও জানেন সমীর ওই সম্পত্তি নিজেও কেনে নি। বৌদির হাতেই রেখেছে।

শরৎ ভটচায বলে—এতো আদালতের রায় হে—সেইমত বাটোয়ারা করাই কর্তব্য।

মণি মুখুয্যে বলে দেবেনের অর্ধেক বিষয় চলে যাবে? বিভূতিবাবু বলেন —আদালত যখন একথা বলেছে, তখন আমাদের বলার কিছু নাই।

দেবেন তবু গর্জায়—নেহি দেঙ্গে।

বিভূতিবাবু বলেন—দেবেন সব জায়গায় ওই বীরত্ব দেখাতে যাস্ নে। আদালত থেকে আমিন এসে বাটোয়ারা করে দেবে, আর তার খরচও তোকেও অর্ধেক দিতে হবে। সেটাই জলে যাবে তোর।

দেবেন বলে—আপিল করবো।

মণি মুখুয্যে আইন জানে, সেও বলেছিল দেবেনকে আপিল করতে। আর তারও কিছু আমদানি হতো। কিন্তু দেবেন তা করেনি।

বিভূতিবাবু রায়টা দেখে বলেন,

—তারও সময় চলে গেছে। এখন করার কিছুই নাই। মনু মুখুয্যেও বলে —হলো তো দেবা, তখন বলেছিলাম, গাজোয়ারি করে কথা শুনিসনি, এখন বোঝ ঠ্যালা।

শরৎ ভটচায বলে জমিজমার দাগ-খতিয়ান নম্বর, বাড়ির খতেন নম্বর সবই আছে এই রায়ের কপিতে, সেই হিসাবেই বাটোয়ারা হবে।

বিভূতিবাবু বলেন —তাই ভালো। ওরা শাশুড়ি বৌ এ বাইরের বাড়িতেই থাকবে।

মালতীকে প্রভা তার বাড়িতে এনে খাইয়েছে। আজ পারুলও দেখেছে সেই তেজী শাশুড়ির অন্যরূপ, তার মনে হয় এই সংসারই যেন পরীক্ষার ক্ষেত্র। সব ন্যায় অন্যায় যা করে মানুষ এই সংসারেই তার বিচার হয়ে যায়, শাস্তির বিধানও হয়।

তার উপর ওই শাশুড়ি কম অত্যাচার করেনি। ওদের অবহেলার জন্যই তার স্বামী-সন্তান গেছে। আজ করালীর এখানে আর ঠাঁই হয়নি। তাকে চলে যেতে হয়েছে। আর শাশুড়ির অবস্থা সে নিজের চোখেই দেখেছে। পারুল আজ সমীর-কাকীমার কাছে কৃতজ্ঞ। তারা তাকে ঠাঁই দিয়েছে-শাশুড়ির পায়ের তলে মাটিটুকুও নাই।

মালতীর চোখে জল। পারুলকে বলে—তোকেও কম কষ্ট দিই নি, ভগবান তার শাস্তিই দিচ্ছেন রে। শেষ বয়সে না ভিক্ষে করে দিন চালাতে হয় গাছতলায় পড়ে। রমেন নাই-আমি কাঞ্চন ফেলে কাঁচ কুড়াতে গেছলাম রে-

সমীর ফিরে আসে গ্রামের বৈঠকের পর। মালতী বসে আছে। প্রভা বলে—কী হল সমীর? দিদির ব্যবস্থা কিছু হলো?

সমীর বলে—হয়েছে মা।

মালতী চাইল। পারুলও। সমীর বলে,

—বড় বৌদি, ওই সম্পত্তির তুমি অর্দ্ধেকের মালিক। কাল থেকেই সব জমি বিষয় আসয়ের ভাগ বন্টন শুরু হবে। বাইরের বাড়ি পাবে তোমরা। অর্দ্ধেক জমি জায়গাও। তুমিই জেঠিমাকে নিয়ে ওখানে থাকবে। জেঠিমার দায়িত্ব তোমার। অবশ্য আমি-প্রবীর-মা তো আছিই। এবার নিজের ঘরে নিজের নিয়েই থাকবে তোমরা। সেই ব্যবস্থাই করছি।

মালতীর চোখ জলে ভরে ওঠে। বলে সে,

—বাঁচালি বাবা। তোর সোনার দোত-কলম হোক। দুটো অনাথা বিধবার বাঁচার ব্যবস্থা করে দিলি বাবা।

পারুলও খুশি হয়। তবু স্বামীর ভিটেতে স্বামীর খেয়ে পরেই থাকতে পারবে এবার। শত হোক-এখানে পরের বাড়িই। বড়বৌ সীমা তাকে ভালোবাসে—নতুন বৌ আসছে। সে কেমন চোখে তাকে দেখবে কে জানে।

তাই এই ব্যবস্থাকেই ভালো লাগে তার।

প্রভা বলে —দেবেন কিছু বলবে না?

সমীর বলে—তার বলার মুখ এবার বন্ধ করে দিয়েছি মা। এতদিন এটা করতে চাইনি। কিন্তু আর না করে পারলাম না।

ক'দিনের মধ্যেই পারুল বৌদির বাড়ি জমি-জায়গা দখলের ব্যবস্থা হয়ে গেল। বাইরের বাড়িটার কিছু সংস্কার করে ওরা শাশুড়ি বৌ এখন ওখানেই থাকে। অবশ্য পারুল এবাড়িতেও আসে মালতীও প্রভাকে এখন নতুন করে চিনেছে।

প্রবীরের বিয়ে থা হয়ে গেছে। নতুন বৌ রেখা এবাড়িতে এসেছে।

শ্যামলীর কলেজের এখন ছুটি। সেও বাড়ি এসেছে। ক'দিন শ্যামলীও হৈচৈ করে বিয়েতে। সেও বরযাত্রী যায় সীমাদের সঙ্গে।

বিয়ের হই চই চুকতে এবার শ্যামলীই সেদিন প্রভাকে বলে,

—মাসিমা, এবার সমীরদাকে কলকাতায় বাসা করতে বলো। সীমাও কথাটা ভেবেছে। এখন বাড়িতে নতুন বৌ রেখা এসেছে। প্রভাদেবীও কথাটা এবার ভাবেন।

শ্যামলী বলে—দিনরাত বেচারা খাটে, রাত জেগেও কাজ করে। অফিস ছাড়াও স্টুডিওতে যেতে হয়।

শরীরের দিকে নজর নেই। সীমাকে এবার কলকাতা পাঠান। ওর একটা কড়া পাহারাদার চাই।

সমীর বলে—তা তো যাবে। কিন্তু বাসাপত্র দেখতে হবে তো? শ্যামলী বলে —

কেন, কলকাতার মাসিমাই তো বলেছেন-পিছনের দুটো ঘরও ছেড়ে দেবেন, আর তোমার বন্ধু সেই মৃগেনবাবু তো প্রমোশন পেয়ে পাটনা চলে যাচ্ছেন, তোমাদের দুটো ঘরই তো পাবে এবার।

প্রভা বলে—চেনাশোনা বাড়িওয়ালী, শ্যামলীও আসা যাওয়া করতে পারবে। তাহলে ওখানেই কথা বলে বাসার ঠিক করে জানা-প্রবীর সুবীর কেউ বউমাকে ওখানে পৌঁছে দেবে। এখন এখানে তো মেজবৌমা রইল, আর কতদিন মেসে হোটেলে খাবি। শ্যামলী ঠিকই বলেছে। বৌমা যাক কলকাতায়।

সমীর কথাটা ভাবছে।

শ্যামলী ফিরছে বাড়ির দিকে। সমীরও আসছে। সেই মন্দিরতলাটা এখনও তেমনিই গাছ-গাছালি ঘেরাই রয়ে গেছে। দেবস্থানে গাছ কেউ ভয়েই হোক আর ভক্তিতেই হোক কাটে না। তাই জায়গাটা বেশ ছমছমে রয়ে গেছে।

সমীর বলে শ্যামলীকে—এবার কলকাতায় শান্তিতে কাজ নিয়ে থাকতাম সেটা কি ঘুচিয়ে দেবে?

শ্যামলী চাইল, বেশ খুশিই বোধহয় তাকে। বলে সে,

—কেন?

সীমাকে কলকাতায় নিয়ে যাবার প্ল্যানটা নিশ্চয়ই তোমার? এখন কাজ তো বাড়বে।

শ্যামলী বলে—এই সংসার কর্মটাও কাজ মশাই, এটার মধ্যে থেকেই কাজ করতে হবে। সীমা কি চিরকাল দূরেই পড়ে থাকবে। তাছাড়া আমারও দরকার ছিল সীমাকে ওখানে নিয়ে যাবার।

—কেন?

শ্যামলী বলে —তবু একটা গল্প করার লোক তো পাবো। দিনরাত পড়া আর কলেজ ভালো লাগে না।

সমীর বলে—তার চেয়ে দেখেশুনে কোন অধ্যাপককে বিয়ে-থা করো। সংসার ধর্ম পালন করাও একটা কাজ।

সমীরের কথায় শ্যামলী বলে,

—প্রফেসরকে বিয়ে? ওরে বাবা তারা আমাকেই লেকচার দিতে শুরু করবে। কাজ নেই বাবা—বেশ আছি। শ্যামলী যেন কথাটা এড়িয়ে যায়।

বৈকাল নামছে। পশ্চিমের দিগন্তসীমার মহুয়াবনের আড়ালে সূর্য তখন বিদায়ী করুণ আলোর আভায় আকাশ বেদনাতুর করে তুলেছে।

সমীর বলে—আমার কথার জবাব দিলে না কিন্তু।

শ্যামলীর সুন্দর মুখে সেই বিদায়ী আলোর অরুণ আভা। শ্যামলী বলে—সব কথার জবাব মেলে না।

সমীর চুপ করে যায়। মনে হয় শ্যামলী নীরবে যেন তার মনের একটা যন্ত্রণাকেই চেপে যেতে চাইছে। যা সম্ভব নয়—যা অতীত তাই নিয়ে শ্যামলী আর ভাবতে চায় না। বরং বর্তমানকে মেনে নিয়েই চলতে চায়।

শ্যামলী বলে—কবে কলকাতা ফিরছো। ওদিকে গিয়ে সব ব্যবস্থা করতে হবে তো?

সমীর বলে,

—তুমিও চলো। তারপর ওসব ব্যবস্থা করা যাবে।

মৃগেন পরীক্ষায় পাশ করে পাটনাতে পোস্টিং পেয়ে চলে যাচ্ছে। জগন্নাথ আগেই গেছে নিজেই বাসা করে। এতদিন মৃগেন ছিল সেও চলে যাচ্ছে। মেসের সেই অধ্যায়ের একজন তবু এতদিন সঙ্গী ছিল। সেও চলে যাচ্ছে।

মৃগেন বলে—তুই তো লেখালেখি নিয়েই থাকলি। দেখিস হুট করে সরকারি চাকরিটা ছাড়িস না।

সমীর বলে—সে রকম বাসনা আমার নেই। বরং এবার এখানেই বাসা করে আরও জড়িয়ে যাচ্ছি রে।

মৃগেন বলে—সেই ভালো। সামনের পরীক্ষাটা বরং দিয়ে দে।

মৃগেন চলে যেতে বাসন্তীদেবী এবার বলে সমীরকে,

—সমীর, এবার বাসাই করো। বৌমাকে আনবে শ্যামলী বলছিল।

সমীর বলে—তা তো আনবো, কিন্তু একা-

বাসন্তী-তার ছেলের বৌও বলে—একা কেন? আমরাও তো আছি।

শ্যামলীও এসে জোটে। সেও বলে—

—আমিও আছি। হোস্টেলের একঘেয়ে রান্না খেয়ে মুখ বোদা হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে এসে মুখ বদলানো যাবে।

সমীর চুপ করেই থাকে।

শ্যামলীই বলে—মাসীমা, ঘর সংসারের জিনিসপত্র হাঁড়ি কড়াই শিল নোড়া এসব তো চাই। ফর্দ করে দিন-

সমীর বলে—নোড়াটা আগে কিনো, ওটা দিয়েই সব কাজ হয়ে যাবে।

শ্যামলী হাসছে, যেন বেশ মজার খোরাকই পেয়েছে সে এবার।

সীমা এতদিন গ্রামের বাড়িতেই ছিল। শহরের মেয়ে সে। বাবার অবস্থাও ভালো, সেখানে আদর যত্ন, বিলাস বৈভবেই ছিল।

গ্রামে এসে সে সব কিছু পায় নি। তবু সে মনের কোন চাওয়ার প্রকাশ করেনি এখানে। সহজভাবেই সব কিছুকে মেনে নিয়েছিল সে।

পারুল বৌদির বঞ্চিত জীবনকে দেখেছে, দেখেছে গ্রামে অনেক বউকে, শাশুড়ী ননদের অত্যাচার এমন কি স্বামীর অবহেলা সয়েও ঘর করছে। তাদের তুলনায় সে অনেক ভাগ্যবতী। প্রভাদেবী সংসারের আয় ব্যয় কিছুই দেখেন না-সব ভার সীমার উপরেই ছেড়ে দিয়েছে। বলে,

—অনেক খেটেছি মা নিজের সংসারে, অনেক কষ্ট সয়েছি, এবার তোমাদের সংসারে দুমুঠো খেতে পরতে পেলেই নিশ্চিন্ত। সীমাই সংসার চালিয়েছে এতদিন, এবার রেখা এসেছে। সীমার ছুটি মিলবে এ সংসার থেকে, সে এবার কলকাতায় গিয়ে নিজের সংসার পাতবে।

পারুলবৌদি এখন শাশুড়িকে নিয়ে নিজেদের বাড়িতেই রয়েছে। ভাগ-বাটোয়ারার পর বাইরের বাড়িটা আলাদাই করে নিয়েছে তারা। দেবেনের সঙ্গে তাদের আর যোগাযোগ বিশেষ নাই। পুরনো মাহিন্দার গোকুলই ওদের জমি জমার তদারক করে—প্রবীরও দরকার পড়লে দেখাশোনাটা করে।

পারুলবৌদি সীমাকে বলে,

—তুই গিয়ে বাসা কর সীমা, পরে কাকীমাকে নিয়ে কালীঘাটে মাকে পুজো দিয়ে আসবো—গঙ্গাস্নানও করে আসবো রে। বিয়ের পর এই খানে এসে ঢুকেছি, কুয়োর ব্যাং হয়ে—তবু একবার কলকাতা দেখে আসবো।

সীমা বলে—বেশ তো।

সব মেয়েই চায় তার নিজের সংসার, যেখানে সেইই হবে সর্বময় কর্ত্রী। সীমা তাই কলকাতার স্বপ্ন দেখে, দিন গোনে।

যাবার দিন ঘনিয়ে আসছে। সীমার মন খারাপ করে।

এখানের মাটির সঙ্গে মিশিয়ে গেছে সে, এই গ্রাম-এখানের মানুষ, প্রবীর, সুবীর-প্রভাদেবীও যেন তার অতি আপনার জন হয়ে উঠেছে।

আজ তাদের ছেড়ে যেতে হবে নতুন এক অচেনা পরিবেশে।

বলে সীমা প্রভাকে,—যেতেই হবে মা?

প্রভাদেবী চাইল সীমার দিকে, মনে পড়ে তার অতীতের কথা। সেও এবাড়িরই একজন হয়েছিল। ভাসুর-মালতীদি-রমেনকে নিয়ে এখানেই থাকতো।

তারপর স্বামীর সঙ্গে দূর পরবাসে কোন প্রত্যন্ত গ্রামে যেতে হয়েছিল, সেখানে পেতেছিল নিজের সংসার। ছেলেমেয়ে হয়েছিল।

যাযাবরের মত ঘুরেছিল এক ঠাঁই থেকে অন্যত্র, বদলির চাকরি। তবু সেই ছিল তার সংসার-একদিন সব হারিয়ে গেল। ফিরে এসেছিল এই মাটিতে। এ যেন এক দীর্ঘপথ পরিক্রমা-সে সব আজ স্মৃতি হয়ে আছে।

এ গ্রামের নসু ভটচাযও কলকাতায় গেছল পরিবার নিয়ে, তার স্ত্রী মাঝে মাঝে গ্রামে এসে বলতো—ধুৎ, গাঁয়ে মানুষ থাকে। তার মেয়েকেও কলকাতার পোশাক পরিয়ে গ্রাম বেড়াতে বের হতো। আজ তার কোন খবর নাই।

প্রভা বলে—মা, সমীর সারা জীবন লড়াই করেই চলেছে, তারপর লেখার কাজ, সেও তো দিনরাতের লড়াই। এসময় তোমাকে তার পাশে থাকতেই হবে মা। স্বামীর পাশে থেকে তাকে ঠিক পথে চালানো স্ত্রীর কাজ। সংসারের দায়ও অনেক। এখন নিজেদের সংসারে যাচ্ছো—এসব তোমাকেও দেখতে হবে মা।

সীমা চুপ করে থাকে। বেশ বুঝেছে এবার তার দায়ও বাড়লো। প্রভা বলে—এখানেও মাঝে মাঝে আসবে মা। ওটা বাসা-এই তোমার ঘর। একদিন সব হারিয়ে এই মাটিতে এসেছিলাম। এই মাটিই আমায় সব ফিরিয়ে দিয়েছে। এ মাটি মায়ের মত একে ভুলো না মা।

রেখা বলে—পুজোর সময়ে আসবে দিদি। কলকাতার পুজো থেকে গ্রামের পুজো

অনেক ভালো।

সীমা বলে—কলকাতায় নাই পাঠালেন আমায়, আমি কিন্তু যেতে চাইনি।

প্রভা বলে সমীরকে তো দেখতে হবে মা।

সমীর স্টেশনেই গেছল। প্রবীর সীমাকে নিয়ে নেমেছে হাওড়ায়। সীমা এর আগে দু-একবার কলকাতা বেড়াতে এসেছিল মাত্র। এবার এখানেই থাকতে হবে। তাই এক নতুন চোখে দেখছে এই মহানগরকে।

হাওড়া ব্রিজের বিশালতা-শহরের নতুন তৈরি বাড়িগুলো দেখে। ট্যাক্সিটা কর্মব্যস্ত রাস্তা দিয়ে ছুটে চলেছে। চারিদিকে শুধু মানুষ আর মানুষ।

গ্রামের সেই সবুজ শান্ত পরিবেশের চিহ্নমাত্র এখানে নাই। এই কাঠ কংক্রিটের শহর আর তেমনি ভিড়। সবাই যেন দৌড়াচ্ছে। সীমা বলে—এখানে মানুষ তো পথেই দেখছি সবাই, এরা থাকে কোথায়? সমীর বলে—দিনভোর কাজই করতে হয় এখানে, এরা পাখির জাত। সকালে বাসা ছেড়ে বের হয় খাবারের সন্ধানে, দিনভোর পথেই, ফেরে রাতে।

—তুমিও কি এই করো?

সীমার কথায় সমীর বলে—আমাকে ঘরে বন্দী হয়েই কাজ করতে হয় অনেক সময় তারপর এই দিন রাতও ঘুরতে হয়। এলে, এবার দেখতেই পাবে।

সীমা তাদের আস্তানাটা দেখছে। গলির মধ্যে বাড়িটা-তাই গাড়ি ঘোড়ার আওয়াজ-লোকজনের ভিড় তত নেই। শহরের তাদের বাড়ির মত এলাকা।

বাড়িটার মধ্যে কিছুটা উঠান দুচারটে গাছ একটু ফাঁকা রয়েছে। উঠানে দুটো পেয়ারা গাছ একটা নিমগাছও রয়েছে। বাসন্তীদেবী তার পুজোর জন্য টগর-গন্ধরাজ-গাঁদা এসব ফুলগাছও করেছিল।

বাসন্তী তার ছেলের বৌও নেমে এসেছে।

সমীর বলে সীমাকে—এই মাসিমা আর ওই রমাবৌদি?

সীমা বাসন্তীদেবীকে প্রণাম করে।

—এসো মা। এতদিন পর সমীর তোমাকে আনলো, এবার নিজের সংসার দেখেশুনে নাও মা।

উমা তাকে ভিতরে নিয়ে যায়। ততক্ষণে ঝড়ের মত এসে পড়ে শ্যামলী—তাহলে শেষ অবধি এলি সীমা।

সমীর বলে—যা কলকাঠি নাড়লে শ্যামলী এরপর ও না এসে পারে।

সীমা দেখছে এর মধ্যে ঘরদোর কিছুটা গোছানো। খাট আলমারী কেনা হয়েছে শোবার ঘরে, বাইরে ঘরে একটা সোফাসেট আর বই এর র‍্যাক ছাড়াও একটা তক্তপোষ পাতা।

শ্যামলী বলে—একটা টেবিল চেয়ারই আনো ওই তক্তপোষ হঠাও।

সমীর বলে—ওখানে বসেই লিখি। চেয়ার টেবিলে বসে লিখলে মনে হয় অফিসে কেরানিগিরি করছি। লেখার ব্যাপারটা আলাদাই থাক।

বাসন্তীদেবী বলে—বৌমা, এবেলা রান্নার ঝামেলা করতে হবে না। আমাদের ওখানেই খাবে মা। তারপর যাহয় করবে ও বেলায়। এখন স্নানটান করে নাও।

সীমা এবার তার নিজের সংসারে এসেছে। বাড়িতেও অবশ্য সংসারের ভার ছিল তার উপর, এখন একা। সমীর সকাল নটার মধ্যে অফিস বের হয়ে যায়।

কোনদিন বৈকাল ছটার মধ্যে ফিরে চা টা খেয়ে একটু বিশ্রাম করেই কাজে বসে। রাত দশটা অবধি কাজ করে খেয়ে দেয়ে আবার কাজে বসে। রাত একটা অবধি কাজ করে।

আবার রাতে খাবার পর কাজ না করলে পরদিন ভোর থেকেই কাজ বসে বেলা আটটা অবধি। তারপর স্নান খাওয়া করে অফিস যায়।

কোনদিন ফিরতে দেরি হয়ে যায়। স্টুডিওপাড়া-না হয় পত্র-পত্রিকার অফিস-বইপাড়া ঘুরে আসতে হয়। প্রশান্তবাবুর পত্রিকার অফিসে সন্ধ্যার পর আড্ডা বসে। সমীর এখন সাহিত্যিক সমাজেও পরিচিত পাঠক সমাজেও আদৃত। এখন সাহিত্যসভাতেও যেতে হয় বিভিন্ন জায়গায়।

সীমা এর মধ্যে নিজের মনোমত করে বসার ঘরটাকে সাজিয়েছে। শ্যামলীও আসে মাঝে মাঝে। ছুটি ছাটার দিন শ্যামলী এখানেও খায় দায়।

আর সমীরও একদিক থেকে নিশ্চিন্ত। সীমা প্রথম প্রথম এসে বলতো সমীরকে—চলো না সিনেমায় যাই।

সমীরেব ওই সিনেমা দেখার ব্যাপারটা ভালো লাগে না। বন্ধ ঘরে আটকে থেকে সকলের সঙ্গে সিনেমা দেখা যেন ক্লান্তিকরই বোধহয়।

তার বেশ কয়েকেটা ছবিই হয়েছে। কাহিনীকার, চিত্রনাট্যকার হিসাবে ছবির শুটিং এ মাঝে মাঝে থাকতে হয়, বিরক্তিকর গলদঘর্ম অবস্থা। তার ছবির সম্পাদনার পর স্টুডিও প্রজেকশন রুমে বসে রাশপ্রিন্ট দেখে ছবিতে আর কি দৃশ্য লাগবে সেটাও ভেবে নিতে হয়। পরে ফাইন্যাল প্রিন্ট দেখে নিতে হয়। এসব করে সিনেমার উপর মোহ তার নেই, তবু কিছু ভালো ছবি দেখতে হয়, নিজের প্রয়োজনে দেশী-বিদেশী বিভিন্ন ছবি দেখার জন্য ভি-সি-আরও কিনেছে। সমীর বলে—টি-ভি, ভি-সি-আর এ ছবিই দ্যাখো বাবু।

ওই হলে গিয়ে গুঁতোগুতি ভালে লাগে না।

তবে মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বর না হয় বোটানিক্যাল গার্ডেনেও না হয় নিউমার্কেটেও যেতে হয়েছে। সমীর বলে,

—কাজের ক্ষতি হয়, পুজোর লেখা আছে। নতুন উপন্যাসের কপি আছে।

সীমা বলে—যত ইচ্ছে কাজ করো। কিন্তু মাঝে মাঝে ছুটি তো চাই।

সমীর বলে—ছুটি! ছুটি আমাদের নেই। দ্যাখো না-রবিবার ছুটির দিনই বেশি কাজ করতে হয়।

সীমাও দেখেছে সেটা। তারও মাঝে মাঝে কষ্ট হয়। দেখে অফিস থেকে এসেই কিছু খেয়ে কাজে বসে সমীর রাত অবধি। কোন রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায় সীমার। দেখে সমীর ওঘরে টেবিললাম্প জ্বেলে তখনও লিখছে। চারিদিকে লেখা কাগজগুলো-তন্ময়

হয়ে লিখছে সে।

সীমা বলে—কটা বাজে খেয়াল আছে। রাত দেড়টা। ওঠো এবার।

—এই আর একটু।

—না, কাল হবে। ওঠো।

তাকে জোর করে তুলতে হয়। সীমা শুধোয়—এত লিখতে হয়, পড়তে হয়? কি দরকার?

সমীর বলে—এসব না করে পারি না সীমা, ভিতর থেকে কে যেন তাড়া দেয়। তোমার অসুবিধা হয় তা জানি-কিন্তু।

—সীমা কুণ্ঠিত স্বরে বলে—আমার অসুবিধা কি! নিজে এত কষ্ট করো—

সমীর স্বেচ্ছায় এই কষ্টের জীবনকেই মেনে নিয়েছে।

এমনি দিনে হঠাৎ অফিসে ফোন আসে সমীরের। বাড়িতে ফোন তখনও নেয়নি। অফিসেই তার টেবিলে দুটো ফোন। প্রকাশক-অন্যরা সেই ফোনেই যোগাযোগ করে। সেদিন অফিসে ফোন আসে। বোম্বাই এর প্রখ্যাত পরিচালক প্রযোজক শান্ত সেন ফোন করছেন। গ্রান্ড হোটেলে উঠেছেন তিনি-সমীর যদি একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারে ভালো হয়। তার একটা উপন্যাস নিয়ে তিনি ছবি করতে চান।

সমীরের গল্পের ছবি এখানে এর মধ্যে কয়েকটাই হয়েছে। সুরেশবাবুর সেই ছবির সাফল্যের পর আর কয়েকজন তার উপন্যাসের ছবি করেছে। তাদের বেশ কয়েকটির চিত্রনাট্যও লিখেছে সমীর। সেই ছবিগুলোও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। অবশ্য দু'একজন যে এর মধ্যে তাকে ঠকায়নি তাও নয়।

একজন নামী চিত্রপরিচালক তার একটা উপন্যাস নিলেন ছবি করার জন্য। চিত্রনাট্য লিখবেন তিনিই, উপন্যাসের চিত্রস্বত্বের জন্য সমীরকে দেওয়া হবে আড়াই হাজার টাকা। তখন ওই টাকার দামও অনেক। পাঁচশো টাকা দিয়ে তিনি শ্যুটিং শুরু করলেন। দু' একদিন তার ফ্লোরেও গেছে সমীর। ওখানে যায় সে এক এক পরিচালকের শ্যুটিং রীতি-সট ডিভিশন-টেকিং এর রীতিগুলো জানার জন্যই। তাতে তার চিত্রনাট্য আরও প্রাণবন্ত করে লেখার পথ পায় সে।

পরিচালক আর সব আলোচনাই করেন-কিন্তু টাকার কথা বলেন না। ছবির কাজ শেষ। একদিন সমীর নিজেই প্রযোজকের অফিসে যায়। সেখানে টাকার কথা বলতে প্রযোজক মশায় পান চিবুতে চিবুতে বলেন—আপনার পুরো টাকা তো আগেই পরিচালক মশাই নিয়ে গেছেন। এই দেখুন তার রসিদ। আমরা তো দিয়ে দিয়েছি।

সমীর অবাক হয় ব্যাপারটা দেখে।

ইচ্ছা করলে সমীর আইনের আশ্রয় নিতেও পারতো। কিন্তু তা আর করেনি। সেই ছবি মুক্তি পেল এবং কলকাতায় সগৌরবে রজত জয়ন্তী উৎসব পালন করলো। সমীরের সুনামও হলো কিন্তু তার সামান্য টাকা কিন্তু পরিচালক মশায় যা গিলেছিলেন তা আর ওগল্যান নি।

তারপরই হঠাৎ বোম্বে থেকে এক প্রযোজক এলেন। মিঃ ভাটিয়া, সেখানের নামকরা প্রযোজক। সেই পরিচালকের ছবি দেখে তিনি মুগ্ধ ওটাকে হিন্দীতে করতে চান।

এখানের দু'একজন চিত্র পরিবেশকও এখন সমীরকে চেনে তার ঠিকানাও জানে। সেই পরিচালক মশায়ও মিঃ ভাটিয়া এই ছবি হিন্দীতে করতে চান শুনে বোম্বাই এর চিত্রজগতে পা রাখার জন্যই এবার তিনি উঠে পড়ে লাগলেন।

কাহিনীর হিন্দীচিত্র স্বত্বের দরকার সেই পরিচালক মশায় জানান—চিত্রস্বত্ব তাঁরই। তিনিই সেটা হস্তান্তর করতে পারেন।

কিন্তু মিঃ ভাটিয়ার এখানের পরিবেশক সমীরের একটা গল্পের ছবি করছেন। তিনিও শুনেছেন সমীরের কাছে ওই পরিচালকের বিচিত্র ব্যবহারের। সমীরকে তিনি ওইভাবে ফাঁকি দিয়েছেন সেটা সমীর তাকেও জানিয়েছিল।

তাই সেই পরিবেশক বলেন মিঃ ভাটিয়াকে,

—ওটা একজন নামী সাহিত্যিকের লেখা উপন্যাস—তিনি কি সর্তে ওই পরিচালককে ছবি করতে দিয়েছিলেন সেটা তার কাছে জানা যেতে পারে। সব না জেনে ওই পরিচালকের কাছে হিন্দী রাইট কিনে তাকে ছবি করতে দিলে পরে গোলমাল হতে পারে।

তাই সেই চিত্র পরিবেশকই মিঃ ভাটিয়াকে নিয়ে আসেন সমীরের বাড়িতে।

সব শুনে সমীর অবাক। বলে তিনি হিন্দী চিত্রস্বত্ব আপনাকে বিক্রি করতে চান?

—তাই তো বললেন।

সমীর এবার সেই পরিচালকের সঙ্গে তার চুক্তিপত্র দেখাতে মিঃ ভাটিয়া বলেন—একি, এতো শুধুমাত্র বাংলা চিত্রস্বত্বই নিয়েছেন তিনি-তাও দশ বৎসরের জন্য আর আমাকে বললেন-সব রাইট তাঁর?

সমীর বলে—মাত্র পাঁচশো টাকা সাইনিং দিয়েছেন—বাকি টাকাও দেন নি। নিজেই আত্মসাৎ করেছেন তিনি-আমি এ নিয়ে ঝামেলা করিনি।

মিঃ ভাটিয়া এবার সমীরের সঙ্গেই চুক্তিপত্র করে হিন্দী রাইট নেন। আর বলেন—এ রকম লোককে আমি আমার পরিচালক করছি না। বোম্বের কাউকেই নেবো।

কদিন পর সমীর স্টুডিওতে গেছে। সেই পরিচালক মশাই এবার বলেন—আমার বোম্বের কাজটা হতে দিলেন না তো?

সমীর অবাক হয়। বলে সে—আপনি বাংলা ছবির জন্য পুরো টাকা আগে নিয়ে আমাকে দেননি, এবার হিন্দীর টাকাটা পুরোটাই হজম করতে গেছলেন। মিঃ ভাটিয়া আমার বাড়িতে গিয়ে সব কাগজপত্র দেখে সব কথা শুনে আমার কাছ থেকেই রাইট কিনেছেন, তারপর কি করেছেন আমার জানা নেই। এই অপকর্মটা না করলে নিশ্চই হিন্দী ছবির কাজটাও পেতেন। তখন আমাকে ঠকালেন এবার নিজেই ঠকলেন।

পরিচালক ভদ্রলোক চুপ করে চলে যান।

ওদিকের ঘরে অন্য পরিচালক তার একটা গল্প নিয়ে ছবি করছেন। চিত্রনাট্য লেখার কাজও শেষ। ওদিকে বেশ কিছু হবু শিল্পীদের ভিড়।

স্টুডিওপাড়ায় এটা নতুন কিছু নয়। সেখানে বড় বড় শিল্পীদের ছাড়াও মাঝারি-ছোট মাপের নানা শিল্পীর দরকার হয়। নির্বাক রোলে ভিড় জমাতেও কিছু লোকজন মেয়ে পুরুষ লাগে।

এছাড়াও আছে হবু নায়কদের ভিড়, ইদানীং মেয়েরাও এই জগতে আসছে। সিনেমার সঙ্গে সঙ্গে আসছে আর এক মিডিয়া সেটা টিভি।

অবশ্য এখনও সেটার খুব প্রচলন হয়নি। তাই সিনেমালাইনেই ভিড় করে সকলে। প্রডাকশন ম্যানেজার ওদের দেখেশুনে কিছুটা ঝাড়াই করে তাদের কয়েকজনকে ডিরেক্টরের ঘরে পাঠায়।

সেদিন সমীরও রয়েছে ডিরেক্টরের ঘরে, পরিচালক কয়েকজন শিল্পীকে দেখছে সাইড রোলের জন্য। হিরোর বোন-হিরোইনের দিদি এইসব রোলের জন্য দু চারজন এসেছে।

সমীর হঠাৎ চমকে ওঠে তাদের মধ্যে একজনকে দেখে খুবই চেনা মনে হয়। সেই মুখ সেই চোখ-তবে আগেকার সেই লাবণ্য-উদ্দামতা আর নেই। বেশ কবছর ধরে মেয়েটার কোন খবরই জানতো না সমীর। তবু ভোলেনি তাকে।

আজ এতদিন পর তাদের গ্রামের নসুদার মেয়ে কাজলীকে এখানে এই অবস্থায় দেখে অবাক হয়। কাজলীও দেখেছে তাকে। কিন্তু একেবারে নিপুণ অভিনেত্রীর মতই না চেনার ভান করে। সমীরও চুপ করেই থাকে।

পরিচালক ভদ্রলোক ওর সঙ্গে কথা বলছে। কাজলীও জানায় এর মধ্যে সে কোন যাত্রার দলে কয়েকবৎসর ধরে নাটক করেছে, এবার সিনেমাতেই নামার জন্য চেষ্টা করছে। কয়েকটা ছবিতে নেমেছেও ছোট খাটো রোলে। এখানে চান্স পেলে এই রোল সে করতে পারবে।

সমীর দেখছে ওকে। ক'বছরের এই ভবঘুরে জীবন মেয়েটাকে বদলে দিয়েছে। এখন ওর যেন এই কাজটার খুবই দরকার।

পরিচালক ভদ্রলোক বলে—প্রডাকশন ম্যানেজারের কাছে ঠিকানা রেখে যাও। সামনের সপ্তাহে একবার এসে খবর নিও।

মেয়েটি বের হয় যায়। সমীরের দিকে ফিরেও চায় না।

ও পাড়ার কাজকর্ম সেরে সমীর বের হয়েছে তখন সন্ধ্যা নামছে। টালিগঞ্জ পাড়ার এদিকে তখনও গাছ-গাছালি কিছু রয়েছে, ট্রাম ডিপোর ওদিকের দেওদার গাছের নীচে বেশ কয়েকটা ঝুপড়ির চায়ের দোকান গড়ে তুলেছে উদ্বাস্তুদেব অনেকেই। ওখানে স্টুডিও পাড়ায় টহল মেরে হবু নায়ক-অভিনেতা-ডিরেক্টারের দল চায়ের দোকানে বসে হাফকাপ চা নিয়ে ছবি তৈরি করছে। এদের কেউ গদার, কেউ ফেলিনি, কেউ রসোলিনি অন্যকেউ এরা বসে বসেই ছবি তৈরি করে আর সে ছবি ওখানেই রিলিজ হয়ে যায়। স্বপ্ন নিয়েই এদের জগৎ।

সমীর এদিকে আসছে ট্রাম ধরার জন্য হঠাৎ কার ডাক শুনে চাইল। এদিকে রাস্তার আলোও কম। তবু ওই অল্প আলোয় দেখে কাজলীকে। এবার মেয়েটা এগিয়ে আসে। ওখানে ইচ্ছা করেই চেনেনি এতক্ষণ ধরে মেয়েটা স্টুডিওর বাইরে ওর জন্যই অপেক্ষা করছিল। এবার সমীরকে দেখে বলে,

—ওখানে তোমাকে চিনি জানাই নি। কেমন আছো?

সমীর দেখছে ওকে।

মনে পড়ে কলকাতায় ওদের বাসার দিনগুলোর কথা। নসুদার কাছে সে কৃতজ্ঞ। ওই

তার একমাত্র মেয়ে। নসুদা চেয়েছিল মেয়েকে লেখাপড়া শেখাবে, ভালো ঘর করে বিয়ে দেবে।

কিন্তু তারপর স্বপ্ন ব্যর্থ করে মেয়েটা একটা পাড়ার মস্তানের সঙ্গে বের হয়ে যায় বাবাকে না জানিয়ে। সমীরকে নিয়ে নসুদা অনেক সন্ধানই করেছিল। থানা পুলিশও করেছিল কিন্তু তার আর কোন সন্ধান পায়নি।

নসুদার আর গ্রামে ফেরাও হয়নি। ভেবেছিল মেয়ের বিয়ে দিয়ে তাকে এখানে থিতু করে সে নিজে সেই গ্রামের জীবনে ফিরে যাবে। এখনও দেখা হয় নসুদার সঙ্গে। এখন চাকরিতে রিটায়ার করে এখানেই রয়েছে।

মাথার চুলগুলো সাদা হয়ে গেছে-চোখ কোটরে ঢুকে গেছে-পাগলের মত আপন মনে বিড় বিড় করে। দেখা হলে শুধোয়,

—কেমন আছো?

ওই পর্যন্তই। উত্তরের অপেক্ষাও করে না। প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিয়েই চলে যায়। আর কারোও উপর কোন মায়া মমতাও নাই, স্নেহ, মায়া বিশ্বাস সব তার মন থেকে হারিয়ে গেছে।

সমীর দেখছে কাজলীকে। বলে—তুমি কেমন আছো? কোথায় রয়েছো এখন? কাজলীর চোখ দুটো কি বেদনায় ভরে ওঠে। বলে,

—আছি। কোন মতে বেঁচে আছি। আর কোথায় আছি?

চুপ করে যায় সে। সমীর বলে—সেই ফটিক কোথায়?

কাজলী বলে—অনেক কথা ছিল তোমার সঙ্গে। যে চুলোয় থাকি সেখানে কি যেতে পারবে একবার-কতদিন পর দেখা—

সমীরের কাছে খাপছাড়া মানুষের জীবনই তার উপন্যাসের খোরাক। সাধারণ ছন্দ থেকে পতন ঘটাই জীবনের বিপর্যয়-বৈচিত্রই। সেই চরিত্রগুলোর অন্তর বেদনাকেই খুঁজতে চায় সে।

তাই বলে—কোথায় থাকো এখন?

টালিগঞ্জের সামনের রূপটাকেই দেখেছে সমীর। বড় রাস্তা-দুদিকে বড় বড় বাড়ি। তার মাঝখানে একটা গলি। ওই গলিধরে বেশ কিছুটা এগিয়ে গেলে তারপর আদিগঙ্গার ধারে শুরু হয়েছে ঘিঞ্জি বসতি।

একেবারে আদিগঙ্গার পলিকাদার কাছ অবধি নেমে এসেছে ওই বস্তির ভিড়। কোথাও এতটুকু ফাঁক নেই। ওদিকে সরকারি মদ তৈরির কারখানা। সন্ধ্যার হিমেল হাওয়ায় এখানে বাতাসও পূতিগন্ধময়।

পথটা জলকাদায় ভর্তি। ওই ঘিঞ্জি বস্তির একটা ঘরে সমীরকে নিয়ে যায় কাজলী। টিনের বেড়া দেওয়া দেওয়াল-স্যাতসেঁতে ঘর। দরজাটা নড়বড় করছে। ওই ঘরে একটা তক্তপোষে মলিন চাদর পাতা-একটা কাঠের হাতলভাঙা চেয়ার এগিয়ে দেয় কাজলী।

—এখানেই বসো।

একটি বয়স্কা মহিলা চেয়ে দেখছে তাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। কাজলী বলে,

—একটু চা করে দাও মাসি।

সমীরের এই পরিবেশে চা খেতেও মন চায় না। বলে সে,

—আবার চা কেন?

কাজলী বলে—মাসি—নন্দের দোকান থেকেই চা আনো।

সমীর শুধোয়—ফটিক কোথায়?

—নেই।

—মানে!

কাজলী বলে—ভূতের রোজা মরে ভূতের হাতে, সাপের রোজা সাপের ছোবলে। তখন সবটা জানতাম না। মনে হয়েছিল ছেলেটা এমনি এক আধটু মস্তানি করে। বিয়ে থা করলে বদলে যাবে। তখন ওই নেতার দৌলতে ভালোই রোজগার করতো। বাজার থেকে দৈনিক ফড়ে ব্যাপারীদের কাছ থেকে মুঠো মুঠো টাকা আনতো। তখন ভালোই ছিলাম।

কিন্তু পরে বুঝলাম ভুলই করেছি। ওই তোলার টাকার ভাগ বখরা নিয়েই নিজেদের দলের মধ্যে গোলমাল করে নিতাই বলে একটা ছেলে।

তখন তালতলার দিকে একটা বাড়িতে থাকি। দোতলা বাড়ি নীচে দলের ছেলেরা কেউ কেউ থাকতো। হোটেল থেকে খাবার, মদ এসব আসতো। সেই মদের আসরেই শুরু হল গোলমাল। ওরা নিতাইকে মেরে বের করে দিল দল থেকে।

সেই নিতাইই পরে ওকে একদিন একা পেয়ে এন্টালী বাজারের পিছনে গুলি করে শেষ করে দিল। পুলিশ হানা দেবে ভয়ে ওই মাসিই আমাকে নিয়ে চলে গেল।

—ওই মহিলা?

—হ্যাঁ। ওকে ফটিক মাসিই বলতো। ওই নিয়ে গেল আমাকে ডোমজুড়ের কাছে ওদের গ্রামে। পুলিশ নাকি ফটিককে খুঁজছে। খুন রাহাজানি-মেয়ে ঘটিত নানা কেসে। পুলিশ নাকি ধরতে পারলে আমাকেও ওদের চোরাচালানের কেসে জড়িয়ে দেবে।

ওই গ্রামে পড়ে বাকি জমানো টাকা সোনাদানা দু'একটা সোনার বিস্কুটও ছিল, তাই সম্বল। তাতে আর কদিন ওই মাসিই তখন বলে,

—গানটান জানো, আমাদরে গাঁয়ের মদন যাত্রার দলের ম্যানেজারি করে, সেই বলছিল তোমার কথা—যাত্রার দলেই নামো বাপু। পেট তো চালাতে হবে।

ওই গ্রামের পরিবেশেও টেকা দায় হয়ে উঠেছিল। ও খানের এক নেতা আসা যাওয়া শুরু করেছে। মাসিকেও হাত করেছে। মাসিও বলে—ভুবনবাবু এলে একটু গপ্পটপ্প করিস। বড় ভালো লোক রে। রাতের বেলায় প্রায়ই হানা দেয় ভুবনবাবু। মাসি মদের বোতল-আলুর দম-ঘুগনিও আনে। আমাকেও খাওয়াতে চায়।

এমনি দিনে মদনের দলেই চাকরি পেতে বাঁচলাম ওই শয়তানের হাত থেকে।

কলকাতায় এদিকেই এইখানে এলাম। কলকাতায় থাকলে কাজের সুবিধে হবে এই বলেই গ্রাম থেকে পালিয়ে এলাম।

চুপ করলো কাজলী।

মাসি চা আর নেড়ো বিস্কুট এনে শুধোয়,

—তোর চেনাজানা নাকি লা?

কাজলী বলে-হ্যাঁ। আমাদের গাঁয়ের লোক।

তারপর সমীরের কয়েকটা হিট সিনেমার নাম করে বলে,
—ওসব ওরই লেখা। এখন কয়েকটা ছবিই হচ্ছে ওঁর।
মাসীর কঠিন মুখটা এবার নরম হয়। বলে সে,
—ওমা তাই নাকি। তালে ওকেই ধর দ্যাখ না ভালো চান্‌সো যদি পাস সিনেমায়।
রাত হয়েছে। সমীর বের হয়ে আসছে। কাজলীই বলে.
—এসব গোলকধাঁধা, তুমি পথ খুঁজে পাবে না। এখানে ঢুকলে বের হওয়া কঠিন। চলো এগিয়ে দিয়ে আসি।
দুচারজন রসিক ব্যক্তি টলতে টলতে যাচ্ছে। কাজলী বলে—বাবা-মা কেমন আছে?
মেয়েটার উপর রাগই জমেছিল সমীরের মনে। নিজের কর্মফলের শাস্তিও পাচ্ছে। লজ্জায় ভয়ে বাড়িতেও ফিরতে পারেনি। সমীর বলে—বাবা-মায়ের কথা মনে পড়ে?
কাজলী মাথা নাড়ে। বলে সে,
—লজ্জায়, ঘেন্নায় মাঝে মাঝে মরতেও মন চায়, নিজের ওপর রাগও হয়। বাবা মাকে তবু মনে পড়ে।
সমীর বলে—আছে একরকম।
কাজলী বলে—একটা কথা রাখবে?
চাইল সমীর। কাজলী বলে,
—আমার কথা বাবা-মাকে জানিয়ো না। তারা জানবে তাদের মেয়ে আর নেই। মরে গেছে। কান্নায় ভেঙে পড়ে কাজলী। বলে তুমি যাও, রাত হয়েছে।
সমীর ফিরছে। নির্জন ট্রাম। ময়দানের উপর দিয়ে ছুটে চলেছে। সমীরের বারবার মনে পড়ে কাজলীর কথা। নিজের একটা ভুলে মেয়েটা আজ নিজের চরম সর্বনাশ ডেকে এনেছে। ওর ভবিষ্যৎ কি তা জানে না। সমাজের অন্ধকার পিছল পথেই নেমেছে সে- ক্রমশ ওই জগতের অতল অন্ধকারেই কি তলিয়ে যাবে-ওকি ভালো ভাবে বাঁচার কোন পথই পাবে না?
ও নিজেও আর এই সুস্থ জীবনে ফেরার আসা রাখে না। সমীরকে ওর ভাবনাই ভাবিত করে। এক একটা ঘটনা হঠাৎ সব ভাবনাকে যেন ছাপিয়ে যায় তাদের আকস্মিকতায়।
এখবরটা সীমাকেও জানাতে পারে না। সীমা শুধোয়—বাড়ি ফিরতে এত রাত হলো?
সমীর বলে—কাজে আটকে গেছলাম।
খেয়েদেয়ে সমীর জরুরী লেখা নিয়ে বসে। সব ভাবনার ফাঁকে কাজলীর সেই চাহনি- তার বেদনাতুর মুখটা মনে পড়ে। নসুদার কথাও মনে পড়ে। তাকে কি বলবে কথাটা? মনস্থির করতে পারে না।

শ্যামলী এখন হোস্টেল ছেড়ে মির্জাপুরের ওদিকে একটা বাড়ি ভাড়া নিয়ে রয়েছে। দেশ থেকে ওর মা তাদের বাড়ির কাজের মেয়ে কামিনীকে পাঠিয়েছে। কামিনী এখানে এসে সীমার বাসাতেও এসেছে।
শ্যামলীই এনেছে তাকে, বলে কামিনী হারিয়ে যাস্‌ নে যেন। পথটা চিনে রাখ, ওখানে

একা একা সব সময় থাকতে না পারলে এখানে চলে আসবি। পথটা-বাড়িটা চিনে রাখ হারিয়ে গেলে মুশকিল হবে।

কামিনী পাকামো স্বরে বলে—কামিনী বাংড়ো শহরে কত বার গেছে, বাদ্ধামানে মেয়ের বাড়িতে হামক্ গেছি, আমি হারাবো না গ। তা বাপু তোমার কলকাতা শহরে সবই তাজ্জব।

হাসে সমীর—তাজ্জব কি দেখলে?

—ওই নসু ভটচায কে দেখলাম পথে। শুধুলাম-কেমন আছো গ ভটচায? তা চিনতেই লারলেক। একবার ড্যাবডেবিয়ে চেয়ে আবার চলে গেল। তাজ্জব ব্যাপার লয়?

তারপরই কামিনীই শুধোয়,

—ওই মেয়েটার খপর কি গা? পাত্তা পেলে?

শ্যামলী বলে—ওসব খবরে তোমার কি দরকার বলোতো?

সমীরও চুপ করে যায়।

কামিনী তখন সীমার সঙ্গে গাঁয়ের গাজনের গল্প শুরু করেছে।

শ্যামলী বলে—সুখবরটা চেপে গেছো সমীর?

সমীর চাইল। লেখার কাজ এখন পুরোদমে চলেছে। এর মধ্যে বোম্বাই এর বিখ্যাত প্রযোজক পরিচালক শান্ত সেন তাঁর সুন্দরবনের পটভূমিকায় লেখা উপন্যাসটা ছবির জন্য নিয়েছেন।

ছবিটা তৈরি হবে হিন্দী বাংলা দুটো ভাষাতেই আর অভিনয়ের জন্য তিনি নিচ্ছেন বোম্বাই-বাংলার চিত্রজগতের নামীদামী শিল্পীদের। খবরটা সব কাগজেই বড় করে ছাপা হয়েছে।

বোম্বাই থেকে বাংলা ছবি তৈরির ব্যাপারটাও একটা চমকদার খবর আর ওই ছবির আউটডোর শ্যুটিং হবে সুন্দরবনেই।

শ্যামলীর কথায় সমীর বলে—ওই হিন্দী-বাংলা ছবির খবর?

শ্যামলী বলে—ওছাড়া আর কি কোন সুখবর থাকতে পারে না?

চাইল সমীর। শ্যামলী বলে—সীমা কিছু বলেনি?

—কই না তো?

শ্যামলী বলে তাহলে সুখবরটা আমিই দিই। মিষ্টি খাওয়াতে হবে কিন্তু। সমীর চেয়ে থাকে। শ্যামলীই বলে,

—তুমি বাবা হতে চলেছো এবার।

—মানে? চমকে ওঠে সমীর। ওর এই চমকে ওঠায় শ্যামলী হাসিতে ফেটে পড়ে। হাসি সামলে বলে,

—বাংলার মানেটাও বলে দিতে হবে সাহিত্যিক মশায়কে।

সমীর অবাক হয়। ক্রমশ যেন সংসারের বাঁধনে জড়িয়ে পড়ছে সে। সে চেয়েছিল মুক্ত এক জীবন, যেখানে কোন বন্ধন থাকবে না। তবু সীমা এসেছিল তার জীবনে। এবার আসছে তাদের সন্তান। জীবনের বাঁধনটা শক্তই হচ্ছে বেশি করে। কেমন যেন জড়িয়ে পড়ছে সে।

শ্যামলী ওকে গম্ভীর হতে দেখে শুধোয়,

—কি হলো? এত বড় সুখবরেও খুশি হওনি?

সমীর বলে—বাঁধন তো বাড়ছে শ্যামলী। আমি তো মুক্ত জীবন চেয়েছিলাম। চেয়েছিলাম নিজের কাজ করতে, লেখার মধ্যে দিয়ে আমার জীবনদর্শনকে তুলে ধরতে-

শ্যামলী বলে—জীবনকে সব দিক থেকে দ্যাখো সমীর। সন্ন্যাসীর ঈশ্বর দর্শন সহজ, কিন্তু গৃহী সে সাত হাত জলের তল থেকে ঈশ্বরদর্শন করে। সব বন্ধনের মাঝেও মুক্ত থাকার চেষ্টাই জীবনের সাধনা। সেই দুঃখ কষ্ট-আনন্দ বেদনাতে নিজে যদি না ভেসে পড়ো-তোমার লেখায় ওসব আসবে কি করে।

সমীর ভাবছে কথাটা। শ্যামলী বলে,

—রবীন্দ্রনাথের কথাই ভাবো। এতবড় মহান স্রষ্টার ব্যাক্তিগত জীবন কত বেদনার। কত বন্ধনময় ছিল। তবুও বলেছেন-সহস্র বন্ধন মাঝে লভিব মুক্তির স্বাদ, মহানন্দময়।

সেই কথা তার জীবনের উপলব্ধ সত্য। তুমি কি তাকে এড়িয়ে যাবে?

সমীরের মনে হয় শ্যামলীর কথাগুলো সত্যই, জীবনকে বন্ধন-যন্ত্রণাকে এড়িয়ে গিয়ে সৃষ্টির কাজ করা যায় না। এই সংসারের সব দুঃখ বেদনাকে-বন্ধনকে সহজভাবে নিয়েই এগোতে হবে।

সমীরের মনে হয় এ যেন সেই জীবনদেবতারই নির্দেশ। একে মেনে নিতেই হবে।

মেজভাই প্রবীর এখন স্কুলের শিক্ষকতা করে। ইংরাজীর শিক্ষক। এখন স্কুলের অবস্থাও বদলেছে। শুধু স্কুলেরই নয় দেশের পারিপার্শ্বিক আবহাওয়াও বদলেছে।

এতদিন পঞ্চায়েতের প্রধান ছিলেন বিভূতিবাবু। সৎ-আদর্শবান মানুষ। নিজের বিষয় সম্পদ কম নেই। ছেলেও এখন শহরের প্রতিষ্ঠিত ডাক্তার। ভালো রোজগার করে। শহরেই বিরাট বাড়ি-গাড়ি সবই করেছে। মেয়ে শ্যামলীও অধ্যাপিকা। বিভূতিবাবু পঞ্চায়েত পরিচালনা করেছেন নিষ্ঠার সঙ্গে।

এবার দেশের পরিস্থিতি বদলাচ্ছে। একটা দলই এখন মাথা তুলছে। প্রবীর চোখ কান খোলা রেখে চলে। গ্রামেই থাকতে হবে তাকে—কলকাতায় তার ঠাঁই নেই। তার স্ত্রী রেখাও উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছে।

সেও খুবই হিসাবী। প্রবীর দেখছে এবার পঞ্চায়েতের জন্য সরকার অনেক টাকার বরাদ্দ করছে। স্কুলের জন্যও নানা খাতে টাকা আসছে, বিলডিং ফান্ড, ডেভেলপমেন্ট ফান্ড নানা খাতে টাকা আসছে।

প্রবীরও এর মধ্যে এই অঞ্চলে কিছুটা পরিচিতি গড়ে তুলেছে। গ্রামে গ্রামে ঘোরে-কৃষকদের নিয়ে সাধারণ মানুষদের নিয়ে সভা করে। ক্ষেতমজুরদের নিয়ে সেদিন হাটতলায় মিটিংও করে তাদের মজুরী বাড়াতে হবে।

প্রবীরের সদরের নেতাদের সঙ্গেও যোগ আছে। নেতাদের অনেকেই আসেন গ্রামে-মিটিং হয়। তারা প্রবীরের বাড়িতেই ওঠেন। রাত্রিবাস করেন।

রেখা ওদের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করে।

প্রভাদেবী দেখেন সবই। গ্রামে গ্রামে ক্ষেতমজুরদের আন্দোলন গড়ে ওঠে। প্রভা বলেন,

—প্রবীর এসব কি রে? মিটিং-মিছিল-ক্ষেত মজুরদের মাথায় তুলছিস?

প্রবীর বলে দিন বদলেছে মা। এতদিন ওদের বঞ্চিত করেছে জোতদাররা এবার এদের নায্য দাবি দিতে হবে।

—শুনছি ওরা বলছে লাঙল যার জমি তার। এসব কি? তাহলে জমির মালিক হবে যে চাষ করছে সে? ভাগচাষই তো হয়েছে এতদিন।

প্রবীর এখন ওই আন্দোলন নিয়ে ব্যস্ত। এখন স্কুলে যায় নামমাত্র-হাজিরা দিয়েই বের হয়ে যায় ওইসব কাজে। সদরেও যায় নানা কাজ নিয়ে।

এবার পঞ্চায়েত নির্বাচন আসছে। গ্রামের-আশপাশের গ্রামের অনেকেই বিভূতিবাবুকে বলে—আপনিই দাঁড়ান।

বিভূতিবাবু দেখেছেন নতুন আন্দোলনকে। এক শ্রেণীর খেটে খাওয়া মানুষ আজ মাথা তুলেছে। ক্ষেত মজুর-আশপাশের গ্রামে পিতলকাঁসার বাসনপত্র তৈরি হয়ে প্রচুর। কর্মকার-সেইসব শালের মজুররাও এখন দাবি জানায়—আমাদের দাবি মানতে হবে।

ওরা কারণ অকারণে এসে পঞ্চায়েত অফিস ঘেরাও করে। স্লোগান দেয়,

—পঞ্চায়েতের কাজের হিসাব দিতে হবে।

এরমধ্যে এতোদিনের গ্রামে ছিল একটা শান্তির পরিবেশ। পরস্পর পরস্পকে মানতো, সমীহ্ করতো। ক্রমশ ওই সদাজাগ্রত মানুষগুলোকে শিখিয়ে দেওয়া হলো উদ্ধত হতে। সেই মূল্যবোধ যে অর্থহীন এইটাই বোঝানো হলো তাদের। বোঝানো হলে জমির মালিক যে ছোটবড় হোক না কেন সকলেই তাদের শত্রু।

বিভূতিবাবু বিচক্ষণ লোক। তিনি বুঝেছেন একটা নতুন স্বার্থপর লোভী শ্রেণীই এবার মাথা তুলেছে যারা সবকিছু দখলই করতে চায় তাই এদের এই ভাবে নিজেদের পিছনে এনেছে মদতদার হিসাবে।

বিভূতিবাবু দাঁড়াতে চান না। বলেন—আমার শরীরও ভালো নয়। দাঁড়াবো না আর ভোটে।

তবু দলের চাপে দাঁড়তে হয় তাকে। এবার নতুন দলের হয়ে পঞ্চায়েতে দাঁড়িয়েছে প্রবীর, তার দলের অন্যরাও দাঁড়িয়েছে। ওই জনতাকে নিয়ে মিটিং-মিছিল করে। ওদের চীৎকারে মুখর হয়ে ওঠে পল্লী অঞ্চল।

প্রবীর এখন স্বপ্ন দেখছে। রেখাও মেয়েমহলে ঘুরছে—সেও হাত পা নেড়ে মহিলা মহলে-এমনকি জগন্নাথপুরের বটতলার মিটিংএও ভাষণ দেয়।

প্রভাদেবী অবাকই হল। এসব তার ভালো লাগে না। বলেন তিনি,

—হ্যাঁরে প্রবীর এসব কি হচ্ছে? বিভূতি ঠাকুরপোর বিরুদ্ধে তুই দাঁড়িয়েছিস। মানী-সৎ লোক। আমাদের জন্যে অনেক করেছে। কুটুম।

প্রবীর এখন বদলে গেছে। তার পিছনে এখন অনেক মানুষ, সামনে এক নতুন স্বপ্ন, অনেক পাবার স্বপ্ন। তার জন্য সবকিছুই করতে পারে সে। প্রবীর বলে—দিন বদলেছে মা। এখন নীতির লড়াই-এখানে ওসব পিছনের কথা মনে রাখার দরকার নাই।

—সেকি। বেইমানি করবি? প্রভার পুরাতন মূল্যবোধ আজ মাথা তোলে, প্রবীর বলে—বেইমানি ওরাই করেছে এতদিন ধরে। আমরা তার প্রতিকার করতে চাই।

রেখা বলে—নতুন সমাজ গড়তে চাই শোষণহীন এক সমাজ।

প্রভা বলে—তাই ঘরের বউ ওই হাটতলায় গিয়ে লেকচার দেবে? এতো কখনও শুনিনি।

সুবীর ওদিকে তার মোটরবাইকটা পরিষ্কার করছিল। সে এখনও মোটরবাইকেই দুর্গাপুরের কারখানায় যাতায়াত করে। এখন ওই নতুন আন্দোলন শুরু হয়েছে দুর্গাপুরেও। ওখান থেকেই এসব ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। সুবীর রাজনীতি করে না। মায়ের কথায় বলে,

—মা, এ তোমাদের দিন নয় মা যে ঘরের চারদেওয়ালের মধ্যে মুখ বুজে থাকবে। এখন প্রগতির যুগ, যন্ত্রসভ্যতার দিন। এখন মানুষ সমাজব্যবস্থা সবই বদলাবে মা। ঘরের বৌ এখন নেত্রী হচ্ছে-মন্ত্রী হচ্ছে। অনেক পরিবর্তনই আসছে তাকে মেনে নিতে হবে মা।

প্রভা বলে—পরিবর্তন হয় হোক, ভালোর জন্য যদি হয় ভালোই। ওতো সর্বনাশের শুরু রে। গড়া নয় ভাঙার পালা।

প্রবীর বলে—মা, জমিদারি গেছে। বনজঙ্গলও সব সরকার নিয়ে নিয়েছে—এত এত কোলিয়ারি সব নিয়ে নিয়েছে।

প্রভা বলে—এবার সামান্য জমি-জারাত বর্গাদার দখল নেবে, গ্রামের শান্তি কেড়ে নেবে। দেবেটা কি বলতে পারিস?

প্রবীর জানে কি পেতে পারে সে ঠিক মাথা ঠাণ্ডা করে এই পথে চললে। তাই বলে,

—নদীর একদিক ভাঙে, অন্যদিক গড়ে ওঠে মা। কিছু লোকের ভালোই হবে।

--হবে ওই চোব ডাকাতদের।

রেখা বলে-না-মা। জনসাধারণের ভালোই হবে। গণতন্ত্র--

প্রভা বলে—তোমার লেকচার ঘরে আর দিও না বাছা। আমার ভালো লাগে না। কি যে হচ্ছে।

সারা অঞ্চলের মানুষ দেখে এবার ভোটের এক নতুন চেহারা এসব নিয়ে এতদিন কোন মাতামাতি, মারপিট হয় নি, ভোট দিয়েছে সবাই।

কিন্তু এবার ওই সদ্য গজিয়ে ওঠা মানুষগুলো ভোটের বুথেও অনেককে যেতে দেয় নি, তারাই বুথ ঘিরে রেখেছে। আটকেছে অনেককে-বনের পথে ভিন গ্রামের মানুষদের শাসিয়েছে।

—কেউ যাবি না ভোট দিতে।

তারপর দুচারটে বোমও ফাটিয়েছে। নিরীহ মানুষ-মেয়েরাও আর বের হয়নি। প্রভাদেবী বুথে গেছেন কয়েকজন মহিলার সঙ্গে। দেখা যায় তাদের ভোট হয়ে গেছে।

—সেকি! আমরা এই আসছি।

পোলিং অফিসারকে এরা ঘিরে রেখেছে। তিনি বাইরের মানুষ। এসে দেখেছেন এদের কার্যকলাপ। প্রবীর, দেগায়ের নীতিন-গদারডিহির নরেশ কর্মকার এরা লোকজন নিয়ে ঘুরছে।

রেখাও বের হয়েছে মেয়েদের নিয়ে। কিছু মেয়েও জুটে গেছে ওদের দলে। পোলিং অফিসার বলেন—আপনাদের ভোট তো হয়ে গেছে।

প্রভাদেবী বের হয়ে আসে। ওদিকে বিভূতিবাবুর দলবল এখন কোণঠাসা। এদেরই দাপাদাপি চলছে। প্রভাদেবী বলে বিভূতিবাবুকে,

—এসব কি হচ্ছে ঠাকুরপো?

বিভূতিবাবুও এইসব দেখে প্রথমে প্রতিবাদ করেছিলেন, তার দলের পোলিং এজেন্ট ভূতনাথকে এরা ধমকে থামিয়ে দেয়। প্রবীরই বলে,

—চুপ করে থাকো ভূতনাথ, নাহলে ভালো হবে না।

বিভূতিবাবু প্রভাদেবীকে বলেন—যা হচ্ছে তা তো দেখছেন। সব মিথ্যার এই শুরু এর শেষ কোথায় হবে জানি না।

পোলিং অফিসারও দেখেছেন সব। ভোটপর্ব চুকে গেছে। তবু বেশ কিছু বুথে বিভূতিবাবুদের দল জিতেছে। প্রবীরদের দলও বেশ কিছু সিটে জিতেছে। এবার শুরু হয় গোলমাল।

বাইরে থেকে কারা শিকল তুলে আটকে দিয়েছে পোলিং অফিসারকে ঘরের মধ্যে। প্রবীরও রয়েছে। ওরা বলে-ওসব জেতা নয়-হারাই। ওরা ওসব সিট পায়নি। নতুন করে গুনে দেখুন—নাহলে ঘরেই আটকে থাকতে হবে।

বড়রাস্তা থেকে দূরে প্রত্যন্ত গ্রাম। ওদিকে শালবন গ্রামের বাইরে স্কুল বাড়িতে ভোট হচ্ছে, এই নির্জন প্রান্তরে আটকে রেখেছে পোলিং অফিসারকে ওরা।

রাত বাড়ছে খাবার জল অবধি নাই—খাবার তো দূরের কথা। কেউ বাঁচাবারও নাই। শেষ অবধি পোলিং অফিসার প্রবীরদের দলকেই বিজয়ী ঘোষণা করতে বাধ্য হয়ে ছাড়া পেলেন।

রাত তখন দুপুর।

পরদিন সকালে বের হলো বিজয় মিছিল। প্রবীরই হিরো। মাথায় আবীর, দলের সকলেই আবীর মেখে বাদ্যভাণ্ড সহকারে সারা এলাকা ঘুরে বেড়িয়ে এবার পঞ্চায়েত দখল করলো। আর প্রবীরই হলো নতুন প্রধান।

এক একটা করে সব কিছুরই দখল নিতে হবে তাদের। তাই এবার একটা অফিসই তৈরি করে, যেখানে ওদের দলের মিটিং-কাজ কর্ম সব চলবে। ওদিকেই সেই দলের পাকা বাড়ি তৈরি হচ্ছে।

প্রবীর বলে,

—দলের বাড়ির জন্য জনসাধারণের কাছে দান সংগ্রহ করতে হবে। হাটতলায় হাটের দিন-অন্যদিন গ্রামে গ্রামে কর্মীদের হাতে বেশ কিছু কৌটা তুলে দাও। তাতে জনসাধারণের কাছে অফিস তৈরির জন্য চাঁদা তুলবে।

এখন বেশ কিছু বেকার ছেলেও তাদের দলে জুটেছে! কিছু রিকশাওয়ালা শ্রেণীও গজিয়েছে। তারাও এখন এদের আশ্রয়ে ক্ষেত মজুর-অন্যদের অনেকেই এসেছে দলে, তারাই উৎসাহী হয়ে কৌটা বাজিয়ে পয়সা তুলতে থাকে।

নিশীথ বলে,—ওতে কত সংগ্রহ হবে প্রবীরদা? ঘর হবে না তাতে।

প্রবীর বলে—অফিস ঘর হবে পঞ্চায়েতের টাকা থেকেই এদিক-ওদিক করে। লোকে জানবে জনসাধারণের পয়সাতেই অফিস হলো। সবদিক সামলে চলতে হবে তো রে।

নরেশ অবাক হয়—তা হলে তো ভালোই হয়। আর কৌটার টাকা?

—প্রবীর বলে—ওটা ছেলেদের মধ্যে ভাগ করে দিবি। ওরা এত খাটছে কিছু পাইয়ে না দিলে দলে থাকবে কেন? ছিটেফোঁটা তো ওদেরও দিতে হবে।

এবার পঞ্চায়েত থেকে গ্রাম্য রাস্তা-বাঁধ সংস্কার-এসবের জন্যও টাকা এসেছে। এসব অঞ্চল খরাপ্রবণ-তাই গ্রীষ্মকালে চাষের কাজ থাকে না। প্রবীরই সদরে আন্দোলন করে রিলিফের জন্য টাকা-গম এসবও এনেছে।

নানা কাজও শুরু হয়েছে। গ্রামের লোকও দেখে সেটা।

এরপর স্কুল কমিটিকেও দখল করতে হবে।

এই স্কুলের জায়গা দান করেছিলেন পাশের গ্রামের জমিদার শ্রীকান্ত চৌধুরী। এক লপ্তে বারো বিঘে জমি-তাতে বেশ কিছু বড় বড় আম কাঁঠালের গাছও রয়েছে। একদিকে গড়ে উঠেছে স্কুল-ওদিকে বোর্ডিংও করতে হয়েছে দূরের ছাত্রদের জন্য।

বিভূতিবাবু-ওই শ্রীকান্তবাবুদের আমলেই গার্লসস্কুলের পত্তন হয়। ক্লাশ এইট অবধি স্কুল চলছে মেয়েদের জন্য। এবার স্কুল কমিটির বিরুদ্ধেই নানা কথা উঠতে থাকে।

প্রবীরের দলই গ্রামে গ্রামে হাওয়া তোলে। স্কুলের কাজ ঠিক মত হচ্ছে না। মেয়েদের স্কুল নিয়েও অনেক কথা ওঠে। তারপর ওরাই শুরু করে আন্দোলন-মেয়েদের জন্য আলদা স্কুল করতে হবে।

আর অভিভাবকদেরও সঙ্গে নিয়ে আন্দোলনে নামে।

শ্রীকান্তবাবু এতদিন স্কুলের গর্ভনিং বডির চেয়ারম্যান ছিলেন। আর সদস্য ছিল অনেকেই। বিভূতিবাবুও ছিলেন কমিটিতে।

এবার নতুন নির্বাচনে প্রবীর খাড়া করেছে শ্রীকান্তবাবুর খুড়তুতো ভাই শেখরবাবুকে। শেখর প্রবীরের কাছের লোক। ওরাই এবার নানা কৌশলে স্কুল কমিটিরও দখল নিল। শ্রীকান্তবাবুও এসব গোলমাল পছন্দ করেন না। তিনিও ছেড়ে দিলেন।

নতুন বিলডিং তৈরি হচ্ছে, লাখ কয়েকটাকার কাজই হবে। প্রবীরও ভেবেছে কথাটা। সেদিন সুবীরকে বলে—চাকরি ছাড়া সাইড বিজনেস কিছু কর সুবীর, পয়সা কিছু আসবে।

প্রভাদেবীও রয়েছে সেখানে। সুবীর বলে,

—সাইড বিজনেস? সেটা কি মেজদা?

প্রবীর বলে—স্কুলের বিলডিং তৈরি হবে। তুই কনট্রাক্ট নে। টাকা স্কুল ফান্ড থেকেই দেবে। মিস্ত্রী মজুর লাগিয়ে একটু দেখাশোনা করে যাবি। আমিও দেখাশোনা করবো। ফাঁক থেকে কিছু টাকা এসে যাবে।

প্রভা প্রবীরের কথাগুলো শুনছে। এখন প্রবীর খুবই ব্যস্ত।

স্কুল যায়, কিছুক্ষণ থেকেই পঞ্চায়েত অফিসে গিয়ে বসে। নানা কাজের ব্যাপার চলে সেখানে।

সুবীরও মেজদার কার্যকলাপ দেখছে। ওদের মানসিকতার সঙ্গে ঠিক মেলে না সুবীরের। সুবীর বলে,

—মেজদা, বেনামিতে তুমিই ঠিকাদারি করতে চাও?

—মানে? প্রবীর চাইল।

ওর মনোভাব ধরে ফেলেছে সুবীর। সুবীর বলে,

—লোকে এর মধ্যেই অনেক কথা বলতে শুরু করেছে দাদা। একটু রয়ে সয়ে চলো। স্কুলে কাজ না করেই মাইনে নাও। পঞ্চায়েতের প্রধানপদেও নাকি মধু আছে-আবার এসবও করতে চাও? লোভের শেষ নাই। তোমার ওসব কাজ আমার দ্বারা হবে না। চাকরি করছি বেশ আছি।

প্রবীর বলে—তোর ভালোর জন্যেই বলছিলাম। ঠিকেদারি শুরু কর—কাজের অভাব হবে না। চাকরিতে কত টাকা দেয়?

প্রভা বলেন—নিজেরা যা করছিস কর বাপু, আবার ওকে দলে টানা কেন?

প্রবীর চুপ করে যায়। গার্লস স্কুলে এর মধ্যে রেখা কেরানির চাকরিতে ঢুকে গেছে। প্রভা বলেন—ঘরের বৌও চাকরি করবে?

প্রবীর বলে—ঘরের খেয়ে মেয়েদের ইস্কুলে চাকরি করবে এতে দোষ কি?

প্রভা চুপ করে যায়। বেশ বুঝেছে প্রবীরের হিসাবই আলাদা। ওকে নিরস্ত করা যাবে না।

প্রভাদেবীর মনে হয় ক্রমশ দিন বদলের সঙ্গে সংসারের রূপটাও বদলাচ্ছে। এখন এরা বড় হয়েছে। আর মা—বড়দাদার উপর নির্ভরশীলও নয়। এখন ওরা নিজেদের পথেই চলবে, তাদের আর আঁকড়ে ধরে কাছে রাখা যাবে না। তাই দূরত্বটাও বেড়ে ওঠে প্রভার মনে। কেমন যেন নিঃসঙ্গ বোধহয় তার।

প্রবীর রেখা বাইরে থাকে দিনের বেশিক্ষণ। সুবীরও বের হয়ে যায় কারখানায়। প্রভা আর বাড়ির রান্নার বামুন মেয়ে দুজনেই থাকে বাড়িতে। সংসার করার যেন প্রভার আর কিছু নাই।

ক্লান্ত উদাস দুপুরের রোদ কাঁদে বাঁশবনে-ঘুঘুর একটানা ডাক ওঠে-প্রভা মাঝে মাঝে রামায়ণ, মহাভারত না হয় রামকৃষ্ণদেবের কথামৃত নিয়ে বসে-পারুল মালতী আর দুচার জন মহিলা আসে। ওই পাঠ করে কিছু সময় কাটে।

এবার সুবীরের বিয়ে দিয়ে প্রভা যেন সংসার থেকে ছুটি পেতে চায়। এমনিদিনে সমীর বাড়ি আসে।

সমীর দেখেছে প্রবীব রেখা এখন খুবই ব্যস্ত। ওরা এই পুরনো বাড়ির ওদিকে বেশ খানিকটা জায়গা কিনেছে-ওখানেই তারা নতুন বাড়ি তৈরি করছে। এখন প্রবীর অনেক উপরে উঠতে চায়। একটা জিপও কিনেছে।

প্রভা সমীরকে বলে—এদের ভাবগতিক ঠিক বুঝি না বাবা। এই বাড়িতে সুবীরকে রেখে ওরা নিজেরাই সরে যেতে চায়।

সমীর বলে—এনিয়ে দুঃখ করে কোন লাভ নেই মা। ওরা যদি নিজেদের মত থাকতে চায়-তাই থাকবে। তার জন্য দুঃখ করে লাভ কি?

প্রভা বলে—ওদের তো চলে যেতে বলিনি—ওরাই আমাদের ছেড়ে সরে থাকতে চায়।

—তাই থাকবে মা। দুনিয়ার এই তো নিয়ম। এটাকে সহজভাবে মেনে নিতেই হবে! না হলে দুঃখই বাড়বে মাত্র। মা-কোন প্রত্যাশা নিয়ে তো আমাদের মানুষ করোনি, কর্তব্য হিসাবেই করেছো। তবে তোমাকে কেউ দেখলে না-এর জন্য দুঃখ করো কেন?

—মন মানে না রে। প্রভা কাতর স্বরে বলেন।

সমীর বলে—দিন কতক কলকাতায় চলো। সেই এসে ঢুকেছো এখানে। আর বের হওনি। কষ্টই করেছো। চলো কিছু দিন ঘুরে আসবে।

প্রভাদেবী বলে—কিন্তু সুবীর রয়েছে।

সুবীর বলে—আমার জন্য ভেব না। বামুন মাসি তো রইল—দুমুঠো অন্ন চারখানা রুটি ঠিকই জুটে যাবে। যাও তো-দিন কতক এই খান ছেড়ে ঘুরে. এসো, মনটা ফ্রেস হবে।

প্রভাদেবী বলে—তাহলে চল। বৌমা-দাদুভাইকেও দেখে আসবো।

সীমাও শাশুড়িকে আসতে দেখে খুশিই হয়।

প্রভা এসেছে কলকাতায় সমীরের বাসাতে। বাসন্তীদেবীও নেমে আসে। সীমাই পরিচয় করিয়ে দেয়—মা, এই মাসিমা, আর বৌদি রমা।

প্রভাদেবী গ্রামে থাকলেও এর আগে স্বামীর সঙ্গে বাইরে বাইরে ঘুরেছে। সব পরিবেশেই মানিয়ে নিতে পারে, পল্লীগ্রামের গোঁড়ামি তার নেই।

শ্যামলীও এসেছে খবর পেয়ে।

তাহলে শেষ অবধি কলকাতাতে এলে জেঠিমা।

চলো দক্ষিণেশ্বর. বেলুড়-কালীঘাট। আমিই দেখাবো সব।

প্রভা দেখছে শ্যামলীকে। বলে সে,

—ওসব তো দেখাবি। এবার বিয়ে-থা কর শ্যামলী। তোর বরকে দেখি। চিরকাল কি পড়াশোনাই করবি? ঘর-সংসার কর এবার।

শ্যামলী বলে—দেখি ভেবেচিন্তে।

—ওমা এখনও ভাবতে হবে?

শ্যামলী এখন নিজের বাসাতেই রয়েছে। গোলদিঘীর কাছেই বাড়িটা। এখন কলেজের প্রফেসারির সঙ্গে রিসার্চ করছে। সেই সুবাদে লাইব্রেরিতেও অনেকটা সময় কাটাতে হয় পড়াশোনার জন্য। এখানেই দেখা হয় ললিতের সঙ্গে।

একসঙ্গে ইউনিভার্সিটিতে পড়তো। ললিত সাধারণ ঘরের ছেলে—পোশাক আশাকেই সেটা বোঝা যেতো। কিন্তু কৃতী ছাত্র তাই ছাত্র মহলে তার সুনামও ছিল।

শ্যামলীও চিনতো তাকে। শ্যামলী তখন হোস্টেলে থাকে। ললিতও ক্লাশ থেকে বের হয়ে এসে কলেজ স্ট্রিটে পুরনো বই এর সন্ধানে ফুটপাথে ঘোরে—শ্যামলীও। ললিত বলে,—তোমারও কি এই নেশা আছে?

শ্যামলী বলে—দেখতেই পাচ্ছো।

ললিত বলে—অবশ্য আমি আসি পয়সা বাঁচাতে। এখানে কম পয়সাতেই কাজ হয়। পয়সা যাদের নেই তাদের এখানে আসতে হয়।

শ্যামলীর ওর স্পষ্ট কথাটা ভাল লাগে।

শ্যামলীই ওকে কফি হাউসে নিয়ে আসে। ললিত ওই পরিবেশ দেখে বলে এখানে অবশ্য আড্ডাটা ভালো জমে, কিন্তু সে সময় তো আমার নেই।

—কেন? পড়াশোনার তাড়া রয়েছে?

শ্যামলীর কথায় বলে ললিত—না-না। টুইশানিতে যেতে হবে। খরচা চালাতে দু তিনটে টুইশানিও করতে হয়। এম-এটা ভালো করে পাশ না করতে পারলে কিছুই হবে না।

শ্যামলী ললিতকে তখন চিনতো, ক্রমশ ললিতও শ্যামলীর হোস্টেলে দু একদিন আসে। কখনও কোন বই কখনও নোট নিতে আসে।

সমীরও আসে শ্যামলীর কাছে। সেদিন ললিত শুধোয় শ্যামলীকে—ওই ছেলেটি কে?

শ্যামলী জানায়—আমাদের গ্রামের ছেলে। এখন লেখায় বেশ নাম করেছে। সমীরের দু'একটা বই-তার সদ্যমুক্তি পাওয়া সুরেশবাবুর ছবিটার নাম করে বলে—ওরই গল্প। ললিত চুপ করে যায় কোন গুরুত্বই দেয় না। ললিত ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করে।

শ্যামলীরও মনে ললিতের জন্য কিছু সমবেদনা আছে। অনেক লড়াই করে সে পড়াশোনা করে।

শ্যামলীকে এক দুপুরে নিয়ে গেছে ললিত ওর মেসে কয়েকটা জরুরী নোট দেবার জন্য। অন্ধকার গলির মধ্যে একটা পুরনো বাড়ির একতলার ঘরে তিনজনে কোনমতে থাকে। দিনের বেলাতেও আলো জ্বালাতে হয়।

আর খাওয়া-দাওয়া সারে ওদিকেরই একটা পাইস হোটেলে। অন্ধকার ঘর-কয়েকটা শীতল পাটির ছোট ছোট আসন রয়েছে এক দিকে। খদ্দেরদের নিজেদেরই সেই আসন পেতে নিতে হয়। জায়গা থাকলে তারপর পয়সার হিসাবে ভাত ডাল তরকারী মেলে আর মাছের দামও আলাদা।

শ্যামলী দেখছে ললিতের জীবন যাত্রার ব্যবস্থা।

ললিত বলে—চার টাকায় পেটভরে ডাল ভাত তরকারি হয়ে যায়। বাঁধা খদ্দের তাই এক টুকরো লেবুও দেয়। তবে মাছের এইটুকুন পিশ দুটাকা। নিশাকরের হোটেল তবু সস্তা তাই এখানেই খাই।

ঘরটায় তেল ঝাল ডালের একটা বোটকা গন্ধ মিশে আছে। ললিতের কষ্টও হয়।

শ্যামলীই সেবার পরীক্ষার পর ওকে পার্ক স্ট্রিটের দামি রেস্তরাঁয় নিয়ে গিয়ে খাওয়ায়। সেদিন দেখেছিল শ্যামলী ললিতের মুখে তৃপ্তির আভা। অনেক দিন পর যেন সুখাদ্য খাচ্ছে সে।

ললিত মাঝে মাঝেই আসে শ্যামলীর কাছে। শ্যামলীও ওর সঙ্গে বের হয়। ওকে নিয়ে চৌরঙ্গী পাড়ায় কোন রেস্তরাঁয় যায়। ললিতই বলে,

—চলো, নন্দনে একটু বসা যাক।

শ্যামলী দেখেছে ইদানীং ওই নন্দন রবীন্দ্রসদনকে ঘিরে কলকাতার উঠতি ছেলে মেয়েদের একটা অবাধ বিচরণক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। সংস্কৃতির নতুন পীঠস্থানে একদল তরুণ তরুণী কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে উদাস চাহনিতে ঘোরে আর এখানে ওখানে বসে সংস্কৃতির সাধনা নামে প্রেমালাপই করে। ও আজ এর সঙ্গে জমছে তো ক'দিন পর জমছে অন্যের সঙ্গে।

শ্যামলী বলে ললিতকে—আজকাল প্রেম ট্রেম করছ নাকি? যে ওই নন্দনের ডেলি প্যাসেঞ্জার হয়ে গেলে। টুইশানির তাড়া নেই?

ললিত বলে—আজ যেতে মন চাইছে না। চল একটু ঘুরে বেড়াই।

শ্যামলী বলে—তোমারও দেখছি ঘোড়ারোগে ধরেছে।

হাসে ললিত। ক্রমশ ললিত যেন সাহসী হয়ে উঠছে। শ্যামলীও দেখে ওর মনের সেই নীরব কামনাকে।

পরীক্ষার পর বেশ কিছুদিন আর ললিতের দেখা মেলে না। বোধহয় দেশেই ফিরে গেছে। শ্যামলীও অধ্যাপনার কাজ নিয়েছে। হোস্টেল থেকে সরে এসে নিজেই বাসা করেছে। বেশ কিছুদিন কেটে গেছে।

সেদিন সকালে নিজের বাড়িতে পরীক্ষার খাতা দেখছে শ্যামলী। অধ্যাপনার কাজটা তবু ভালো লাগে। ক্লাশে কোন একটা বিষয়ে সে লেকচার দিতে ভালোই পারে। নিজের সাবজেক্টে তার কিছু জ্ঞান আছে। পড়াতে ভালোই লাগে। কিন্তু ছাত্রীদের পরীক্ষার খাতা দেখতে বসে মনে হয় যেন বাস্তবে তারা পড়ায় না। ছাত্রীদের উত্তরপত্র দেখলে তাই মনে হয়।

খাতায় যা সব উত্তর লেখে তা দেখলে মাথায় রক্ত ওঠে। শ্যামলীর মেজাজটা সকালেই বিগড়ে যায়। এমন সময় তার কাজের মেয়ে এসে খবর দেয়—

—এক ভদ্রলোক তোমার সঙ্গে দেখা করতে চান দিদি।

—কে? শ্যামলী জানে সমীর নয়, সে তো সোজাই চলে আসে আর সাবিত্রীও তাকে ভালো করেই চেনে। তাই বলে,

--কে রে?

সাবিত্রী বলে—প্যান্ট সার্ট পরে এসেছে গাড়ি থেকে নামলো। দেখলাম বাড়ির নাম্বার খুঁজে খুঁজে এখানেই এলো। তিনিই বললেন—আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

শ্যামলী ভাবনায় পড়ে। কে আসবে গাড়িতে করে। দাদাকেও চেনে সাবিত্রী, দাদা বৌদিও বাঁকুড়া থেকে দু চার বার গাড়ি নিয়ে এসেছে। কিছু ঠাওর করতে না পেরে বলে,

—বসতে বল, যাচ্ছি।

ড্রইংরুমটা শ্যামলী নিজের রুচিমতই সাজিয়েছে। মেজোতে কার্পেট পাতা, একটা সোফা সেট। সেন্টার টেবিলে ফুলও রাখে রোজ। আলমারীতে বেশ কিছু বই-এর সংগ্রহ। দু একটা ছবি।

শ্যামলী এর মধ্যে উঠে মুখে চোখে জল দিয়ে শাড়িটা বদলে চুল গুলোকে ঠিক করে ড্রইংরুমে এসে দেখে ললিতকে।

আগেকার সেই ধুতি ময়লা পাঞ্জাবি আর নেই । পরনে দামী স্যুট, টাইও পরেছে ম্যাচ করে। মাথার চুলগুলো সুন্দরভাবে আঁচড়ানো। সিগ্রেট টানছে। শ্যামলী অবাক হয়।

—তুমি! ললিত।

ললিত দেখছে শ্যামলীকে। আগে মুখ তুলে চাইতে সাহস পেত না। মাথা নীচু করে থাকতো ভিজে বেড়ালের মত। এখন ওর চোখে লোভী ধূর্ত বিড়ালের মত তীক্ষ্ণ সন্ধানী চাহনি। শ্যামলীর শরীরটাকে যেন জরিপ করে দেখছে।

শ্যামলীর এটা নজর এড়ায় না। ওই প্রসঙ্গ এড়াবার জন্যই বলে সে,—এতদিন পর দেখা। একেবারে ভোল বদলে ফেলেছো যে ললিত।

ললিত বলে—তোমার চেহারাও বদলেছে শ্যামলী।

—সময়ই বদলায়। চেহারা বদলাবে না?

শ্যামলী সাবিত্রীকে চা আনতে বলে শুধোয়,

—ঠিকানা পেলে কোথায়?

ললিত বলে—তোমার হোস্টেল থেকে। ওখানের সুপারই দিলেন।

ললিত এবার তার নিজের কথাই শুরু করে। এম-এ পরীক্ষার পর দেশেই চলে গেছল। কলকাতার খরচাও বেড়েছে, কাজও নাই। সেখানে কোন নেতার হয়ে কিছুদিন ভোটে কাজ করে প্যামফ্লেট-ইস্তাহার এসব লিখে দিত, মায় মিছিলের স্লোগানও তৈরি করে দিত সে। বেশ জোরালো, চটকদার স্লোগানগুলো লোকের মুখে মুখে ফিরতো। সেই দাদাও খুব খুশি।

ললিত দাদার খুব কাছের মানুষ হয়ে গেল। আর ঝড়ে কাক মরে ফকিরের কেরামতি বাড়ে। তেমনি সেই দাদা প্রচারের গুণে আর ছলে বলে কৌশলে ভোটের বাক্স তার ব্যালটেই ভরানোর জন্য বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে গেলেন—তিনি পুরনো এম-এল-এ। তাই মন্ত্রীই হয়ে গেলেন। অবশ্য সেই দাদার আসলে কাঠের ব্যবসা, করাতকল কাঠ গোলা এসবের ব্যবসা, লেখাপড়ার ধার ধারেন না। কাঠের কিউবিক ফিটের হিসেব, কাঠের লগের স্বরূপ এসবই জানেন। মন্ত্রীদের ইংরাজী পড়তে হয়। তাই ললিতকেই তিনি পি-এ করে নিলেন।

ততদিনে এম-এর রেজাল্ট বের হয়েছে। ললিত মোটামুটি ভালো রেজাল্টই করেছিল—আর বুদ্ধি করে পাবলিক সার্ভিস কমিশনে পরীক্ষাও দেয়।

চা এসে গেছে। শ্যামলী শুনছে ললিতের কথা। ক' বছরেই সেই ললিত এখন একেবারে বদলে গেছে, চায়ের কাপে চামচ নাড়াতে নাড়াতে বলে ললিত—

সেই মন্ত্রীই চেষ্টা চরিত্র করে আমাকে ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টে পোস্টিং দিলেন এখন কলকাতাতেই রয়েছি সেচ ভবনে।

তারপরই বলে সল্টলেকেই রয়েছি, অবশ্য অফিস থেকে গাড়িও দেয়।

তাহলে ভালোই আছো? শ্যামলী বলে। ললিতের চিবুকের নীচে এর মধ্যে একটু নিটোল ভাব দেখা গেছে, গালেও মাস লেগেছে। ললিত বলে--

চলছে একরকম, তা তুমি তো গার্লস কলেজে প্রফেসারি করছ।

হ্যাঁ এবার পি-এইচ ডি হয়েছি।

হাসে ললিত—কি জীবন ভোর লেখাপড়া নিয়ে রইলে।

অর্থাৎ লেখাপড়ার থেকেও অন্য কিছু করনীয় মহত্তর কাজ আছে সেটা যে এর মধ্যেই বুঝে গেছে। পকেট থেকে কার্ড বরে করে দেয়।

এটা রাখো একদিন এসো আমার অফিসে, ওদিকে তো যাও, একদিন না হয় পায়ের ধুলোই দিলে, বলো তো গাড়ি পাঠিয়ে দেব—

শ্যামলী বলে—না-না তার দরকার হবে না।

শ্যামলীকে ভোলেনি ললিত, এতদিন সে ছিল বঞ্চিতদের দলে, দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করেছে, মনেমনে ছিল তার অদম্য লোভ, বাসনা, তাকে অনেক কিছুই পেতে হবে।

তাই ওই নেতার পদসেবাও করেছে নিজের স্বার্থে—একটা ভালো চাকরিই বাগিয়েছে, সে এখন বিভাগীয় প্রধান।

সাজানো অফিস-বেয়ারা, অফিসে মাথা ঠাণ্ডা রাখার জন্য এয়ারকুলার মেসিন চলছে, বড় বড় ঠিকাদাররা আসে—বিশাল টাকার মালিক মন্ত্রীদের সঙ্গে ওঠা বসা তাদের।

সুন্দরবন এলাকায় বহু নদী বাঁধ আছে, মাইলের পর মাইল বাঁধ, ঘেরি, ওসব বাঁধ বাঁধার জন্য পথ ঘাট করার জন্য কোটি টাকার বরাদ্দ।

তার অনেকটা খরচ হয় ললিতের কলমের খোঁচায়। তাই অনেকেই এখন তার কৃপাপ্রার্থী। দীর্ঘ বাঁধ এর জন্য পঞ্চাশ-ষাট-আশি লাখ টাকার বরাদ্দ।

তার থেকে একটা অংশ সেও পায় তবে ললিত এর মধ্যে জেনেছে দাদাদেরও সেবা করতে হবে, সে একা খায় না, প্রণামী যথাস্থানে পৌছে দিয়েও তার বেশ কিছু থাকে।

এখন তার টাকার অভাব নেই, গাড়িতে ঘোরাফেরা করে, এবার সে তার একটা স্বপ্নকে সার্থক করতে চায়, তাই মনে পড়ে বার বার শ্যামলীর কথা।

মাঝে মাঝে ওই ঠিকাদারদের পার্টিতেও যেতে হয়। তারাও স্যারকে আপ্যায়ন একটু বেশি মাত্রাতেই করে, হোটেলের রুমে নিয়ে। ললিত এর মধ্যে ওই জীবনে রপ্ত হয়ে গেছে।

এখন সে বুঝেছে টাকা-প্রতিষ্ঠাই জীবনের সবচেয়ে বড় প্রাপ্য আর তাই তার পিছনেই দৌড়েছে সে।

সেদিন শ্যামলী সল্টলেকে গেছে কোন অফিসে—একটা জায়গার চেষ্টা করছে সে, এখানে অধ্যাপকদের কোটায় একটা জায়গা পাওয়া যেতে পারে তাই এসেছিল, কলকাতাতেই থাকতে হবে তাকে, তাই ভাড়া বাড়িতে না থেকে নিজেরই একটা আস্তানা বানাতে চায়।

ওই অফিসে কাজের পর বের হয়েছে মনে পড়ে ললিতের কথা, তাই পাশেই সেচ ভবনের দিকে এগিয়ে যায়।

ললিত তখন সেঠ নাথুমলজীর সঙ্গে গূঢ় আলাপে ব্যস্ত। নাথুমলজী বড় কনট্রাক্টার, নদী বাঁধ—বড় ব্রিজ এসবই বানায় সে।

একটা বড় কাজের আশায় নাথুমল ক'দিন থেকেই ঘুরছে, ললিতও বাজিয়ে নিতে জানে, ক'দিন ধরে শেঠজীকে দম দিচ্ছে সে, এবার শেঠজীও রাজি হয়েছে তার দরে।

শেঠজী এর মধ্যে সাইট ঘুরে এসে হিসাব করেছে কত পরিমাণ কাজ ফাঁকি দিতে পারবে সে। তারপর এসেছে। আজই সাহেবকে প্রণামী দিয়ে বাত পাক্কা করে টেন্ডার দেবে আর তার টেন্ডারই অ্যাকসেপ্ট করবেন সাহেব।

শেঠজী প্রণামী দিয়ে বের হয়ে গেছে, ললিতও খুশি, এবার ভালোই আমদানি হবে, কয়েক লাখ টাকাই পাবে ঠিকমত সব কাজ হয়ে গেলে।

এমন সময় শ্যামলীর কার্ডটা নিয়ে আসে বেয়ারা, ললিতের মেজাজ আজ খুশ, বলে সে।

নিয়ে এসো ওকে, আর শোনো ক্যানটিন থেকে ভালো কাটলেট দুটো আর এক পট কফি নিয়ে এসো।

শ্যামলী দেখছে ললিতকে। তার চোখে ভেসে ওঠে অতীতের সেই নিঃস্ব ময়লা ধুতি পাঞ্জাবী পরা ললিতের মুখ, আসনে বসে পাইস হোটেলে ডাল ভাত তরকারি খাচ্ছে পাটের আড়তের বুড়ো মুহুরী, সোনার দোকানের কারিগরদের সঙ্গে মাছও জোটে না সব দিন, বাড়তি দুটো টাকা খরচার জন্য। পুরনো বই কিনে পড়তো। এর তার বইও ধার নিতো। মনে হয় জনতার মিছিলে গলা ফাটিয়ে ওর চিৎকার।

—ভোট দিন, ভোট দিন।

আজ তার দিন বদলেছে। রিভলভিং চেয়ারটায় বসে খুব পাক খাচ্ছে যেন দোলনায় দুলছে কোন খোকা। ঠান্ডা ঘর, ওভাল শেপের টেবিল—

—এসো! এদিকে হঠাৎ? কি ভাগ্যি।

ললিত যেন আজ শ্যামলীকে তার বৈভব দেখাতে চায়। বোঝাতে চায় সেও আর পথের মানুষ নয়।

শ্যামলী বলে—এসেছিলাম একটা জমির অ্যলটমেন্টের জন্য। একটা ছোট প্লট পেতে পারি সল্টলেকে।

—আরে অ্যালটমেন্টের ব্যাপার তো ল্যান্ড রেভিনিউ অফিসে মিঃ ব্যানার্জি দেখে। আমার খুব চেনা। যদি বলো—

শ্যামলী বলে—ধন্যবাদ ললিত। তার দরকার হবে না। ও'রা চিঠি ইস্যু করে দিয়েছেন।

—ভেরি গুড! কোন অসুবিধে হলে বলবে।

এর মধ্যে কাটলেট এসে গেছে, ফ্ল্যাস্কে কফিও। আজ ললিতই তাকে আপ্যায়ন করছে।

ললিত বলে—তাহলে সল্টলেকে বাড়ি করছ। তাই করো—ওই পুরনো কলকাতায় কি করে মানুষ থাকে তা জানি না। হরিবল্।

শ্যামলী দেখছে ওকে। বলে সে—তুমিও তো মেসে ছিলে—সেই ঘরটা—

ললিত বলে ওঠে—সামনে এগোতে গেলে পিছনের সব কিছু ভুলে যাওয়াই উচিত।

শ্যামলী দেখছে নতুন এক ললিতকে। এর মধ্যে ফোনেও দু'একজনের সঙ্গে কথা হয় ললিতের। কোন কনট্রাক্টারের পার্টিতে যাবার আমন্ত্রণ অবশ্য সে ক্যানসেলই করে।

বলে—বুঝলে শ্যামলী ওই কনট্রাক্টাররাই যত নষ্টের মূল। কাজে ফাঁকি দেবে—বাঁধ ঠিক মত বাঁধবে না, পয়সা মারবে। আর ওদের গাফিলতির জন্য সারা অঞ্চলের মানুষ ডুববে। আই হেট দেম। ওদের একদম প্রশ্রয় দিই না।

শ্যামলী বলে—তবু তো বন্যা হচ্ছে। বাঁধও ভাসছে। বহু বাঁধ ঠিক মত বাঁধাই হয় না।

ললিত বলে—অসাধু অফিসারের অভাবও নেই। মুষ্টিমেয় কয়েকজন অনেষ্ট অফিসার এত বড় সমস্যার সমাধান কি করে করবে বলো। তবু চেষ্টা তো করতেই হবে। ইটস্ আওয়ার ডিউটি।

শ্যামলী শুনছে ওর জীবনদর্শনের কথা।

বৈকাল হয়ে গেছে। শ্যামলী বলে—চলি।

ললিত বলে—বাড়ি ফিরবে তো? চলো আমি রাইটার্সে যাচ্ছি অনারেবল মিনিস্টারের ওখানে। তোমাকে পথে নামিয়ে দিয়ে যাবো।

সল্টলেক থেকে এসময় বাস খালি পাওয়া মুশকিল। তাই শ্যামলী ললিতের গাড়িতেই উঠেছে। ললিত বলে।

—চাকরি, আর ট্যুর আর মন্ত্রী সামলানো—ওদিকে কনট্রাকটার নিয়ে হাঙ্গামা, একেবারে ফেড আপ হয়ে গেছি। মনে হয় সব ছেড়ে দু চারদিন কোথাও পালাই। দমবন্ধ হয়ে আসছে।

শ্যামলী বলে—কিন্তু এই তো চেয়েছিলে।

ললিত বলে—কিন্তু এখন বুঝেছি ওইটাই সব নয়। জীবনে মানুষের আরও কিছুর দরকার। একটু ঘর—একজন সঙ্গী একটু নিশ্চিন্ত নির্ভর।

শ্যামলী বলে,

—তার জন্য ভাবনা কি ললিত। এখন তুমি কত বড় সাহেব। একটা মেয়ে ঠিক যোগাড় করে নিতে পারবে। কত মেয়ে ধন্যি হবে তোমার ঘরে আসতে পারলে।

ললিত কি ভাবছে।

পথের ভিড় কাটিয়ে সরকারি গাড়ি ছুটে চলেছে।

ললিত বলে,

—তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে শ্যামলী।

শ্যামলী বলে,

—চলে এসো, রবিবার তো ছুটি। যে কোন রবিবার ফোন করে চলে এসো।

গাড়িটা এসে গেছে মহাত্মা গান্ধী রোডে ওদের পাড়ার কাছে। শ্যামলী বলে,

—এইখানেই নামছি।

—কেন বাড়িতে পৌঁছে দিই।

—কলেজ স্ট্রিটে দুখানা বই কিনতে হবে। চলি। এসো একদিন। শ্যামলী নেমে গেল। ললিত কি বলে বোঝা গেল না। গাড়িটা চলে গেল।

শ্যামলী বাড়ি ফিরছে। তার মনে হয় ললিত আজ এক নতুন জীবনের স্বাদেই মত্ত, তার অতীতকেও সে ভুলতে চায়। তার অতীত যেন আজ তার কাছে পরম লজ্জাজনক এক অধ্যায়। যে মানুষ তার অতীতকে ভুলতে চায় শ্যামলীর মনে হয় সে বর্তমানকেও বিশ্বাস করে না ভবিষ্যতের কথা সে ভাবতেও জানে না।

সমীর এখন নতুন লেখা নিয়েই ব্যস্ত। একটা নামী পত্রিকায় তার একটা ধারাবাহিক উপন্যাস বের হচ্ছে। এছাড়াও এবার সারান্দার আরণ্যক জীবন নিয়ে, সেখানের মানুষের কথা নিয়েই একটা উপন্যাস শুরু করেছে।

মা রয়েছে এখানে। সীমা একা খোকাকে নিয়ে সামলাতে পারে না। প্রভাদেবীই নাতিকে সামলায়।

সমীর বাজার যাবে। সীমা বলে—মাছ, একটু মাংসও এনো আর খোকনের জন্য জামা, আমার একটা শাড়িও আনতে হবে।

প্রভা বলে—খোকনের তো অনেক জামা—আর মা শাড়ি তো সেদিন দুখানা কিনলে

আবার শাড়ি! ওসব শাড়ি ফাড়ি না কিনে দু'এক খান গয়নাই গড়াও, ভবিষ্যতে কাজে দেবে। তা নয় শাড়ি কেনা কেন?

সীমা চুপ করে যায় তবে মায়ের কথায় খুশি যে হয়নি তা বোঝা যায় ঠিক। সমীরও দেখেছে মায়ের সেই সংসারী হিসেবগুলোকে আজকের সীমা ঠিকমত মানতে পারে না।

সীমা বড় হয়েছে প্রাচুর্যের মাঝে, তবু এ বাড়িতে এসে এতদিন দেশের বাড়িতে ছিল সেই পরিবেশেই, এখন কলকাতায় এসে সমীরের আয় ব্যয়ের ভারটা নিজেই দেখাশোনা করে। সমীর এতসব টাকা পয়সা, দৈনন্দিন হিসাব-কিতাব রাখে না। রোজগারের টাকা কিছু সরিয়ে রেখে সংসার খরচা সীমার হাতেই দেয়।

প্রভাদেবী কষ্টের মধ্যে সংসার চালিয়েছেন। তাদের ব্যয় ছিল কম আয়ও ছিল সামান্যই। কিন্তু এদের এখানে সীমার বেশি খরচা দেখে দু'একবার প্রতিবাদও করেছে।

সীমা আড়ালে বলে সমীরকে—মায়ের ওই কথাগুলো ভালো লাগে না।

সমীর বলে—ছাড়ো তো। মায়ের ওসব বলা অভ্যাস আর এসব বলেন আমাদের ভালোর জন্যেই। এখন দুটো পয়সা পাচ্ছি। রাখাও তো দরকার।

সীমা ক্ষুণ্ণস্বরে বলে—আমিই তোমার সব টাকা খরচা করছি না?

—একটু হিসেব করে চলতে হবে তো?

সীমা চটে ওঠে—তাহলে এবার তুমিই চালাও।

সমীর বলে—আমার সময় কই!

—তাহলে মাকেই এসব ভার নিতে বলো?

সীমার কথায় সমীর অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। বুঝেছে সীমার মনের অবস্থাটা। বলে সে—এটা তোমার রাগের কথা সীমা।

মা কি দেশের বাড়িতে এসব দেখবেন?

—তাহলে দু'দিনের জন্য এখানে এসে এসব দেখছেন কেন?

সীমা চায় তার কর্তৃত্বে কেউ যেন হাত না দেয়। এ তার নিজের সংসার এখানে প্রভাদেবীর যে বলার অধিকার ন্যায়সঙ্গত নয় সেইটাই জানাতে চায় সীমা।

সমীর অবাক হয় মেয়েদের এই স্বার্থপরতায়। যে মা সর্বস্ব দিয়ে তাদের মানুষ করেছেন আজ তিনি যেন দূরের মানুষ।

সমীর বলে—সীমা, মা যে ক'দিন আছেন সব মেনে নাও।

সীমা চুপ করে থাকে।

সেদিন নসু ভটচায এসেছে এদের বাড়িতে। লোকটা এখন উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়ায়। আপনমনে বকে। আবার মাঝে মাঝে চুপচাপই থাকে।

প্রভাদেবী ওকে দেখে চমকে ওঠে—নসু, তুমি! একি হাল হয়েছে শরীরের?

নসু বলে—কেন বেশ তো আছি। তোফা আছি। দেবা আর দেবী। তা সমীর কই?

প্রভা বলে—বাজারে গেছে। বসো চা খাও। এক্ষুনি এসে পড়বে সমীর। তা মেয়ের কোন খোঁজখবর পেলে? কোথায় গেল মেয়েটা?

নসু ভটচায ফুসে ওঠে—মেয়ে? কার মেয়ে? আমার কোন মেয়ে ছিল না। নাই, নাই।

প্রভা ওর কথায় চমকে ওঠে।

এসময় সমীর এসে পড়ে। চায়ের কাপ শেষ করে ওকে দেখে এগিয়ে আসে নসু ভটচায। বলে সে,

—একটু বাইরে চল সমীর, কথা আছে।

—কি কথা? সমীর অবাক হয়।

নসু বলে—চল তো।

নসু সমীরকে বাড়ির বাইরে আনে। গলিতে লোক চলাচল কমই। নসু বলে সেই হারামজাদীকে দেখলাম।

সমীর অবাক হয়—কাকে?

—ওই সর্বনাশী কাজলীকে। পূরবীতে সিনেমা হচ্ছে নতুন একটা ছবি তাতে ওই হারামজাদী আবার এক কাণ্ড বাধিয়েছে। কোন বেশ্যাপাড়ার মেয়ে সেজেছে।

সমীর শুনেছিল কাজলীর কাছে এখন ছবিতে ছোটখাট চরিত্র করছে। হয়তো এই ছবিতেও করেছে কোন রোল। সমীর বলে—তা তো জানি না।

নসু বলে—দেখবি। ওই হারামজাদি কি চিরকাল আমাকে জ্বালাবে—আমাদের বংশের বদনাম করবে? আমার জীবনটাকে বরবাদ করেও ক্ষান্ত হবে না?

সমীর বলে—সিনেমাতে এখন অনেকেই এসেছে। ওই লাইনে কাজ করেও ভদ্রভাবে বাঁচা যায় নসুদা। সুনামও হয়।

—চুপ কর। নিজে এখন ওই পথে পা বাড়িয়েছিস, তাই এসব কথা বলছিস। কোথায় আছে মেয়েটা কে জানে? তুই তো ও পাড়ায় যাস—দেখাশোনা হয়?

সমীর বুঝেছে কথাটা প্রকাশ না করাই ভালো। তাই বলে,—কই দেখিনি তো। তার কোন সন্ধানও জানি না। আমার যোগাযোগ প্রযোজক, পরিচালকদের সঙ্গে। ছোটখাটো শিল্পীদের ঠিক চিনি না। তাদের খবরও জানি না।

নসুদার মুখ চোখে উত্তেজনা। বলে সে,

— আমি তার খবর বের করবোই আর বুঝিয়ে দেব এই নসু ভটচায কি জিনিস। নিজের মেয়ে বলে তাকে ছেড়ে দোব না। একটা এসপার ওসপার করবই।

চলে যায় নসু দাপাতে দাপাতে।

বাড়ি ঢুকতে প্রভা বলে—কি চেঁচামেচি করছিল রে নসু পাগলের মত।

সীমা বলে—পাগলের মত নয় মা, মেয়েটা চলে যাবার পর ও পাগলই হয়ে গেছে। আপন মনেই বিড় বিড় করে।

প্রভাদেবী বলে—বেচারা। বললাম বাড়ি ফিরেই চল নসু। তা কি বলে জানিস—আমার আসল কাজই শেষ হয়নি। সেটা করেই বাড়ি ফিরে যাবো। আর এখানে কোনদিনই আসবো না।

নসু ভটচায এবার একটা যেন করার মত কাজ পেয়েছে। সে খুঁজে খুঁজে এবার টালিগঞ্জের স্টুডিওপাড়ায় ঘুরছে। মুখে অযত্ন বর্ধিত দাড়ি পরনে ময়লা পোশাক। স্টুডিওতে গিয়ে এদিক ওদিকে ঘোরে-কার সন্ধান করে।

কেউ ভাবে পাগল—কেউ ভাবে সিনেমার হিরো হতে জিরো হয়েই এখন পাক মারছে। কেউ শুধোয়—

—কি চাই? সিনেমায় নামবে? ম্যাড সিনে?

নসু চলে যায়। কোন কথাই বলে না।

সেদিন সমীর স্টুডিওতে ঢুকছে কোন এক প্রযোজকের গাড়িতে, হঠাৎ এক নজর দেখে নসুদাকে। ও ঠিকই চিনেছে। নসু ভটচায দেখতে পায়নি ওকে।

সমীর অবাক হয় এখানে কি করছে নসুদা, কি ভেবে উঠতেও পারে না।

এর মধ্যে কাজলীর সঙ্গে দেখা হয়েছে সমীরের। সমীরের ওই ছবিতেও কাজলী একটা চরিত্রে মনোনীত হয়েছে। কাজলী সেদিন বলে,—তোমার জন্যই রোলটা পেলাম।

সমীর এনিয়ে কিছুই বলেনি পরিচালককে। পরিচালক নিজেই ওকে মনোনীত করেছিল। একটা গ্রাম্য যৌবনবতী মুখরা মেয়ের চরিত্র। সমীর বলে,—নিজের যোগ্যতাতেই ওটা পেয়েছো।

কাজলীই বলে—একটা ছবি এখন চলছে। সেইটার অভিনয় দেখে কয়েকটা কাজই দিয়েছে কয়েকজন পরিচালক। তবু সিনেমা লাইন যাত্রা দুটোর রোজগার বাড়লে অন্যত্র উঠে যাবো সমীরদা। একটু ভদ্রভাবে বাঁচতে চাই—

কাজলী এবার যেন তার নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে। এখন আর করার কিছুই নাই, তবু সে নতুন করে বাঁচতে চায় আবার। সমীরই বলে—ছবিতে নামছো তোমার বাবা সেটা জেনে গেছে।

—তাই নাকি! কাজলী কি ভাবছে।

সমীর বলে,

—সেদিন নসুদাকে এ পাড়াতেও ঘুরতে দেখলাম। ও বোধহয় আজও তোমাকে খুঁজছে। হয়তো ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়।

কাজলী চুপ করে শুনছে কথাটা। বলে সে,

—কিন্তু বাবা কি এসব মেনে নিতে পারবে? গোঁড়া ভটচায বংশ। কথায় কথায় বংশ গৌরবের বুলি আওড়ায়।

সমীর বলে—হাজার হোক বাবা তো। মেয়েকে কে না ভালোবাসে। যদি কোনদিন দেখা হয় নিয়ে যেতে চায় ঘরে বাবাকে ফিরিয়ে দিও না কাজলী। বাড়িতে থেকেও এবার কাজ করতে পারবে।

কাজলীর চোখে জল নামে। আজ সে স্বপ্ন দেখে আবার বাবা মায়ের কাছে ফিরে গেছে। নতুন করে বাঁচতে পারবে সেখানে।

সমীরও চায় কাজলী আবার ঘরে ফিরে যাক। নসুদাও তাহলে স্বাভাবিক হবে। আবার ফিরে পাবে বাঁচার আশ্বাস। তাই মনে হয় সমীর নসুদাকেই এবার কাজলীর ঠিকানাটাই দেবে।

কিন্তু কদিন সে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

বোম্বাই থেকে শান্ত সেন এসেছেন। সমীরকে যেতে হয়েছে গ্রান্ড হোটেলে। সেখানেই চুক্তিপত্র হয়ে যায়। শান্ত সেন সমীরের সুন্দরবনের আবাদ অঞ্চলের পটভূমিকায় লেখা উপন্যাসের হিন্দী বাংলা চিত্ররূপ দেবেন।

আর সমীরকে চিত্রনাট্য লেখার কাজেই হাত দিতে হয়। প্রাথমিক চিত্রনাট্য লেখা হলে বোম্বাইএ যেতে হবে। ওর সঙ্গে বসতে হবে।

সমীর এখন ওই চিত্রনাট্য লেখার কাজে ব্যস্ত। এবার কলকাতাতেই নয়, তার কর্মক্ষেত্র প্রসারিত হতে চলেছে সর্বভারতীয় ছবির জগতে। সেখানে রয়েছে নামী পরিচালক, অভিনেতা, কলাকুশলীর দল। তেমনি সারা ভারতের নামী লেখক চিত্রনাট্যকারদেরও যাতায়াত। সেই জগতে ছাপ রাখার মত কাজই করতে হবে তাকে।

এখানের কাগজে বোম্বাই এর প্রযোজক পরিচালক শান্ত সেনের নতুন ছবির খবর বের হয়। সমীরের গল্প চিত্রনাট্যের খবরও বের হয়।

এর মধ্যে রোহিণীর সঙ্গে দেখা হয়নি বেশ কিছুদিন। রোহিণী কোন মতে ছবির কাজ শেষ করেছিল। তারপর এডিটিং রিরেকর্ডিং এসবও করে রিলিজ্ করার জন্য পরিবেশক খুঁজছে। ভেবেছিল রোহিণী একটা ছবি ফ্লোরে থাকতে থাকতেই আরও ছবির কাজ আসবে। লোহা গরম থাকতে থাকতেই ঘা মারলে সহজে কাজ হয়। কিন্তু লোহাই আর জুটলো না।

ওই ছবির খরচাও নানান জনের কাছে চেষ্টাচরিত্র করে যোগাড় করেছে। ছবি রিলিজ করার খরচাও অনেক। ছবির প্রিন্ট চাই। প্রচারাদির খরচাও কম নয়। কোনমতে নানা জনকে আশা দিয়ে ধার বাকিতে ছবি রিলিজও করিয়েছে। ভেবেছিল তার ছবি জনসাধারণ নেবে, কিন্তু ওই জোড়াতালি দেওয়া ছবিকে দর্শকরা নিল না। এক সপ্তাহ চলার পরই সবগুলো প্রিন্টই বসে গেল।

রোহিণীর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। বাজারে অনেকের কাছেই দেনা। এদিকে সংসার চালানোও মুস্কিল। ছবি করার সময় কিছু টাকা হাতে আসছিল। এখন তাও নেই।

আগে গান লিখেও বেশ কিছু টাকা পেতো। গান লেখাও অনেক দিন হলো বন্ধ হয়ে গেছে।

নিজেই এখন গল্পকার। চিত্রনাট্যকার-পরিচালক হয়ে গাড়ি বাড়ির স্বপ্ন দেখেছিল। ভেবেছিল একটার পর একটা কাজও পাবে, কিন্তু সিনেমা লাইনে যোগ্যতার চেয়ে কৌশলের দামই বেশি। এখানে যোগ্যতা দিয়ে নয় কৌশল করেই ওপরে ওঠে অনেকে। রোহিণী মূলতঃ কবি, কৌশলবাজ নয়।

তাই আজ সে চরম বিপদেই পড়ে।

সমীর কাজ নিয়ে ব্যস্ত। তবু মাঝে মাঝে বইপাড়ায় যায়, প্রকাশকদের সঙ্গেও একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

সেই পত্রিকার সম্পাদকদের সঙ্গে এখন তার প্রীতির সম্পর্ক। স্টুডিও পাড়ার অনেক পরিচালকও তার চেনাজানা।

সেদিন স্টুডিওতে গেছে। কোন পরিচালকের সঙ্গে চিত্রনাট্যের বিষয়ে আলোচনা সেরে বের হচ্ছে। ওদিকে সন্ধ্যা নেমেছে। বোধ হয় ফাল্গুন মাসই। আমের গাছে বোল এসেছে— মিষ্টি সুবাসে বাতাস আমন্থর।

হঠাৎ দেখে ওদিকের বেঞ্চে বসে আছে রোহিণী। মুখ চোখ ম্লান। সেই ঝকঝকে ভাবটাও আর নাই। সমীর এগিয়ে যায়।

—রোহিণী।

রোহিণী চাইল। সমীর ওর পাশে বসে।

—কেমন আছো?

রোহিণী বলে—আর কেমন আছি! সব হিসাব ওলট পালট হয়ে গেল হে। বইটা একেবারে ফ্লপ করলো। ভেবেছিলাম চলবে—আমিও কাজ পাবো। এখন বেকার। মাথায় রাজ্যের দেনা।

এক হতাশ পরাজিত রোহিণী। সমীরও দুঃখ বোধ করে। একজনের পরাজয়ের বেদনা তাকেও স্পর্শ করে। রোহিণী বলে,—এমনি করে হেরে যাবো তা ভাবিনি।

সমীর বলে—হারবে কেন? সব পরিচালকের সব ছবিই কি হিট করে? ফ্লপও হয়। তারা আবার ছবি করেন। তুমিও চেষ্টা করো ঠিক কাজ পাবে।

রোহিণী হতাশ হয়। বলে—দু' একজন আশা দিয়েছিল। তাদের গল্প চিত্রনাট্যও শুনিয়েছিলাম। তারাও বলেছিল করবে কাজ, কিন্তু কেন জানি না আর কাজ করতে চায় না। একজন তো অন্য ডিরেক্টারকে নিয়ে ছবি করছে।

—অন্য প্রযোজক তো আছে। দেখবে ঠিক কাজ পাবে।

রোহিণীও যেন হতাশই হয়েছে। এমনি হতাশাই দেখেছিল সমীর কাজলীর কথায়। এক একটা ভুল করে মানুষ তারপর বোঝে সেই ভুলের জন্য কত মূল্য দিতে হয়।

সমীর কথা পালটাবার জন্যই বলে—উমা-ছেলেরা কেমন আছে?

রোহিণী বলে—ভালোই। জানো—তাদেরও ঠিকমত দেখাশোনা করতে পারিনি। বাবা নিজে এসে তাদের বাড়িতে নিয়ে গেছেন।

—ভালোই হয়েছে রোহিণী।

রোহিণী বলে—ভালো বলছ? ওরা ভালোই আছে সেখানে—কিন্তু আমার পরাজয়ের কথাটা ভাবো। আমাকেও যেতে হয়েছে বাড়িতে, মাথা নীচু করে ফিরে গেছি। রয়েছি বাবার দয়ায়।

রোহিণী যেন ভেঙে পড়েছে। সমীর বলে,

—গান লিখবে?

রোহিণী চাইল। বলে—আগে অনেকেই বলতো গানের জন্য, পরিচালক হবার পর আর পরিচালককে কেউ গীতকারের পর্যায়ে নামাতে চায় না।

হাসে সমীর—তুমি মূলত কবি। পরিচালক জোর করে হতে গেছলে কেন তা তুমিই জানো। কবির সম্মানও অনেক বড়। গানই লিখবে তুমি চলো। আজই কথা বলবে—দরকার হলে আমি তোমায় গানের সিচুয়েশন বুঝিয়ে দোব। আমার ছবিতে গান লিখবে, ওঠো।

সমীরই ওকে তার পরিচালকের কাছে নিয়ে যায়। পরিচালকও রাজি হয়ে যান। রোহিণীর বহু গানই হিট করেছে আগে। আবার সমীরই ফিরিয়ে আনে তাকে গানের জগতে।

তার চিত্রনাট্যে গানের দু'তিনটে সিচুয়েশন বুঝিয়ে দেয় সমীর। রোহিণীও আবার যেন তার হারানো আত্মবিশ্বাস খুঁজে পায়। সেই দিনই কথাবার্তা পাকা করে প্রযোজক রোহিণীকে হাজার টাকা আগামও দেন।

দুজনে ট্রাম ডিপোর দিকে ফিরছে রিকশায়। রাত হয়েছে। সমীর বলে—পরশু এসো। আর একজন পরিচালকের কাছে নিয়ে যাবো। সেখানেও লিখবে। এই তোমার জগৎ—

তবে পরিচালকের মত টাকা পাবে না—তবু সম্মানজনকভাবে চলতে পারবে।

রোহিণী বলে—কথাটা এভাবে ভাবিনি সমীর। লোভ আর দুরাশা মানুষকে বিভ্রান্ত করে। আমাকেও করেছিল।

সমীর আজ খুশি। রোহিণী নিজেকে ফিরে পেয়েছে। এখন দু-পাঁচটা ছবির গান লিখছে। সমীরের মনে পড়ে কাজলীর কথা।

সেও ঘরে ফিরতে চায়। আবার নতুন করে নিজেকে ফিরে পেয়ে বাঁচতে চায়।

নসুদাও ঘুরছে এখন এ পাড়ায় কাজলীর সন্ধানে। সমীরও খুশি হবে কাজলীকে ঘরে ফিরিয়ে দিতে পারলে।

কথাটা ভেবেছে সমীর। সে চায় তার চারপাশের আপনজনও সুখে থাকুক, শান্তি, সুখের পরিবেশেই সে বাঁচতে চায়। আর একা নিজের সুখই নয়—অন্যের কথাও ভাবতে চায়।

সেদিন সমীর গেছে নসুদার বাড়িতে। এই বাড়িতেই সে প্রথম এসে উঠেছিল। এখান থেকেই তার কলকাতার জীবন শুরু। নসুদাই তাকে আশ্রয় দিয়েছিল। তার কাছে সে কৃতজ্ঞ।

সেই বাড়িটার হাল এখন বদলে গেছে। ঘরের শ্রীও নাই। বাইরের ঘরটায় এলোমেলো করে জিনিসপত্র ছড়ানো।

নসুদা নাই। প্রমীলার চেহারাও ভেঙে পড়েছে। চোখের কোণে কালি। চুলগুলোও পেকে গেছে। সমীরকে দেখে প্রমীলা বলে—এতদিন পর মনে পড়লো সমীর। দ্যাখ কি অবস্থায় আছি। মেয়েটা ছিল লক্ষ্মী—কি ভুল করে চলে গেল। তারপর থেকেই এই লক্ষ্মী ছাড়া অবস্থা।

—নসুদা কোথায়? সমীর শুধোয়।

প্রমীলা বলে—তার কথা আর বোল না। আগে তবু আশপাশেই থাকতো। এখন কোথায় যে যায় বলেও যায় না। ক'দিন থেকে দেখছি কেমন রেগে উঠছে যখন তখন। বলে—খুন করেঙ্গা—ভয় হয় বাপু। মাথাটা খারাপই না হয়ে যায়।

সমীর কি ভাবছে। প্রমীলা বলে,

—কাল বৈকালে বের হয়ে গেছে। এখনও ফেরেনি। কি যে করি। কোথায় যায় মানুষটা?

নসু ভটচায কিছুদিন স্টুডিওপাড়ায় ঘুরে ঘুরে একদিন কোন স্টুডিওতে হঠাৎ দেখে কাজলীকে দূর থেকে। চমকে ওঠে নসু। কাছে যায় না। কাজলী বেশ সেজেগুজে কোন তরুণ প্রডাকশন ম্যানেজারের সঙ্গে হেসে কথা বলছে। এখন সে বেশ কয়েকটা ছবিতে কাজ করছে। সহজেই সে নিজেকে তুলে ধরতে পারে তাই ওই রকম চরিত্রে অনেকেই এখন নিচ্ছে ওকে।

কাজলীও জানে কোন পুজোর কি মন্ত্র। জীবনের লড়াই তাকে পথের সন্ধান করে নিতে বাধ্য করেছে। এখন প্রডাকশন ম্যানেজার। সহকারী পরিচালকদের সঙ্গে তার খুবই ভাব সাব। তারাই ডেকে কাজ দেয় কাজলীকে। কাজলীও তাদের খুশি করার চেষ্টা করে একটু সান্নিধ্য—হাসি দিয়ে।

নসু ভটচায গাছের আড়াল থেকে দাঁড়িয়ে দেখছে দৃশ্যটা। একটা অসহায় চাপা রাগে

ফুসছে সে। ওই মেয়েটার জন্যই তার জীবনটা নষ্ট হয়ে গেছে। ওর বংশের মুখে মেয়েটা দুরপনেয় কলঙ্কের কালি লেপে দিয়েছে। তার সব স্বপ্নকে ব্যর্থ করে আজ আনন্দে রয়েছে। ওই কাজলী তার মেয়ে নয়—শত্রুই।

কাজলী এসব খবর জানে না। সে কাজ শেষ করে বের হয়েছে খুশি মনে। এই রোলটা পরিচালক মশাই তার কাজ দেখে আরও বাড়িয়েছেন। এবার নতুন ছবিতে আরও ভালো রোলই পাবে সে।

রিকশা নিয়ে ফিরছে কাজলী। অন্ধকার নেমেছে পথে আলোগুলো দূরে দূরে। পিছনে একটা ছায়ামূর্তির মানুষ এগিয়ে আসছে তা খেয়াল করে নি কাজলী।

বাড়িতে ফিরেছে। এখন শ্যুটিংএর ধকলও পড়ছে। দিনভোর ফ্লোরের চড়া আলো। ধুলোর মধ্যে কাজ করতে হয়। সন্ধ্যায় ফিরে স্নান টান সেরে নেয় কাজলী।

এর মধ্যে কোন প্রডাকশন ম্যানেজারের সঙ্গে কাজলীর একটু বিশেষ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। সেইই তার জন্য ভাবে। তার চেষ্টাতেই কাজলী কিছু কাজও পেয়েছে।

গুপীনাথও রাতে কাজ সেরে আসে এখানে। একটু মদ্যপান করে রাতে ফিরে যায়। কাজলীরও সময় কাটে।

মাসী এসময় ওদের মদের চাট বানায় আর গজ গজ করে। মাসী এখন কাজলীর আশ্রিতা। তাই বলারও কিছু নাই।

সেদিন সন্ধ্যার পর টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে । পথ ঘাটে লোকজনও কম। দমকা হাওয়াও দিচ্ছে। রাতে কাজলী স্নান সেরে পোশাক বদলে গুপীনাথের পথ চেয়ে আছে। মদের বোতল চাঁটও তৈরি।

হঠাৎ দরজাটা খুলে যায়।

কাজলী পিছু হয়ে বসে বোতল গ্লাশ রাখছিল, দরজা খোলার শব্দে বলে গুপীবাবু, এত দেরি? এসো গ্লাশ নিয়ে বসে আছি তোমার পথ চেয়ে। এখানে আসতে মন চায় না বুঝি? নতুন ফুলের সন্ধান পেলে নাকি গ'।

তারপর ফিরে চাইতেই অবাক হয়। আবছা আলোয় দেখে দাড়িগোঁফ ঢাকা মুখ। দুটো কোটরাগত চোখ জ্বলছে জ্বল জ্বল করে। অনেকদিন পর বাবাকে এখানে দেখবে ভাবেনি কাজলী।

তাই চমকে উঠে বলে—বাবা!

নসু ভটচাযের মাথায় তখন আগুন জ্বলে উঠেছে। এতদিন সে একটা চলমান বারুদের স্তূপ হয়েই ছিল। এবার সেই বারুদের স্তূপে যেন অগ্নিসংযোগ হয়েছে। আর আগুনের সঙ্গে ঘটে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ।

নসু ভটচায এতদিন ধরে পাগলের মত খুঁজছিল কাজলীকেই। গর্জে ওঠে নসু—বাবা। কে তোর বাবা। আমি তোর যম।

লাফ দিয়ে এসে নসু ভটচায কাজলীর গলাটা টিপে ধরে। শীর্ণ শরীর—হাতের আঙুলগুলো যেন লোহার মতই কঠিন হয়ে ওঠে। এতদিনের রুদ্ধ আক্রোশ আজ ফেটে পড়ে। সর্বশক্তি দিয়ে সে ওর গলা টিপে ধরেছে। ছিটকে পড়েছে কাজলী তক্তপোষের ওপর নসুর দুচোখ জ্বলছে। কানেও শোনে না সে কাজলীর অস্ফুট আর্তনাদ। টিপে ধরেছে তার

কণ্ঠনালী ওই কঠিন চাপে দমবন্ধ হয়ে আসছে কাজলীর। ছটফট করছে দেহটা। নসু ভটচায গর্জাচ্ছে।—এতদিন পর পেয়েছি তোকে—শেষই করবো।

মাসী কি আনতে গেছল। এসে ওই দৃশ্য দেখে চীৎকার করতে থাকে—ওগো সর্বনাশ হলো গো।

লোকজন ছুটে আসে। ওরা এসে যখন মুক্ত করে কাজলীকে তখন সব শেষ। ওই খুনে লোকটাকেও ধরে ফেলে তারা—কে এর মধ্যে থানাতেও ফোন করে দেয়।

সমীর এসব কিছুই জানে না। প্রমীলাও জানে না লোকটা কাল থেকে কোথায় গেল সমীরই বলে,

—ভেবো না বৌদি। গেছে কোথাও, এসে পড়বে। কাল সকালে খবর নোব।

—তাই নিও ভাই। আমি তো দিশে বিশে পাচ্ছি না। শেষে লোকটা কি বদ্ধ পাগলই হয়ে যাবে ওই মুখপুড়ীর জন্যে। ধনি্য মেয়ে পেটে ধরেছিলাম।

হঠাৎ বাইরে কয়েকটা গাড়ি থামার শব্দে চাইল সমীর জানালা দিয়ে। পুলিশের গাড়ি—অ্যাম্বুলেন্স এসেছে।। নসু ভটচাযের বাড়ির খোঁজ করছে তারা।

সমীর বের হয়ে আসে। পিছনে প্রমীলাও।

পুলিশ অফিসার নসুদাকে নিয়ে নামে। ওর কোমরে দড়ি বাঁধা—কি ব্যাপার! সমীর অবাক হয়।

নসুই বলে—শেষ করেছি সমী—কই গো, আজ পঞ্চতীর্থ কেদারেশ্বর ভটচাযের বংশের পাপকে নিজের হাতে শেষ করেছি। হাঃ হাঃ—

প্রমীলা আর্তনাদ করে ওঠে। ওদিকে গাড়িতে কাজলীর প্রাণহীন দেহটা পড়ে আছে। প্রমীলা ছুটে যায়—কাজলী—

নসু গর্জায়—খবরদার। ও কেউ নয় আমাদের, শত্রু। শত্রুর নিকেশ করেছি আজ এতদিন পর। নিজের হাতে গলা টিপে—পঞ্চতীর্থ কেদারেশ্বরের বংশের কলঙ্ককে নিজের হাতে মুছে দিয়েছি।

সমীর দেখছে একদিকে এক বদ্ধ উন্মাদকে, শান্ত নিরীহ মানুষটা আজ নিজের হাতে কাজলীকে খুন করেছে—ওদিকে এক সন্তানহারা মায়ের আর্তনাদ—অসহায় কান্নায় ভেঙে পড়ে। আর এই পাগল নিজের খেয়ালেই হাসছে।

মানুষ যেন একান্ত অসহায়ই। কোন অদৃশ্য বাজিকর কখন মানুষকে মা-বাবার স্নেহময় ভূমিকা দেয়, কখনও তার সব মনু্যষত্বকে কেড়ে নিয়ে অমানুষ, খুনীতে পরিণত করে। সব বোধ তার কেড়ে নেয়।

নসু ভটচাযের এমন চরম পরিণতির কথা সমীর ভাবতেও পারেনি। কোন অদৃশ্য বিধাতাই বোধ হয় বড় সৃষ্টিকর্তা। কখন কি সৃষ্টি করে তার হিসাব মানুষেরও অজানা।

শ্যামলী ক'দিন নানা কাযে ব্যস্ত ছিল। কলেজের খাতা দেখা—তার ফাঁকে সে সমীরের এখানে একদিন এসেছে।

একটা ফর্মও আনে। সমীর লিখছে—ঝড়ের মত এসে শ্যামলী বলে—ফর্মটা ফিল আপ করে দাও।

সমীর চাইল। প্রভাও রয়েছে। সীমাই শুধোয়—কিসের ফর্ম শ্যামলীদি?

শ্যামলী বলে—সল্টলেকে অধ্যাপক-সাহিত্যিক-শিল্পীদের জন্য কিছু জায়গা দেবে। দামও কম। আমি দরখাস্ত দিয়েছি—সমীর তুমিও দাও। যদি ওখানে জায়গা পাও ভালোই হবে।

সমীর কি ভাবছে। সীমাই খুশি হয়। কলকাতা শহরে সল্টলেকের মত জায়গায় তাদের নিজেদের আশ্রয় হবে। সীমাই বলে,

—এত কি ভাবছো? ফর্মটা সই করে দাও তো।

সমীর বলে—কলকাতায় জায়গা কেনা সে তো অনেক টাকার ব্যাপার।

প্রভা বলে—তা সত্যি। আর এখানে বাস করবি পাকাপাকি দেশের বাপুতি ভিটে ছেড়ে?

সীমা বলে—ও বাড়িও থাকবে মা। এখন তো এখানেই থাকতে হবে। তাই—

—তাহলেও এতগুলো টাকা খরচা করতে হবে? প্রভা যেন ঠিক সায় দিতে পারে না। সমীরও বলে,

—অনেক টাকার ব্যাপার।

শ্যামলী বলে—বোম্বাই এর মিঃ সেন তো বেশ টাকাই দিচ্ছেন। ওটা মনে করো পাওনি। জায়গাটা নিয়ে নাও। কিছু কম পড়ে তার জন্য আটকাবে না। নাও ফর্মটা ফিল্ আপ করে দাও। আজই জমা দিতে হবে। এত ভাবছ কী?

সীমাই বলে—তাই দ্যাখো শ্যামলীদি—একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই যদি হয় করবে না? জায়গাটা তো নাও—পরে দেখা যাবে।

প্রভা মুখ ভার করে চলে গেল।

সীমার ব্যাপারটা নজর এড়ায় না। মায়ের মত নেই সমীরও তা বুঝেছে। এদিকে সীমা তাড়া দেয়—কি হলো!

সমীর কি ভেবে ফর্মটা ভর্তি করে দেয় শ্যামলীকে।

শ্যামলী ক'দিন এইসব নিয়েই ব্যস্ত রয়েছে।

এই ব্যাপারে ললিতের অফিসেও গেছে। ললিতই ওকে গাড়িতে করে ল্যান্ড রেভিনিউ অফিসে নিয়ে গিয়ে তার চেনা জানা বন্ধুকে ধরে ওদের কাজটা করিয়ে দেয়।

অবশ্য শ্যামলীকে অফিসের বস কে কিছু দিতে না হলেও অফিসের বাবুদের, বেয়ারাদের ফাইল নাড়াচাড়া করার জন্য কিছু প্রণামী দিতে হয়েছে।

তারপর ওদের দুজনের নামে অ্যালটমেন্ট লেটার ইসু হয়ে যায়।

ললিতই বলে—তাহলে জায়গা পেলে তো শ্যামলী। শ্যামলীও খুশি। বলে—তোমার জন্যই পেলাম ললিত।

ললিত বলে—কিন্তু ওই কেউটিকে এই সুযোগ দিলে কেন? ওই লেখক না ফেকক্ তাকে। এ কাজের জন্য ওর কাছ থেকে কিছু টাকা পেতো এরা। তা হল না।

শ্যামলী বলে—সমীরদার কথা বলছ। গ্রামের মানুষ, ছেলেবেলা থেকেই জানাশোনা।

ললিত বলে—দেবদাস পার্বতীরও ছেলেবেলা থেকেই জানাশোনা ছিল।

শ্যামলী হাসে—সরকারি চাকরি করে একটা জিনিস ভালোই শিখেছো। সকলকে সন্দেহ করা।

ললিত বলে—করতে হয় ম্যাডাম।

সীমা খুশি হয় বেশি ওই অ্যালটমেন্ট লেটার পেয়ে। সল্টলেকে শেষ অবধি চারকাঠা জায়গাও পেয়েছে। সমীর ব্যাঙ্ক থেকে কিছু টাকা তোলে—কিছু টাকা অফিস থেকেও লোন নিয়ে পেমেন্ট করে দেয়। দু' একজন প্রকাশকের কাছেও টাকা নিয়েছে।

সেদিন শ্যামলীই ট্যাক্সি এনে সমীর, সীমা-আর প্রভাকে নিয়ে জায়গাটা দেখাতে নিয়ে গেছে। প্রভাদেবী চুপ করেই আছেন। এতদিন ধরে প্রভা দেখেছেন গ্রামের যারাই বাইরে চাকরি-বাকরি করতো বাইরেই বেশিরভাগ সময় থাকতে হতো তাদের। তবু তাদের মূল শিকড় ছিল গ্রামেই।

চাকরি থেকে রিটায়ার করার পর তারা আবার বাইরে থেকে নিজের বাপ পিতামহের ভিটেতেই ফিরে যেতো। গ্রামেই থাকতো। কিন্তু সমীর এখানে বাড়ি করলে গ্রামের মাটিতে আর ফিরবে না দেশ ছাড়া হয়ে যাবে। চিরকাল পরবাসী হতে হবে এটা ভাবতে ভালো লাগে না প্রভার।

তবু মুখে আর কিছু বলেনি। কলকাতা শহরের এলাকা ছাড়িয়ে বিস্তীর্ণ জলা জমি। নলখাগাড়ার বন। কলকাতা শহরকে বাড়াতে হবে। বাসস্থানের জায়গা আর নেই। তাই ওই জলা জমিকে গঙ্গার বুক থেকে বালি পলি তুলে বোজানো হচ্ছে। বিস্তীর্ণ জলা জমি বুজে গেছে বালু মাটির স্তরে।

সামনের দিকে কিছু বাড়ি ঘর উঠছে মাত্র। বাকি সারা এলাকা তখনও শূন্য প্রান্তর। গাছপালাও নাই। দুচারটে পুরনো আমলের গাছ ওই প্রান্তরে দাঁড়িয়ে আছে। বাকি সব ধূ ধূ—শূন্য।

শ্যামলী ম্যাপ দেখে তাদের এলাকাটা বের করে।

আন্দাজমত বলে—এইখানেই কোথাও হবে।

প্রভা দেখছে সব। বলে সে—এযে ধূ ধূ ডাঙারে। বালির চর। এখানে থাকবি কি করে? এখানে মানুষ থাকে? সীমাও হতাশ হয়।

প্রভা বলেন—এতগুলো টাকা ধার দেনা করে এখানে জায়গা কিনলি?

সমীর দেখেছে নিউ আলিপুরের জন্ম হতে। তখন যুদ্ধের সময় ওখানে ছিল জলাজমি-মাঠ-খেজুর গাছ আর কাশের বন। সেইসব জমিতে এখন বিশাল সমৃদ্ধ জনপদ গড়ে উঠেছে।

সমীর বলে—এর চেহারা কয়েক বছরেই একেবারে বদলে যাবে মা। তখন চিনতে পারবে না। নিউ আলিপুরও ছিল এমনিই। এখন চেনা যায় না।

সীমা বলে—তা সত্যি। বাড়ি তৈরি হলে, মানুষজন এলে এর চেহারাই বদলে যাবে মা।

প্রভা তেমন উৎসাহিত বোধ করে না। তার দৃষ্টিভঙ্গি অন্যরকম। সে গ্রামে মানুষ। গ্রামের ধান জমি-পুকুর বাগান এসবের মূল্যই তাদের কাছে বেশি।

প্রভা বলে—কে জানে বাছা।

সমীর বুঝেছে মা ঠিক খুশি হয়নি। কিন্তু নিজেও ভেবেছে কথাটা। কলকাতাতেই একটা

আশ্রয় তাকে গড়তে হবে। শ্যামলীর উদ্যোগে তবু একটু জায়গা পেয়েছে।

সেদিন প্রভাই বলেন সমীরকে,

—ওই জমি না কিনে গ্রামে হারু চাটুয্যের পাঁচ বিঘে জমি কিনতে পারতিস। নতুন পুকুরে আট আনা অংশ কিনলে লাভই হতো।

সমীর বলে—মা, এর মধ্যে গ্রামের ব্যাপার তো দেখেছো। ক্ষেত মজুরদের রেটও বাড়ছে, কাজও তেমন করছে না। তারপর জমি কিনে ভাগ চাষ করতে দেবে—প্রবীরের দল তো এখন বর্গাদারী নিয়ে মেতেছে। সেখানেও জমি জায়গা আর বামুন চাষীদের হাতে থাকবে কিনা কে জানে?

প্রভা বলেন—তোদের এখন শহরের দিকেই মন পড়েছে বাবা। সাত পুরুষের ভিটের মায়াও তোদের আর নেই। মাটি—মা—সব তোদের কাছে কেমন পর হয়ে গেছে।

সমীর বলে—এসব কথা কেন বলছ মা?

প্রভা জবাব দিলেন না। সমীর বেশ বোঝে মা যেন আজ একটা বিশ্বাসকে হারাবার বেদনাই পেয়েছে।

রাতে সীমা বলে—মা কি বলছিলেন?

—না তো। সমীর এসব প্রশ্ন এড়াতে চায়। সীমা বলে,

—যাই বলো, যৌথ পরিবার, তুমি এই জায়গাটা নিজের নামে কিনলে তাই মা ঠিক খুশি হননি।

সমীর বলে—কিন্তু এতো স্পেশাল কোটায় পাওয়া। লেখক হিসাবেই দিয়েছে আমাকে। মা কেন অখুশি হবেন?

সীমা বলে—কে জানে বাপু। তবে যা সত্যি তাই বল্লাম। তোমার মা তোমার চেয়ে অন্য ছেলেদেরই বেশি ভালোবাসেন। হাসে সমীর—কি যা তা বলছ।

—তাইই। উনি তোমাকে চেনেন ভারবাহী জানোয়ার বলেই। ভাইবোনদের মানুষ করেছো, দেশের পাকা বাড়ি করেছো, বোনের বিয়ে দিলে, ভাইকে থিতু করলে, এবার তাদের জন্য আরও বিষয় আশয় করে দেবে তা নয়, নিজের নামে জায়গাটা কিনলে—

সমীর শুনছে সীমার কথা। এসব কথা সে শুনতে চায় না। তাই বলে, এখন থামো তো। লিখতে হবে, কাজ করতে দাও।

সেদিন শুধু একটা কারণেই সীমার চাপা রাগটা ফুটে ওঠে। সমীরের অফিসের এক বন্ধুর ছেলের অন্নপ্রাশন। সস্ত্রীক নেমন্তন্নে যাবে সমীর। সমীর এইসব সামাজিক ব্যাপারে বিশেষ যায় না। তবু এখানে যেতে হচ্ছে সীমার চাপেই। তার বন্ধুর স্ত্রী সীমার বান্ধবী।

সীমা রুপোর একটা দুধ খাবার বাটি আর গোঁদল কিনে এনেছে বৌবাজারের সোনা রূপার গহনার দোকান থেকে।

প্রভাকে দেখাতে প্রভা বলেন—এতো অনেক দাম গো?

—হ্যাঁ। আড়াই শো টাকার মত পড়লো।

প্রভা চমকে ওঠে—এত টাকা! ওরা খোকনের অন্নপ্রাশনে কি দিয়েছিল যে এতগুলো টাকা দিতে হবে বাছা? একটু হিসাব করে চলবে তো? দু দশ টাকা বাড়তি আনছে ছেলেটা দিনরাত খেটে আর তুমি এইভাবে নষ্ট করবে এটা কি ঠিক?

সীমা শুনে একটু রেগেও ওঠে

—কী বলছেন মা! আমি টাকা নষ্ট করি?

—তা নয় তো কি বাছা। দেখছি তো নিজের চোখেই। সঞ্চয় করতে তো শেখনি—এবার সেটা শেখো।

সীমা বলে—কলকাতার চালচলন আলাদা মা। এখানে আপনার ওই গাঁইয়া হিসাব চলে না।

—তাই বলে অপচয় করতে হবে? প্রভা বলেন।

সীমা গুম হয়ে যায়। সমীর অফিস থেকে কোন প্রকাশকের ওখানে তার উপন্যাসের কিছু প্রুফ ফেলে দিয়ে এসে বলে সীমাকে,

—কই তৈরি হওনি? নেমন্তন্নে যেতে হবে তো।

সীমা বলে গম্ভীরভাবে—যাবো না। যেতে হয় তুমি একাই যাও।

—সেকি।

এবার সীমা তার রুদ্ধ আবেগ প্রকাশ করে বলে,

—এসব করার অধিকার আমার তো নেই। তাই যাবো না।

প্রভাও শুনেছে সব। বলে সে,

—বৌমা। তোমার অধিকারে হাত কেন দেব মা। তোমাদের ভালোর জন্যই কথাগুলো বলেছিলাম। যদি কিছু মনে ব্যথা দিয়ে থাকি আমাকে মাপ্ করে দিও মা। অন্যভাবে কিছুই বলিনি।

সমীর বলে সীমাকে—মায়ের কথায় কিছু মনে করো না। চলো—সীমাও জেদ ধরে—আমি যাবো না। আমাকে যেতে বলো না।

সেই রাতে সীমা গেলই না। সমীরও গিয়ে নিজের কাজের ঘরে বসে। কিন্তু কাজে মন দিতে পারে না। সারা বাড়িতে এক খোকনের কণ্ঠস্বরই শোনা যায়। অন্য তিনটি মানুষই স্তব্ধ হয়ে গেছে। সীমা সেইরাতে খেতেও এল না। নিজের ঘরেই শুয়ে থাকে। বলে—মাথা ধরেছে। তোমরা খেয়ে নাও।

পরদিন হঠাৎ ছোট ভাই সুবীর তাদের অফিসের কাজে কলকাতায় এসে এই বাড়িতে আসে। সমীরও খুশি হয়। সুবীর এমনিতে হৈ চৈ করে, সীমাকে নিয়ে সিনেমাতে যায়। সীমা যাবে না। সুবীরই বলে—টিকিট করে আনলাম উত্তমকুমারের ছবি, না গেলে আমিও যাবো না। সীমা বাধ্য হয়েই যায়।

বাড়ির তপ্ত আবহাওয়াটা তবু কিছুটা সহজ হয়ে ওঠে।

কিন্তু পরদিন সুবীর বাড়ি ফিরবে। প্রভা দেবী বলে—আমিও বাড়ি যাবো রে।

সমীর অবাক হয়—সেকি। এর মধ্যেই ফিরবে?

প্রভা বলে—ক'দিন কি রে। তিনমাস হয়ে গেল এসেছি বাবা। বাড়িতে মেজ বৌ-প্রবীর দুটোই তো বাইরে থাকে। বাড়ির কি হাল হয়েছে কে জানে? আমাকে ফিরতেই হবে বাবা। তাই সুবীর এসেছে—ওর সঙ্গেই বাড়ি যাই।

সমীর জানে মা যা বলেন তা করেনই। একবার যাবে বললে আর তাকে থামানো যাবে না। তাই মত দেয়।

মা যাবার আগে সীমাও প্রণাম করে। সমীরও। খোকনকে আদর করে মা বলে—সাবধানে থেকো তোমরা। দাদুভাইকে সাবধানে রেখো।

পুজোতে আসবে কিন্তু মা। তোমাদের পথ চেয়ে থাকবো।

সমীর বলে—নিশ্চয়ই যাবো মা।

প্রভা চলে গেলেন। মুখে কথায় কোন প্রতিবাদই ছিল না। তবু সমীরের মনে হয় মা খুবই ব্যক্তিত্বসম্পন্না মহিলা। ওর আত্মসম্মান বোধও প্রবল। তাই নীরবেই সরে গেলেন এখান থেকে। বুঝেছেন প্রভাদেবী—এই পরিবর্তনের দিনে তিনি এখানে যেন বেমানান। তাই কোন অপ্রিয়তার সৃষ্টি না করেই নিজেকে সরিয়ে নিলেন।

সমীর বুঝেছে কোথায় একটা কি যেন হারিয়ে গেল তার। সেটাকে দেখা যায় না—কিন্তু অনুভব করা যায়।

ললিত অনেক কিছুই পেতে চায়। এককালে কিছুই পায়নি সে। জীবনের প্রথম পর্ব কেটেছে তার বহু দুঃখে কষ্টের মধ্য দিয়ে। বঞ্চনাকে দেখেছে ; দেখেছে ব্যর্থতা, শূন্যতাকে।

তাই আজ সব কিছুই সে উজাড় করে পেতে চায়। অফিসে ও পায় অনেক কিছুই অযাচিত ভাবে।

অবশ্য পাবার পথটা সে নিজেই মাথা খাটিয়ে বের করেছে। আরও কিছু পেতে চায়।

এখন শ্যামলীর ওখানে প্রায়ই আসে সন্ধ্যার পর। নানা গল্প হয়। শ্যামলী বাড়ি করবে ভাবছে। ললিতই বলে,

—প্ল্যান আমিই করিয়ে দোব। আমার হাতে অনেক ইঞ্জিনিয়ার আছে। প্ল্যান পাশও হয়ে যাবে।

ললিতই প্ল্যানও করিয়ে আনে—শ্যামলী ঘর বাঁধতে চায়। ললিতই তার ঘরের নক্সা করছে—কোথায় ব্যালকনি কোথায় সিড়ি হবে হিসাব করছে। শ্যামলী বলে—ললিত, নিজে ঘরই বাঁধলে না। অন্যের ঘর বাঁধার দিকে দেখি কত নজর?

ললিত কি যেন বলতে চায়। কিন্তু পারে না। নীরব চাহনিতে চেয়ে থাকে। শ্যামলীও দেখছে ওকে। ললিত চতুর, সাবধানী লোক। জানে কি করে সব কিছু পেতে হয়।

ললিত বলে—কলকাতায় বেশি দিন থাকলে আমার দম বন্ধ হয়ে আসে। তাই ইনস্পেকশনের কাজ নিয়ে মাঝে মাঝে বাইরে চলে যাই। কোলাঘাটের ওদিকে রূপনারায়ণের ধারে সুন্দর একটা বাংলো আছে। সকালে গিয়ে দিনভোর ওখানে কাটিয়ে রাতেই কলকাতা ফেরা যায়। চলো—একটা দিন ঘুরেই আসবে।

শ্যামলী কি ভাবছে। বলে সে—দেখি, কাল পরশু একটা প্রোগ্রামের কথা আছে। ওটার উপরই নির্ভর করছে।

ললিত বলে—ঠিক আছে। পরশুই কথা হবে। ইঞ্জিনিয়ারকেও ওখানেই পাবো—তুমিও বাড়ির প্ল্যানটা কি রদবদল করতে হবে ওকে বলে দিতে পারবে।

হঠাৎ সমীরকে আসতে দেখে চাইল শ্যামলী। ললিতবাবুও চেনে সমীরকে। সমীর নমস্কার করে। ললিতবাবু তখন আবার সেই অফিসিয়াল মেজাজটা ফিরে পেয়েছে। গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ে মাত্র। বলে—শ্যামলী আজ চলি। তোমরা কথা বলো।

সমীরের দিকে না চেয়েই বের হয়ে গেল। শ্যামলী দেখছে ব্যাপারটা। ললিতের মুখ চোখ সমীরকে দেখেই বদলে গেছে এটা দেখেছে শ্যামলী। ললিতের স্বভাবকে সে চেনে।

এটা তার ভালো লাগে না।

সমীর সম্বন্ধে এর আগেও ললিতের দু' একটা মন্তব্য শ্যামলীর ভালো লাগেনি।

ললিত চলে যেতে শ্যামলী বলে—একটা হামবাগ্। নিজেকে যেন মুখ্যমন্ত্রী বলেই ভাবে।

সমীর বলে—বড় চাকরে, দেশের সরকার চালাচ্ছে ওরাই। দেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা।

—ছাই! দেশেরই দুর্ভাগ্য। তারপর প্রসঙ্গ এড়াতে শ্যামলী বলে—হঠাৎ! এসময়?

সমীর বলে—বড্ড মনটা খারাপ হয়ে গেল শ্যামলী।

শ্যামলী শুধোয়—কেন? সীমার সঙ্গে ঝগড়া করেছো নাকি? কিন্তু তুমি তো সেটাও পারো না। যার নিজের দাবি জানাবার মত মনের কাঠিন্য নেই, সে তো ঝগড়াই করতে পারবে না। তাহলে কি হলো?

সমীর নসু ভটচাযের কাজলীর প্রসঙ্গই বর্ণনা করে।

শ্যামলী সব শুনে চমকে ওঠে—সেকি। নসুদা শেষে নিজের হাতে নিজের মেয়েকে এইভাবে খুন করলো?

সমীর বলে—মেয়েটা একটা ভুল করেছিল। কিন্তু সে তার জন্য কম খেসারত দেয় নি। ক্রমশ : নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করেছিল। ঘরে ফিরে আসতেও চেয়েছিল। কিন্তু সব কেমন গোলমাল হয়ে গেল। নিজের জীবনটাতো গেলই নসুদাও জেলে যাবে আর বৌদির কি হবে কে জানে? এখানের পাট চুকিয়ে দেশেই ফিরে যেতে হবে।

শ্যামলী চুপ করে থাকে। সমীরের মনে হয় সেও অপরাধীই। যদি নসুদাকে সবকথা খুলে বলতো হয়তো নসুদা অন্য রকম ভাবনা চিন্তা করতো। মেয়েটা আবার ঘরে ঠাঁই পেতো।

শ্যামলী সব শুনে বলে—তা নাও হতে পারতো সমীর। নসুদা তার মনস্থির করেই ফেলেছিল। নাহলে ও নিজেই এত ঘুরে কাজলীর সন্ধান করে এই কাণ্ড বাধাতো না। নসুদা এই কাজই করতো আর তাতে তোমার দোষ বাড়তোই।

তবু যা হবার নয় তাই হয়ে গেল। এ নিয়ে করার কিছুই নাই। অনেক ঘটনাই সংসারে ঘটে যার উপর মানুষের কোন হাত থাকে না। নীরবে মেনেই নিতে হয়।

শ্যামলীর মনটা ভালো নেই এইসব ঘটনা শুনে। নসুদার বাড়িতে গেছল সে। গ্রাম থেকে নসুদার ভাই এসেছে। সমীরও তার চেনাজানা উকিলকে দিয়ে কেস করাবার চেষ্টাও করে। কিন্তু খুনী নিজের মুখেই তার দোষ স্বীকার করেছে তাই করার আর কিছুই নাই।

শ্যামলীরও খারাপ লাগে। বৌদির জন্য ভাবনা হয়। মেয়েদের সমস্যাগুলোই কঠিন। তার অন্যতম কারণ অর্থনৈতিক পরাধীনতা। নসুদার রিটায়ার করার পর তার পেনসনে চলতো ওদের। এখন সব আটকে গেছে। অসহায় মহিলাকে এবার ওদের সংসারের গলগ্রহ হয়েই থাকতে হবে। নিজের রোজগার করার কোন সামর্থ্যই নেই। তাই মনে হয় শ্যামলীর দেশে মেয়েদের আরও শিক্ষার প্রচলন করা প্রয়োজন তাতে এইসব বিপদের হাত থেকে বাঁচতে পারে মেয়েরা।

ললিত এসেছে আজও। সমীর এখানে তখনও নসুদার কেসের ব্যাপারে এসেছে শ্যামলীর কাছে। ললিতই বলে,

—খুবই ব্যস্ত দেখছি।

শ্যামলী বলে—হ্যাঁ। একটা প্রবলেম হয়ে গেছে। ললিত দেখছে সমীরকে। সমীর বলে—আমি উঠি শ্যামলী, পরে আসবো।

শ্যামলী বলে—একটু থেকে ব্যাপারটার সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে যাও সমী। দেরি করা ঠিক হবে না।

ললিত বলে—কাজ করো। পরে কথা হবে। চলে যায় ললিত।

সমীর দেখছে ওকে। দেখেছে শ্যামলীর কাছে ও প্রায়ই আসে। দুজনে একসঙ্গে পড়েছে। এখন ললিত ভালোই রোজগার করে।

সমীর বলে—একটা কথা বলবো শ্যামলী? যদি কিছু মনে না করো। শ্যামলী চাইল, সমীর বলে,

—ললিতবাবু ছেলে হিসেবে সত্যিই ভালো। বড় চাকরি করে। তোমাদের দুজনের মধ্যে অনেক দিনের জানাশোনা। তাহলে বিয়ে করো না কেন?

শ্যামলী বলে—কি বলছ সমীর?

সমীর বলে—ঠিকই বলছি শ্যামলী। মেয়েদের জীবনে একটা অবলম্বন চাই। একজন সঙ্গীরও দরকার যে তাকে চিনবে সুখে দুখে তার পাশে থাকবে।

শ্যামলী বলে—তুমি দেখছি পি-ডবলু-ডি অর্থাৎ পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট হয়ে উঠলে। কাজলীর প্রবলেম সলভ করতে গিয়েও পারলে না। এবার পড়েছো আমাকে নিয়ে? আমার কোন প্রবলেম নেই—বেশ আছি।

—তাহলে চিরজীবন একাই থাকবে?

সমীরের কথায় শ্যামলী গেয়ে ওঠে—যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলোরে।

সমীর চুপ করে থাকে। মনে পড়ে গ্রামের সেই পূর্ণিমার রাতে ছায়া অন্ধকার ঢাকা গ্রামের মন্দিরতলার কথা। মাঝে মাঝে সেখানেই দেখা হতো তাদের। সেদিন সমীর সবে চাকরিতে ঢুকেছে। শ্যামলীর চোখে ছিল সেদিন নীরব আহ্বান।

কিন্তু সমীর সেই ডাকে সাড়া দিতে পারেনি। তার ওপর সারা সংসারের ভার। সেদিন তার জীবনে ছিল কঠিন সংগ্রাম। সেখানে শ্যামলীকে আনার সাহস তার ছিল না।

তারপর পায়ের তলে একটু ঠাঁই পেতেই নিজের মতের বিরুদ্ধে মায়ের বাছাই করা পাত্রী শ্যামলীর বোনকেই বিয়ে করতে হয়েছিল।

সেখানেও নিজের মত প্রকাশ করতে পারেনি। জানাতে পারেনি নিজের দাবীর কথা। শ্যামলী সেদিন নীরবে ফিরে গেছল তার জীবন থেকে।

শ্যামলীও জোর করতে পারেনি। তারও বিবেকে হয়তো বেধেছিল। মা-বাবার কথা ভেবে শ্যামলীও বিদ্রোহ করতে পারেনি।

সমীর—শ্যামলী দুজনেই নীরবে সব কিছুকে ভবিতব্য বলেই মেনে নিয়েছিল। আর সেই নীরবতার মূল্য দিয়ে চলেছে আজ দু'জনেই।

শ্যামলী হাসছে। বলে,—ঘটকালিই শুরু করলে সাহিত্যকর্ম ছেড়ে?

সমীর বেদনাহত কণ্ঠে বলে—তোমাকে সুখী দেখতে চাই শ্যামলী। আজ মনে হয় দুজনেই আমরা ভুল করেছিলাম। তার জন্য তুমি আজও কেন খেসারত দেবে।

শ্যামলী বলে—খেসারত! না-না। ওসবের কথা ভাবিই না। শোন আসল কথাটাই হলো না। নসুদার জামিনের জন্য কিছু টাকা নিয়ে যাও—দ্যাখো বড় উকিল লাগিয়ে যদি কিছু করা যায়।

ললিত ঘোষ জানে কীভাবে পা ফেলতে হয়। কাজ হাসিল করতে হয়। সেই বুদ্ধি দিয়েই সে জীবনে পড়াশোনা করেছে আজ মন্ত্রীদের ভোটে গাল ফাটিয়ে চীৎকার করে মন্ত্রীকে পাকড়ে আর নিজের এলেমে এইখানে উঠেছে।

এবার শ্যামলীকে নিয়েই স্বপ্ন দেখে সে। শ্যামলীও সমীরের কথাটা ভেবেছে। জীবনে প্রেম একবারই আসে। একজনকে ঘিরেই প্রেমের শতদলের জন্ম। তিলে তিলে সঙ্গোপনে বিকাশ ঘটে সকলের অগোচরে। তারপর এক শুভমুহূর্তে তা সৌরভ স্নাত হয়ে বিকশিত হয়।

তারপর আসে ঝরার পালা। পদ্ম যেমন ফুটে ওঠে, সূর্যস্নান করে—ঝলমল করে ওঠে কি তৃপ্তিতে তেমনি প্রেমও একদিন একজনকে ঘিরে বিকশিত হয়।

শ্যামলীর জীবনে এখন প্রেমের কোরক-পাপড়ি ঝরার দিন। সমীরকে নিয়ে তার স্বপ্ন—স্বপ্নই রয়ে গেছে। তবু সমীরের কথাটা তার মনে বাজে—একাই থাকবে চিরকাল।

শ্যামলী চুপ করে বসে আছে। সামনে একরাশ পরীক্ষার খাতা—ওগুলো দেখতেও ভালো লাগে না। হঠাৎ ফোনটা বেজে ওঠে। শ্যামলী ফোন তোলে, ওদিক থেকে ললিত ফোন করে।—কি করছ?

আজ শ্যামলীর যেন ললিতের কণ্ঠস্বরই কেমন ভালো লাগে।

শ্যামলী আজ চটেও ওঠে না। ললিত তার জন্য অনেক কিছুই করেছে বন্ধুর মতই। বলে শ্যামলী।

—কিছুই করছি না। এমনি বসে আছি।

ললিত বলে—কাল তো ছুটি! চলো কাল সকালে ঘুরে আসবে রবীন্দ্রনাথের সেই রূপনারায়ণের কূলে। দিনভোর ওখানে সবুজ পরিবেশে কাটিয়ে ফেরা যাবে। আর হ্যাঁ—তোমার বাড়ির প্ল্যানটাও নেবে। ওই ইঞ্জিনিয়ারকেও আসতে বলেছি। প্ল্যানটা ফাইন্যাল করে নেবে ওখানেই।

শ্যামলীর মনে হয় একদিন সবকিছুর থেকে ছুটিই নেবে। ঘুরে আসবে বাইরে থেকে। তাই রাজি হয়ে যায়। ললিত বলে,

—তৈরি থেকো কাল সকাল আটটাতেই তোমার ওখানে পৌঁছবো।

হাইওয়ে থেকে সরু পথটা গাছ-গাছালি, দু চারটে ছোট বাড়ির পাশ দিয়ে চলে গেছে। দুদিকে কলাবন-বাঁশের ঝাড়-ওদিকে সবুজ ধানক্ষেতের বিস্তার। ওদিকে রূপনারায়ণ-জোয়ারের বেলা খোলা জল তীরভূমিতে এসে ঠেকেছে একেবারে বাংলোর নীচেই।

নদীর ধারেই সুন্দর সাজানো বাংলো। লনের আশপাশে গাঁদা-কসমস-ক্রিসেনথিমাম-গোলাপ নানা ফুলের রং বাহার। সবুজ লনের ওদিকেই নদীর বিস্তার। একটা রঙিন বড় ছাতার নীচে কয়েকটা চেয়ার একটা সেন্টার টেবিল।

সামনে নদীর বুকে দু চারটে নৌকা পাল তুলে চলেছে ; জেলে ডিঙ্গিও দেখা যায় নদীর বুকে কালো বিন্দুর মত।

ললিত সাহেবের আপ্যায়নের কোন ত্রুটি রাখেনি কোন কনট্রাক্টার। সাহেবের হাতেই তার ব্যবসার কলকাঠি। এর মধ্যে চিলড বিয়ার, জিন-হুইস্কির বোতলও এসেছে। মটন, মুরগী মায় কোলাঘাটের নদীতে ধরা টাটকা দাড়িওয়ালা তপসে-রূপালী ইলিশও আনা হয়েছে।

ললিত এখানে যেন অন্যমানুষ। জিনের বোতল খুলে বলে—শ্যামলী, হ্যাভ সাম ড্রিংক্‌স্।

সামনে ইলিশ মাছ ভাজা আর তপসে মাছের ফ্রাই।

শ্যামলী দেখছে ললিতকে। কলেজের সেই নিঃস্ব মুখচোরা নিরীহ ছেলেটা আজ পয়সা আর প্রতিষ্ঠার ছোঁয়ায় একেবারে বদলে গেছে।

এর মধ্যে জিপ, না হয় অ্যামবাসাডার নিয়ে কয়েকজন এসেছে। ললিত উঠে গিয়ে ওদের সঙ্গে কথা বলছে।

শ্যামলী দেখেছে ওদের কথাবার্তায় কেমন ফিসফিসানির ভাব আর সাহেবকে কেউ মোটা খাম—কেউ বা ছোট অ্যাটাচি খুলে কি প্যাকেট দিচ্ছে।

শ্যামলীর ব্যাপারটা নজর এড়ায় না। বেশ বুঝেছে সে ওই খামে প্রণামীর টাকাই আছে। যার জোরে অনেক বেআইনি কাজও আইনসিদ্ধ হয়ে যাবে সাহেবের করস্পর্শে। তার বিনিময়ে তারা সাহেবকে কিছু প্রণামী দিয়ে আর দেশের মানুষকে এইভাবে ওরা ঠকিয়ে চলেছে। দেশের মানুষের পয়সা চুরি করছে। এরা চোরই।

শ্যামলীর মনটা কেমন বিষিয়ে ওঠে।

ললিত মদ গেলে আবার ফিরে এসে। এই চুরির পয়সা এরা পকেটস্থ তো করেই—আবার সেই পয়সায় মদ খেলে গাণ্ডেপিণ্ডে খায়। যে দেশের মানুষ একবেলা অনেকেই খেতে পায় না সেই দেশের সরকারি কর্মচারি। এক শ্রেণীর ব্যবসাদার এইভাবে বিলাস করে।

শ্যামলীর ওই খাদ্য খেতেও কেমন প্রবৃত্তি হয় না। ললিতের আসল স্বরূপটা এবার তার সামনে পরিষ্কার হয়ে ওঠে। ললিতের কথায় শ্যামলী বলে—ওসব খাইনা।

—এবার খাবে, আরে একটু এ্যালকোহল পেটে গেলে মগজ খুলবে শ্যামলী।

—তার দরকার নাই। ওসবের দরকার তোমারই। চাকরি ছাড়াও দেখছি অনেক রকম ম্যানিপুলেশন করতে হচ্ছে তোমায়।

শ্যামলীর কথায় হাসে ললিত। বলে,

—এযুগে ওটা না করতে পারলে সে মিস্ ফিট। বুঝলে শ্যামলী, টাকা যখন আসতে চায় তাকে বাধা দিতে নাই। মেক হে হোয়াইল দি সাম্ সাইনস্। সময় থাকতে ফসল ঘরে তোলো। এই মহাজন বাক্য। তারপর প্রেম-বিয়ে ইত্যাদি প্রভৃতি-

মদ গিলছে ললিত। শ্যামলী বলে—তোমার ইঞ্জিনিয়ার কোথায়? প্ল্যানটা আনতে বললে?

হাসছে ললিত—হবে মাই ডিয়ার। আমাদের বাড়ি ঠিকই হবে। সাদা মার্বেল পাথর বসানো মেজে-দেওয়ালে গ্লেজড টাইলস। সামনে বাগান—শ্যামলী এতদিন সময় হয়নি। এবার মনে হয় উই ক্যান ম্যারি। সুইট হোম—তুমি আর আমি।

চমকে ওঠে শ্যামলী। মদের নেশা চলেছে ললিতের। কথার স্বরও জড়িয়ে আসছে। ক্লান্ত দুপুর—লোকটা এর মধ্যেই বেহেড মাতাল হয়ে এগিয়ে আসছে তার দিকে। টলছে ললিতের পা—বলে, শ্যামলী মাই ড্রিম।

ধরতেই আসছে শ্যামলীকে। বলে,

—তোমাকে একান্ত নির্জনে পাবার জন্যই এখানে এনেছি। দুজনে আজ চাঁদনী রাতে এখানে রাতভোর মনের কথা বলবো শ্যামলী—

শ্যামলী সরে আসে।

ললিত বলে—প্লিজ, রাগ করোনা লক্ষীটি। আজ দুজনে—

টলছে ললিত। আর হাঁটতে পারে না। ঘাসের উপরই বসে পড়ে। বিড় বিড় করছে। চুলগুলো ঝড়ো হাওয়ায় এলো মেলো। হাতে মদের গ্লাশটা—

শ্যামলী সরে আসে। আর এক মুহূর্তও এখানে থাকতে চায় না। সে একদিন ললিতের সম্বন্ধে কিছু ভেবেছিল। কিন্তু সেই ভাবনাগুলো এখন ঘৃণায় পরিণত হয়েছে।

পায়ে পায়ে বাংলো থেকে বের হয়ে আসে। তখনও দেখা যায় ললিত সাহেব ঘাসের উপর গড়িয়ে পড়েছে দ্রব্যগুণের মহিমায়। শ্যামলী বাংলোর বাইরে এসে পথটা ধরে হাইওয়ের দিকে আসছে। পথে একটা খালি রিক্সা কোথাও সওয়ারী নামিয়ে ফিরছিল, তাকেই বলে,

—স্টেশন নিয়ে চলো।

একটু দূরেই রেল স্টেশন। ওখান থেকে হাওড়ার টিকিট কেটে ট্রেনে উঠে পড়ে শ্যামলী। মনে হয় একটা বিপদের হাত থেকেই বেঁচে ফিরেছে সে আজ।

মনে হয় শ্যামলীর একটু ভুলই করতে গেছল সে। সেই ভুলটাকে ধরে ফেলেছিল হঠাৎ। নিজের উপরই রাগ হয়।

সমীর সীমা দুজনে এসেছে শ্যামলীর বাড়িতে। ওদেরও প্ল্যান করাতে হবে। সীমা নিজের একটা বাড়ির স্বপ্ন দেখে এবার। সমীর বলে—জায়গা কিনতে এত টাকা গেল, বাড়ি করার তো অনেক খরচ। এখুনিই পাবো কোথায় টাকা?

সীমা এ নিয়ে ভেবেছে। তার বাবাও মাঝে মাঝে কলকাতায় আসেন ব্যবসার কাজে। হোটেলেই ওঠেন—তবু মেয়ে জামাই নাতিকে দেখতে আসেন। সীমার বড়দার ট্রানস্পোর্ট-এর চালু ব্যবসা। সেও কলকাতায় এলে এখানে আসে।

সীমা বাবা দাদাকে সল্টলেকে তাদের জায়গাটা দেখিয়েছে। ক'মাসের মধ্যে ওদিকে অনেক বাড়ি উঠছে। ক্রমশ সেই ধূ ধূ প্রান্তর সবুজ হচ্ছে। মানুষের বসতি গড়ে উঠছে, প্ল্যানমাফিক বাড়ি ঘর হচ্ছে। রাস্তাও হয়েছে। বিজলিবাতিও এসে গেছে।

সীমা বলে বাবাকে,

—তোমার জামাই তো কোন মতে জায়গাটা কিনলো বাবা কিন্তু বাড়ি করার টাকা তো নাই এখন। তাই পড়েই থাকবে জায়গাটা।

সীমার বাবার টাকার অভাব নাই। ছেলেরাও ভালো ব্যবসাপত্র করছে। তিনিই বলেন—টাকার জন্য আটকাবে না সীমা। প্ল্যান পাস করা। কত লাগবে জেনে নে ইঞ্জিনিয়ারের কাছে। দু তিন লাখের মধ্যে ছোট একটা বাড়ি হয়ে যাবে। টাকা আমিই এখন দেব। সমীর পরে যদি হয় ফেরত দেবে। এখন যে বাড়ি দু লাখে হবে পাঁচবছর পর সেইটাই পাঁচলাখ পড়বে।

সীমা তাই বাবার টাকা নিয়েই এখনই বাড়ি করতে চায়। শ্যামলীর বাড়িতে এসে দেখে শ্যামলী নাই। বাড়ির কাজের মেয়ে বলে,

—দিদি সেই ললিতবাবুর সঙ্গে কোথায় বেড়াতে গেল ওর গাড়িতে। ফিরতে রাত হবে বলে গেছে।

—তাই নাকি। সীমা অবাক হয়। শ্যামলী যে এখন তার কলেজের কোন বন্ধু-মস্ত বড় অফিসার তার সঙ্গে ঘুরছে শুনে খুশিই হয়।

সমীর বলে—তাহলে ফিরে চলো। কাল ফোন করে আসা যাবে।

সীমা বলে—শ্যামলীদির এতদিনে সুমতি হয়েছে তাহলে। এবার বিয়ে-থা করে থিতু হোক। শুনেছি ললিতবাবুও ভালো রোজগার করে। ভালোই হবে ওদের বিয়ে হলে।

সমীর শুনছে সীমার কথাগুলো। শ্যামলী আজ নিজের কথা ভাবছে—ভাবাটাই স্বাভাবিক। তবু সমীরের মনে হয় শ্যামলী যেন তার জীবন থেকে হারিয়েই যাবে।

সেইটাই স্বাভাবিক নিয়ম। সমীর সেদিন যে ভুল করেছিল তার জন্য খেসারত তো দিতেই হবে। সীমা আজ খুশিই হয়েছে শ্যামলীর এই সুমতিতে।

মেয়েদের মনের গহনে অন্য মেয়ের জন্য কিছু সহজাত অসূয়া থাকেই—সে যত আপনজনই হোক। সীমাও জানে সমীর শ্যামলীর ঘনিষ্ঠতার কথা। ছেলেবেলা থেকেই ওরা দুজনকে দুজনে চেনে।

সমীর কলকাতায় আসার পর শ্যামলীই জোর করে অন্যত্র বিয়ের প্রস্তাবকে ভেস্তে দিয়ে কলকাতায় পড়তে এসেছিল। এখানেও তাদের দেখা শোনা বন্ধ হয়নি। মনু মুখুয্যে তো কলকাতায় এসে ওদের দুজনকে দেখে গিয়ে গ্রামেও অনেক কথা বলেছিল। সীমার কানেও সেইসব কথা তুলে দেবার লোকের অভাব হয়নি।

সীমার মনে একটা নীরব সন্দেহ—চাপা অসূয়ার ভাবই প্রকট হয়েছিল শ্যামলীর উপর; সমীরের উপর হয়েছিল রাগ। মুখে কিছু বলতে পারেনি সীমা।

তাই কলকাতার বাসার কথাটা সে ভেবেছিল। প্রভাদেবীকেও রাজি করিয়ে সীমা নিজের স্বামীর উপর পুরো দখলদারি কায়েম করার জন্যই কলকাতায় এসেছিল।

সমীরের মধ্যে অবশ্য বেচাল সে কিছুই দেখেনি। শ্যামলীও সহজভাবেই সীমার সঙ্গে মিশেছে। সীমা প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করার মত কিছুই পায়নি।

তবু শ্যামলী সুন্দরী-রূপযৌবন তার আছে। উচ্চশিক্ষিতা আর ভালো রোজগার করে।

স্বাধীনভাবে থাকে। সীমা এগুলোকেও হিংসা করে।

সমীর শ্যামলীর কথা মানে—এটাও দেখেছে সীমা।

মনে হয় শ্যামলী যেন তার কিছুটা প্রভাব খর্বই করেছে।

তাই শ্যামলীর এবার বিয়ে করার ইচ্ছাটা দেখে খুশিই হয় সীমা।

সমীর এ নিয়ে কিছুই বলে না। ভাবে শ্যামলী যদি বিয়ে করে সুখী হয় সেও খুশিই হবে। তাই পরদিনই সকালে এসেছে সমীর শ্যামলীর ওখানে।

শ্যামলী সকালে চা নিয়ে বসেছে। কালকের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথাটা এখনও মন থেকে মুছে ফেলতে পারেনি। সকালে সমীরকে দেখে বলে,

—এসো।

সমীর বলে—কনগ্রাচুলেসনস্।

শ্যামলী অবাক হয়—কেন?

—ললিতবাবুকেও শুভেচ্ছা জানাতে হবে। ভালোই করেছো শ্যামলী।

শ্যামলী এবার হেসে ওঠে—কি বলছ সমীর?

—কেন ললিতবাবু—

—ওই জানোয়ারটার নামও করো না। ছিঃ ছিঃ মানুষ এমনি করে টাকার জন্য বদলে যেতে পারে ভাবিনি। ঘুসখোর-মাতাল একটা লম্পট ও।

—কি বলছ শ্যামলী।

শ্যামলী কালকের অভিজ্ঞতার কথাটা বর্ণনা করে বলে,

—সমীর নিজে কোন দিন টাকা-প্রতিষ্ঠা-সুখের কথা ভাবিনি। যারা জীবনে ওইটাকেই বড় করে দেখে তাদের আমি মেনে নিতে পারিনি, ঘৃণা করি। ওই অন্ধকারের জীবন থেকে এই জীবনকেই মেনে নিয়ে সুখী থাকতে চাই।

সমীর শুনছে ওর কথা। আজ যেন শ্যামলীকে নতুন করে চেনে সে। সমীর বলে—আবার ভুল করলে শ্যামলী।

শ্যামলী বলে—ভুল নয় সমীর। আমি উচিত কাজই করেছি। সামান্য নিয়েই আমি খুশি থাকতে চাই। চাওয়া পাওয়ার হিসাবটা এক একজনের কাছে এক এক রকমের। আমার চাওয়া পাওয়ার হিসেব সকলের সঙ্গে মিলবে না।

সীমা শুনেছে কথাটা। বলে সে—তাহলে শ্যামলীদি ললিতবাবুকে বিয়ে করছে না?

সমীর বলে—ললিতবাবু নাকি মাতাল, ঘুসখোর-লম্পট একটা মানুষ। পয়সাই তার কাছে সব। শ্যামলীকে তো চেনো, ওর মত মেয়ে ওই মানুষকে কোন দিনই মেনে নিতে পারবে না।

সীমা চুপ করে থাকে। খবরটা শুনে সে খুশি হয়নি তা বোঝা যায়। বরং তার মনে একটা সন্দেহের ছায়াই ঘনীভূত হয়। আজ সে সমীরকেও যেন সন্দেহ করে। এই সন্দেহের কালো ছায়া তার মনের প্রসন্নতাকেও যেন বিবর্ণ করে তোলে।

সীমা বলে—বিয়ে করে কারোও অধীনতা স্বীকার করার কি দরকার। শ্যামলীদি এমনিতে বেশ ভালোই আছে।

সমীর লেখা থামিয়ে চাইল। সে আজ যেন সীমার মনের সেই সন্দেহের মেঘটাকে দেখতে পায়। মেয়েদের মন এমনি রহস্যাবৃতই—সেখানের ভাবনাগুলোও বিচিত্র। সীমাও তাই এসব ভাবে—সেই মিথ্যা ভাবনাগুলোকে দূর করার সামর্থ সমীরের নাই।

সে এই জ্বালা-ভাবনা-প্রত্যহের মালিন্য দিয়ে তার মন মেজাজকে বিগড়ে দিতে চায় না। তাই তার কাজের মধ্যেই সান্তনা খোঁজে। দেখেছে মানুষ এক জায়গায় নিঃস্ব-অসহায়-নিঃসঙ্গ। সীমার এই মানসিকতার সঙ্গে সমীরের মানসিকতার কোন মিলই নাই। মেয়েদের হীন স্বার্থপরতাই সংসারের রূপটাকে বদলে দেয়।

সীমার জন্যই মাও চলে গেছে এ বাড়ি থেকে—সীমা যেন তার পরিবারের মধ্যে একটা নীরব ব্যবধানের দেওয়াল তুলেছে। সমীরের মনেও একটা নীরব যন্ত্রণার সূত্রপাত করেছে সীমার এই ব্যবহার।

প্রবীর এখন নতুন বাড়ি করেছে। প্রবীরই এখন অঞ্চল প্রধান। রেখাও স্কুলে চাকরি করছে। এছাড়া রেখাও এখন স্বপ্ন দেখে সে এবার রাজনীতির পথেই এগিয়ে যাবে। প্রবীরকেও ছাড়িয়ে যাবে।

তাই সে এখন দিনভোর নানা জায়গায় ঘোরে সদরের নেতাদের কাছেও যায় আর প্রবীরও চায় তার স্ত্রী এবার ভোটে দাঁড়াক। রেখাও তাই চায়।

কিন্তু প্রভাদেবীর সংস্কারে বাধে এটা। প্রবীরকে বলে—এসব কি রে প্রবীর? ঘরের বউ চাকরি করছিস কর, ঘর সংসার তো করতে হবে। তা নয় দিনরাত ঘুরছে। হাটে মাঠে লেকচার দিচ্ছে?

প্রবীর এখন ক্ষমতার—অর্থের স্বাদ পেয়েছে।

এখন তার নীতি জ্ঞানও বদলেছে। পঞ্চায়েতের নানা কাজেই বহু টাকা আসে। সুবীরকেও প্রবীর ঠিকেদার বানাতে চেয়েছিল বেনামে কিন্তু সুবীর এসব কাজে নামেনি। তাই প্রবীর তার শ্যালক নন্দকে এনে তার নামেই ওই ব্যবসা সুরু করে এখন বেশ ভালোই রোজগার করছে।

ওদিকে বেশ সুন্দর বাড়িও করেছে। প্রভারও কানে আসে প্রবীরের সম্বন্ধে নানা কথা। সে নাকি বেশ পয়সা কামাচ্ছে ওইসব করে।

মনু মুখুয্যেও দিনকতক প্রবীরের পিছনে ঘুরছে। লোকটা শকুনের জাত। ভাগাড়ের খবর সব রাখে। ভেবেছিল সেও কিছু কাজ কর্ম করার নাম করে কিঞ্চিৎ অর্থ রোজগার করবে। কিন্তু প্রবীর চেনে ওকে। তাই মনু মুখুয্যেকে সে পাত্তা দেয়নি। প্রবীর পাত্তা দিচ্ছে তরুণ সমাজকে। জানে ওরাই ভোটের সময় জান লড়িয়ে দেবে। মনু মুখুয্যেরা শুধু নিতেই জানে দিতে জানে না।

ওই মনু মুখুয্যেই এবার নানা কথাই রটনা করে। আর তার সঙ্গে জুটেছে দেবেন।

প্রবীরদের উপর তার অনেকদিনের রাগ জমে আছে।

দেবেনও বলে—পাকা দালান, জিপ এসব হয় কোত্থেকে হে? পাবলিকের টাকাই মারে ও প্রবীর। এবার বৌকে মন্ত্রী করবে?

প্রভাও শোনে ওসব কথা। সে চেয়েছিল সামান্য কিছু নিয়েই সুখী থাকবে তার ছেলেরা। বহু কষ্টে সে ওই পিতৃহীন ছেলেদের মানুষ করেছে এখানে এসে। ঠাকুর তার মনস্কামনা পূর্ণ করেছেন।

কিন্তু এবার তার চিন্তা হয়, ছেলেরা যেন ক্রমশঃ তার থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। ক্রমশ: নিঃসঙ্গ অসহায় বোধ করছে এবার প্রভা।

সমীর দূরে থাকলেও মনের দিক থেকে প্রভার সে খুব কাছেই আছে। কিন্তু সমীরও এখন নিজের ঘর সংসার-ছেলে কাজ নিয়ে ব্যস্ত। সীমাই চায় তার স্বামীকে একান্ত ভাবে পেতে তাই যেন প্রভারও ঠাঁইটা সেখানেও নড়বড়ে হয়ে গেছে। প্রভার আশা ছিল সমীর গ্রামেই ফিরবে। কিন্তু সীমার চাপে পড়েই কলকাতাতেই জায়গা কিনেছে সে।

প্রভা সেখান থেকে কিছুটা হতাশ হয়েই ফিরেছে।

গ্রামে প্রবীর রেখারও তাকে নিয়ে ভাবার, তার দিকে নজর দেবার কোন সময় নাই। না দেখুক—তবু প্রভা ভেবেছিল ওরা নিজেদের কাজ নিয়েই খুশি থাকবে।

কিন্তু তা হয়নি। ওরা আরও অনেক কিছুই পেতে চায়। তাই সোনার হরিণের পিছনেই দৌড়চ্ছে। প্রভা তাই বলে কথাটা।

প্রবীর বলে—মা দিন বদলেছে। এখন মেয়েরাও ঘরের বাইরে এসে পুরুষের মতই কাজ করবে দেশের কাজ।

—কিন্তু দেশের কাজ মানে নিজেরটাই দেখা নয়।

—মানে? প্রবীর মায়ের কথায় অবাক হয়। বলে সে—কি বলতে চাও মা?

—আমি নই। লোকে বলে তুই নাকি পঞ্চায়েতের টাকা নিয়ে নয় ছয় করছিস? বিভূতি ঠাকুরপো কতদিন প্রধান ছিল। কই তার নামে তো কেউ কিছু বলেনি?

প্রভার কথাটা প্রবীরের ভাল লাগে না। তবু বলে,

—তখন পঞ্চায়েতের কাজ ছিল কম। এখন কত কাজ। সকলকে তো খুশি করা যায় না। তাদের দু চারজনের স্বার্থে লেগেছে হয়তো তাই তারা যা খুশি বলে। ওসবে কান দিলে চলবে না।

প্রভা চুপ করে যায়। তার মনে কেমন অশান্তির ছায়া ঘনিয়ে আসে। এদের মনের লোভটাকে দেখেছে সে। এর মধ্যে নতুন সেটেলমেন্টও এসেছে। এখন জমির মালিকদের নাম নতুন করে খতিয়ানে লেখা হবে।

মাঠে মাঠে আমিন, গ্রামের লোকজনও ঘুরছে।

প্রভা বলে সুবীরকে—তুই একটু যা। নাহলে জমিতে কার নাম বসাতে ওরা কার নাম বসিয়ে দেবে, শেষে গোলমাল হবে।

সুবীর এখন চাকরি নিয়েই ব্যস্ত। মটর বাইকে পাঁচ কিলোমিটার পথ বাস স্ট্যান্ড।

সেখানে মটরবাইক রেখে বাসে প্রায় পনেরো কিলোমিটার দূরে দুর্গাপুরে যেতে হয়। তাই এবার বলে সে, দুর্গাপুরে কোয়ার্টার পাবার চেষ্টা করছি মা। যেতে আসতে যা কষ্ট হয়।

প্রভাও সেটা বোঝে। তবু বলে,

—গ্রামের অনেকেই তো এইভাবেই কাজ করছে।

সুবীর চুপ করে থাকে। সেদিন ওই মাঠে যাবার কথায় বলে সুবীর।

—মেজদাকেই বলো, ওসব ও ভালো বোঝে। ওই করুক।

প্রবীর অবশ্য অফিসে বসেই কলকাঠি নাড়ছে। এর মধ্যে গ্রামের দুচার জনের জমি—মায় তাদের কিছু সেরা জমিই প্রবীর নিজের নামেই রেকর্ড করিয়েছে, আমিন পঞ্চায়েত প্রধানের কথা মানতে বাধ্য হয়। বলে—কোন গোলমাল হবে না তো?

প্রবীর বলে—না, না।

কিন্তু মনু মুখুয্যে শকুনির জাত, সে সব নোংরামির খবর পায়। বাতাসে সে গন্ধ পায়। সেইই সেদিন প্রভাকে বলে,

—বৌঠান, জমির কাগজপত্র তোমাদের ঠিক আছে তো?

প্রভা শুধোয়—কেন?

—এখন নতুন খতিয়ানে নাম উঠছে তো, তাই একটু দেখো যেন নাম ঠিক ঠাক বসে।

প্রভাই প্রবীরকে বলে—হ্যাঁরে, জমি জায়গার মাপ সব ঠিক ঠাক করিয়েছিস তো?

প্রবীর বলে—ও নিয়ে তুমি কিছু ভেবো না মা। পঞ্চায়েতের আমিনকেই সব বুঝিয়ে দিয়েছি। ওসব ঠিক ঠাকই হবে।

এমনি দিনে সুবীরই কথাটা জানায় মাকে।

প্রভা শুনে প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারে না। বলে সে—কি বলছিস এসব?

সুবীর বলে—ঠিকই বলছি মা। ক'দিন থেকেই কথাটা তোমাকে বলবো ভাবছি। মানে নন্দিনী বেশ ভালো মেয়ে মা। আমাদের স্টোর অফিসে চাকরি করে। মাইনে ছাড়া ইয়ে মানে বাড়তি যা রোজকার করে সেটাও কম নয়। অনেকদিন ধরেই ওর সঙ্গে চেনা জানা। ওর কোয়ার্টারিও আছে। বিয়ে করার কথাটা এতদিন বলতে পারিনি। এবার যদি তুমি মত দাও।

প্রভা দেখছে সুবীরকে। মনে পড়ে এইটুক অবস্থাতে ও বিদেশে বাবাকে হারিয়েছিল, তখন ওর জ্ঞানও হয়নি। সেই ছোট্ট ছেলেটাকে সমীরই মানুষ করেছে। প্রভাদেবী তাকে বড় করেছেন। আজ সে যুবক—যেন নিজস্ব একটি জগতেই সে বিচরণ করে। সেখানে প্রভারও কোন ঠাই নেই। সমীরও দূরের মানুষ। তার জগৎ জুড়ে রয়েছে এখন অন্য একটি মেয়ে। তাকে নিয়েই সুবীর ঘর বাঁধবে স্বপ্ন দেখে। প্রভা শুধোয়,—কী নাম বললি?

—নন্দিনী। নন্দিনী ঘোষ। সেও গ্রাজুয়েট।

প্রভার সাবেক পন্থী মন চমকে ওঠে—কি বললি? বামুন নয়—ঘোষ!

সুবীর সহজভাবেই বলে—তাতে কী হয়েছে মা। এখন এসব আর ক'জন মানছে বলো। জাতপাতের ব্যাপার এখন আর নেই।

প্রভা বলে—সমীরকে লিখছি। তার মতামতও তো চাই বাবা। প্রবীরকে বলি—

সুবীর বলে—বিয়ে করবো আমি। নিজের পছন্দটাই সেখানে বড় কথা মা। তবু বলে দ্যাখো ওদের—তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে।

অর্থাৎ প্রয়োজন হলে সুবীর বিদ্রোহও করতে পারে তার আভাষই যেন দিয়েছে সুবীর। প্রভা আজ হতবাক। তার বক্তব্য মতামতের কোন দামই নেই। সে যেন আজ অবহেলিত-অপ্রয়োজনীয়ই হয়ে উঠছে এই সংসারে।

সমীর নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। চাকরিটা এখনও রেখেছে। তার উপর লেখার কাজ। এবার একটা সাহিত্য পুরস্কারও পেয়েছে তার উপন্যাসের জন্য। ওই পুরস্কার তাকে একটা নতুন স্বীকৃতি এনে দিয়েছে। ওই বাংলা উপন্যাসটা হিন্দী-মালয়ালম, তামিল ভাষাতেও অনূদিত হয়েছে। এর আগেও তার কিছু লেখা হিন্দীতে অনূদিত হয়েছিল কিন্তু এই উপন্যাস তাকে সর্বভারতের সাহিত্য ক্ষেত্রে একটা স্বীকৃতি এনেছে।

বোম্বাই এর চলচ্চিত্র জগতে এবার পা রেখেছে সে। শান্ত সেনের চিত্রনাট্যের কাজ শেষ করতে হবে তাই পরিচালকের সঙ্গে বসার দরকার। বোম্বাই যেতে হবে তাকে।

সীমা এখন খুশি। ওই পুরস্কারের টাকাটা তার বাড়ি তৈরির কাজে লাগবে। সেইই এখন সমীরের গ্রন্থস্বত্বের টাকার হিসাবপত্র রাখে। প্রকাশকদের অনেকেই এখন বৌদির খুব অনুরক্ত। তারা জানে নতুন উপন্যাসের কপি পেতে গেলে সমীরবাবুকে নয়—বৌদিকেই ধরলে কাজ হবে।

সমীর টাকা পয়সার হিসাব রাখে না। দিন চললেই সে খুশি। কাজ নিয়েই থাকে। নিজের দরকার হলে সীমার কাছেই হাত পাততে হয় তাকে।

সীমাও প্রশ্ন করে—সেদিন দুশো টাকা নিলে আজই আবার টাকা চাই?

সমীর বলে—কিছু বই কিনতে হবে।

তার নিজের জন্যও কোন চাহিদা নেই। বাজে খরচা মধ্যে সিগ্রেট, ভালো দামি জামা কাপড়ও সে পরতে চায় না। বলে,

—ওতে মনটা পোশাকের দিকেই চলে যায়। ময়লা লাগলো, ছিঁড়ে গেলো এইসব ভাবনাই ভাবতে হয়। তার চেয়ে সাধারণ ধুতি পাঞ্জাবীই ভালো। ফাটলে ফুটলেও ক্ষতি নাই।

জীবনটাকে অনেক সহজ করে নিয়েছে সে, নিজের চাহিদা সে বাড়ায় নি। তার মনে হয় সাহিত্য সৃষ্টিও একটা সাধনাই। সাধকের লোভ লালসা থাকা উচিত নয়। সংসারে বাস করেও তাই সমীর কিছুটা বাইরেই থাকতে চায় সংসারের ঝামেলাগুলোকে গায়ে মাখতে চায় না। তাই সীমার হাতেই সব কর্তৃত্ব ছেড়ে দিয়েছে সে।

'মায়ের চিঠিটা পেয়ে একটু অবাক হয়। কলকাতাতেও দেখেছিল সীমার সব কর্তৃত্ব তুলে নেওয়াটা মায়ের কোথাও বেধেছিল। মা কখনও প্রকাশ্যে কোনদিন ঝগড়া করেনি। অতীতের সেই দুঃখ কষ্ট অত্যাচারের দিনেও মা জেঠিমাদের সঙ্গে কড়া কথা বলেনি। বিপদ থেকে উদ্ধারের পথই খুঁজেছিল ঠাণ্ডা মাথায়।

কলকাতায় সীমার সঙ্গেও এ নিয়ে কোন কথা বলেনি। তার সংসার থেকে নীরবে নিজের জগতে ফিরে গিয়েছিল মা।

সেখানেও এবার জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। প্রবীর-রেখাদের লোভী মনোবৃত্তিকে মা আদৌ সমর্থন করতে পারছে না। এই নিয়ে বলতে প্রবীর রেখাও প্রতিবাদ করে।

মা এটাকেও সয়ে ছিল। কিন্তু এবার ছোট ছেলে সুবীরের এইভাবে বিয়ে করার সিদ্ধান্তটাকে প্রভা মেনে নিতে পারেনি। অবশ্য প্রতিবাদ সে করেনি। সমীরকে অনুযোগই করেছে মাত্র।

সমীর মায়ের এই নিঃসঙ্গতার কথাটা ভাবতে পারে। মা তাদের কাছে কোনদিন কিছুই চায়নি। কোন প্রত্যাশা নিয়ে সে ওই দুঃখ-কষ্টের মধ্যে সংগ্রাম করে এদের মানুষ করে নি। মায়ের কর্তব্যই করেছিল প্রভাদেবী।

হয়তো বিনিময়ে ছেলেদের কাছে কিছু শ্রদ্ধা, কিছু সহমর্মিতারই প্রত্যাশা করেছিল। কিন্তু সমাজের রূপ বদলের সঙ্গে মানুষের মানসিকতাও বদলে গেছে। মা এই পালাবদলকেই মেনে নিতে পারছে না। আজকের যুগের স্বার্থপরতা-লোভ প্রভাদেবীকে ব্যথিত করেছে।

সমীর বাড়িতে গেছে। মেজভাই প্রবীর তার স্ত্রী রেখা নতুন বাড়িতে চলে যাবার কথাই ভেবেছে। গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠান করছে মহা ধূমধাম করে। প্রভা বলে—ওরা ওই বাড়িতেই চলে যাবে। এখানে জায়গা কম। তাছাড়া ওদের কাছে সবসময় লোকজন আসে। এখানে অসুবিধা হচ্ছে ওদের।

সমীরকে প্রবীরই ওই নতুন বাড়িতে নিয়ে যায়—বেশ কিছুটা জায়গা নিয়ে দোতলা বাড়িটা। এখন গ্রামেও বিজলি এসেছে, ফোনও পেয়েছে প্রবীর পদাধিকার বলে। রেখাও ব্যস্ত। সামনে ভোট আসছে। নীচের ঘরে বেশ কিছু ছেলে মেয়ে পোস্টার গুনছে। ব্যানার লিখছে। রেখাও ভোটের কর্মপদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করছে।

সমীর দেখছে এসব। এরা নিজেদের জগৎ নিয়েই ব্যস্ত। মোজাইক করা মেজে, ঘরে দামি আসবাব, কালার টি ভি, ফ্রিজ। রান্নাঘরে কাঠ কয়লার চল নেই, গ্যাসও এনেছে দুর্গাপুর থেকে। নিজেদের জিপেই এখন ওসব আনা নেওয়া করা হয়।

সমীর দেখছে ওরা এখন নিজেদের ব্যাপার নিজেদের লক্ষ্য নিয়েই ব্যস্ত।

সুবীর কিছুদিন দুর্গাপুরেই রয়েছে হোস্টেলে। বাড়িতে প্রভাদেবী একা—অবশ্য বামুন মেয়ে কাজের লোক রয়েছে। আর আসে পারুল বৌদি। আজ সেইই কিছুটা নিশ্চিন্তে রয়েছে। সমীরের কাছে, কাকীমার কাছে সে কৃতজ্ঞ। তারাই তাকে বাঁচার পথ দেখিয়েছে। তাই পারুল বৌদিই মায়ের সঙ্গিনী।

...গৃহ প্রবেশের এলাহি আয়োজন করেছে প্রবীর। সহরের অনেক মাতব্বর নেতা—সরকারি পদস্থ কর্মচারীও এসেছে। এলাকার বহু মানুষের নিমন্ত্রণ। প্রবীর তাদের প্রতিষ্ঠা বৈভবই যেন দেখাতে চায়।

এর মধ্যে প্রবীরের ছেলে মেয়েও হয়েছে। তাদের এখন থেকেই সহরের নামী হোস্টেলে

পাঠাবার কথা ভাবছে। প্রভা বলেছিল,—গ্রামে থেকেই তোরা মানুষ হয়েছিস বাবা ওরাও এখানেই পড়ুক।

রেখা বলে—এখানে ইংরিজি মিডিয়ামের স্কুল নাই তাই ওদের শহরেই যেতে হবে।

প্রভা বলে—সেকি! এখানের স্কুলে ইংরিজি তুলে দিয়েছো তোমরা আর নিজেদের ছেলেমেয়েদের ইংরাজী পড়াবার জন্যে শহরের ইস্কুলে পাঠাবে?

প্রবীর বলে—এখন এই রেওয়াজই হয়েছে মা। তুমি সেকেলেই রয়ে গেলে।

প্রভাদেবী চুপ করে যায়। ক্রমশ: ওদের মধ্যে যেন একটা অদৃশ্য দেওয়ালই গড়ে উঠছে। ব্যবধানের মাত্রাটা নীরবে বেড়ে ওঠে।

প্রবীরদের গৃহ প্রবেশ উৎসবে আয়োজন হয়েছে প্রচুর। কিন্তু দেখভাল করার কেউ নাই। প্রবীর, রেখা অতিথিদের নিয়েই ব্যস্ত। সেখানেও নানা আলোচনা—ভোটের প্রক্রিয়া, এখানের পরিস্থিতি নিয়েই আলোচনা চলছে।

ওদিকে মনু মুখুয্যে এসে জুটেছে। ভাঁড়ারের দিকেই তার নজর। এর মধ্যে ছাতার মধ্যকরে কয়েক কেজি মাংস সে সরিয়েছে। এবার নজর দই-এর হাঁড়ি আর শহর থেকে আনা বড় বড় রাজভোগ-সন্দেশের দিকে।

প্রভা দেখেছে এদের অব্যবস্থা। সেইই এবার এগিয়ে আসে। এসব কাজে তার এলেম আছে। পারুলকে বলে,

—তুই ভাড়ার এর চাবিটা রাখ পারুল। যেমন যেমন বলবো জিনিস বের করে দিবি।

মনু মুখুয্যে এবার বেগতিক দেখে বলে—এসে গেছেন বৌঠান—বাঁচালেন। প্রবীর তো বলেই খালাস, কি করবো দিশে বিশে পাচ্ছিলাম না। প্রভা চেনেন ওই মানুষটিকে। বলেন প্রভা,

—তোমাকে আর ভাবতে হবে না ঠাকুরপো। তুমি নীচে গিয়ে বরং লোকজনদের বসিয়ে দাও। নাহলে এত লোক, খেতে দেরি হবে।

সমীর সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরেছে। সুবীরও এসেছে এই উৎসবে। সমীরকে সুবীর কেমন যেন এড়িয়েই চলেছে। সমীরই বলে,

—কাল একবার দুর্গাপুর যাবো তোর সঙ্গে।

সুবীর একটু অবাক হয়। বলে সে—কেন?

—কাজ আছে।

মা তখনও ফেরেনি। প্রভা ফেরেও বাড়ির সবকিছু চুকিয়ে তখন রাত অনেক। এসে স্নান করে কাপড় বদলে এক গ্লাশ দুধ নিয়ে বসে।

সমীর দেখছে মাকে। বলে সে—ও বাড়িতে খেয়ে আসোনি মা?

প্রভা কাজেই ব্যস্ত ছিল। প্রবীর রেখা দেখেছে মা ই সব ভার নিতে সব কেমন সুষ্ঠভাবেই শেষ হয়। রেখাও দেখেছে অতিথিদের আপ্যায়ণ করেও অনেক কিছু বেড়েছে।

কিন্তু তাদেরও মনে হয় নি মাকে খাওয়ানো দরকার। প্রভাদেবী কাজ শেষ করে বের হয়ে আসেন।

—চলি বাবা। রাত হয়েছে।

রেখাও ছিল সেখানে। তারা এতই ব্যস্ত-যে মা যে কিছুই মুখে দেয়নি দিন ভোর সে খেয়ালও করেনি। সমীর সেটা বুঝতে পারে।

বলে সমীর, ওরা তোমার খাবার ব্যবস্থাও করেনি মা? দিনভোর জল খেয়েই রইলে সেখানে।

প্রভা বলে—সেকি রে! পান দোক্তাতো খেয়েছি। তাছাড়া ওই মাছ মাংসের ছোঁয়া ছুঁয়ি, ওসব খাবো কি রে।

মা তবু কোন অনুযোগই করেন না। সব কিছু অবজ্ঞা সহজভাবেই মেনে নিতে পারেন। আজ সমীরের মনে হয় প্রবীর রেখারা সত্যিই বদলে গেছে। মা যে ওদের কাছ থেকে সরে থাকতে চাইবে এইটাই স্বাভাবিক ব্যাপার।

নন্দিনী ঘোষ এর বাবা বর্দ্ধমানের কোন গ্রাম থেকে দুর্গাপুর পত্তনের প্রথম দিকেই এসে স্টীল কারখানায় চাকরি পেয়েছিল। কোনমতে ম্যাট্রিক পাশ করে গ্রামে মাস্টারি করতো প্রাইমারী স্কুলে। এখানে তখন চাকরির অভাব ছিল না। ঠিক কায়দা করে ঘোষদা চাকরিতে ঢুকে পড়েছিল।

তারপর এখানেই থেকে যায়। মেয়েকেও লেখাপড়া শিখিয়ে চাকরিতে ঢুকিয়েছিল। নন্দিনীর সঙ্গে সুবীরের পরিচয় হয়। নন্দিনীরও ভালো লাগে সুবীরকে। ক্রমশ: ওদের কোয়ার্টারেও যাতায়ত করে। ঘোষদারও ছেলেটিকে ভালো লাগে। খোঁজ খবরও নিতে থাকে সুবীর সম্বন্ধে।

তবে ঘোষদার একটাই সর্ত, নন্দিনীকে বিয়ে করার পর সুবীরকে এখানেই কোয়ার্টারে থাকতে হবে। নন্দিনীরও চাকরি রয়েছে। সুবীরও চায় এখানেই থাকবে।

এর মধ্যে কোয়ার্টার পেয়েও গেছে সে।

সেদিন ঘোষবাবুর বাড়িতেই এসে হাজির হয় সমীর। ভদ্রলোকের ছেলে নেই। একমাত্র মেয়ে। নন্দিনীও রয়েছে বাসায়। সেও এসে প্রণাম করে। সমীর দেখছে নন্দিনীকে।

ঘোষবাবু বলে—এখন মেয়ে বড় হয়েছে। স্বাবলম্বী, ওরা যদি বিয়ে করতে চায় করুক। আমার যা কিছু আছে সবইতো ওর। নিজেও চাকরি করে। যা বাজার পড়েছে বাবাজী, এখন একজনের রোজগারে সংসার চলে না।

সমীরও চায় সুবীর যেন অর্থকষ্টে না পড়ে। প্রবীরদের মত অন্যায় পথে নয়—দুজনে খেটে রোজগার করে সংসার চালাবে এতো ভালোই।

ঘোষমশায় বলে—তাহলে বিয়ের দিনক্ষণ দেনা পাওনার কথাটাও যদি জানিয়ে যাও বাবাজী।

সমীর বলে—দেনা পাওনার কথা কিছু নেই। যা দিতে চান আপনার মেয়েকে দেবেন। আমাদের কোন দাবি নাই। আর দিন ক্ষণ—মায়ের সঙ্গে পরামর্শ করে জানিয়ে দেব।

—তোমার মা নাকি ঠিকমত দেননি।

সমীর বুঝেছে সুবীর অন্যায় কিছু করেনি। তাই বলে—ওর জন্য ভাববেন না। মাকে আমি মত করিয়ে নোব।

প্রভা চুপ করে সব শোনে মাত্র। সমীর এর মধ্যে দুর্গাপুর থেকে সব খবরই এনেছে। মেয়ের বাবা মায়ের সঙ্গেও কথা বলে এসেছে। নন্দিনীকেও দেখেছে।

সমীর বলে—এখন জাত পাতের কথাটা ভুলে যাও মা। মেয়েটি ভালোই। ভালো চাকরি করে। ওরা যদি সুখী হয় তুমি আর অমত করো না।

প্রভা বলেন,

—তুই বলছিস সমী?

সমীর বলে—এখন দিনকাল, সমাজ ব্যবস্থা সব বদলেছে মা। তোমাদের দিনের রীতি নীতিকে এযুগ বাতিল করে দিয়েছে। আজ এই নতুন সমাজ ব্যবস্থাকে মেনে নিতেই হবে।

প্রভাদেবীও এই কদিনের মধ্যেই দেখেছেন অনেক কিছুই। তবু বলে—সুবীর দুর্গাপুরে কোয়ার্টারে থাকবে।

—সেখানেই কাজ। তবে মাঝে মাঝে আসবে বৈকি বাড়িতে।

সমীর বলে—আজ বড় হয়েছে। যার যার নিজের বৃত্তের মধ্যেই থাকতে দাও মা। সকলকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চাইলে দুঃখই পাবে।

প্রভা বলেন—হয়তো তাইরে। মানুষ পৃথিবীতে আসে একা—এখানে এসে অনেককেই পায়। ঘর বাঁধে। তারপর ফুল ঝরার মত সব পাপড়িগুলোই একে একে ঝরে যায়। ক্রমশঃ নিঃসঙ্গ-নিঃস্ব একা হয়েই সে আবার পৃথিবী থেকে চলে যায়। খুবই বেদনার—তবু এটাই সত্যি।

সমীর চুপ করে শোনে মায়ের কথা। এইটাই জীবনের পরম সত্যদর্শন। প্রভাদেবী বলেন,

—ঠিক আছে। আমি আর বাধা দেব না বাবা। যে যার পথেই চলুক। সুখী হোক।

এ যেন প্রদীপের আলো নেভার আগেই উজ্জ্বলতর হয়ে জ্বলে ওঠা। সুবীরের বিয়ের সব ঠিক হয়ে গেছে। অনেক দিন পর সীমা এসেছে কলকাতা থেকে এই বাড়িতে।

প্রবীর-রেখারাও সব কাযের ফাঁকে মাঝে মাঝে আসছে। মিনাও এসেছে শ্বশুরবাড়ি থেকে ছেলেমেয়েদের নিয়ে। কাজের বাড়ি জম জমাট হয়ে উঠেছে। প্রভাদেবী দেখে তার নতুন প্রজন্মকেও। সমীরের একটি ছেলে—একটি মেয়ে। প্রবীরের ছেলে মেয়ে মিনার ছেলে মেয়েরাও এসেছে।

এই শূন্যঘর ক'দিনের জন্য আনন্দ কলরবে মুখর হয়ে ওঠে। সীমাও ব্যস্ত এখন। রেখা সংসারের কাজে নেই। এখন সে ভোটে জিতে এম-এল-এ হয়েছে। পদমর্য্যাদায় সে প্রবীরেরও উপরে।

প্রভা দেবীরও বয়স হয়েছে। সীমাকেই সব দেখতে হয়। মিনা অবশ্য হাত লাগায়। সে এখন গিন্নীবান্নী হয়েছে।

বিভূতিবাবুর শরীর ভালো নাই। বয়স হয়েছে তার। এখন শয্যাশায়ী—ছেলে ডাক্তার। সদর থেকে সেও যাতায়ত করছে নিজের গাড়িতে। শ্যামলীও এসেছে। বিভূতিবাবুর ছেলে বলে—বাবা, শহরেই চলো।

কিন্তু বিভূতিবাবু বলেন—না রে। গ্রামেই জন্মেছি, শেষ 'কটা দিনও এখানে থাকতে দে। যা হবার এখানেই হোক।

..সমীরও দেখতে যায় ওঁকে। ওই একটি মানুষের কাছে সে অশেষ কৃতজ্ঞ। বিভূতিবাবুও স্নেহ করেন ওকে। বলেন—সমী, জীবনে আরও আরও বড় হতে হবে। আর এই পথে চলতে হবে তোমাকে একাই। আশপাশে অনেকেই থাকবে তাদের দায়িত্বও তোমাকে বইতে হবে। কিন্তু প্রকৃত সঙ্গী তারা নয়। তুমি একাই।

..বিয়ে থার পর্ব চুকে গেছে। নন্দিনী ক'দিনের জন্য এসেছে এখানে। প্রভাদেবী নতুন বউকে বরণও করেন যথারীতি, সব কাজও করেন। কিন্তু কেমন যেন স্তব্ধ।

সমীর তার মাকে চেনে। বিভূতিবাবুর কথা মনে পড়ে। মাও যেন আজ নিঃসঙ্গ—একা।

সুবীর নন্দিনী ছুটি ফুরোলেই তাদের নিজের কোয়ার্টারে চলে যাবে। সমীরকেও ফিরতে হবে কলকাতায় সীমাকে নিয়ে। মিনাও চলে যাবে নিজের ঘরে।

প্রবীর রেখা তো সরেই গেছে। এ বাড়িতে মাকে একাই থাকতে হবে।

সন্ধ্যার পর প্রভা ঠাকুর ঘরে পুজো সেরে ছাঁদে দাঁড়িয়ে আছে। সমীরকে দেখে চাইল। সমীর বলে—মা, একা এখানে থাকবে? কলকাতায় চলো—

হাসে প্রভা—স্বামীর ভিটে, সব হারিয়ে এখানে ফিরে আবার সব পেয়েছিলাম রে। এই মাটি ছেড়ে কোথাও যাবো না। একা কেন? প্রবীর রেখা তো রয়েছে। সুবীরও কাছেই রইল—তুইও আসবি মাঝে মাঝে। কোন অসুবিধাই হবে না রে।

এমনি দিনে নতুন সেটেলমেন্টের পর্চা—খতিয়ান বের হয়। গ্রামের লোক পঞ্চায়েত অফিসে ভিড় করেছে সেই সব খতিয়ান দেখতে: জমিই তাদের সব। তাই জমির খবরটা আগে নিতে হবে।

মনু মুখুয্যেই সব খবর রাখে। সেদিন মনু মুখুয্যেই নতুন খতিয়ানের একটা কপি এনে সমীরকে দেখায়—কি হয়েছে দ্যাখো বাবাজী।

প্রভাও এগিয়ে আসেন—কি হয়েছে?

মনু মুখুয্যেই দেখায়—তোমাদের সেরা জমিগুলোর খতিয়ানে কি নাম বসেছে দ্যাখো। প্রায় বিশবিঘে সোল জমিতে তোমাদের তিন ভাই-এর নাম না বসে বসেছে শুধু প্রবীরের নাম। এটা কি করেছে প্রবীর?

প্রভাদেবীও দেখে ব্যাপারটা। তিনজনই ওই সব জমির মালিক। কিন্তু নতুন খতিয়ানে ওইসব জমির মালিক হয়েছে একা প্রবীরই। প্রভাও চমকে ওঠেন—তাইতো! সুবীর তোকে মাঠে যেতে বলেছিলাম জরিপের সময় তখন বললি মেজদা সব দেখাশোনা করছে। আর সে এই করলো? এত পেয়েও তার পেট ভরেনি। এইভাবে তোদের ফাঁকি দিল! এ আমি

হতে দোব না। দেখছি প্রবীরকে—

প্রবীর জানতো এ নিয়ে একটা গোলমাল হবেই। কাজটা সে ইচ্ছা করেই করেছিল আমিনকে ধরে। এবার সেই গোলমাল হাত প্রবীরই নিজে আসে এ বাড়িতে।

সমীর, সুবীরও রয়েছে। ওরা কিছুই বলে না। সমীর বিস্মিতই হয়েছে প্রবীরের এই কাজে। প্রভাই বলে,

—এটা কি করেছিস প্রবীর?

প্রবীর বলে—জানি এ নিয়ে কথা উঠবেই। বিশ্বাস করো মা—এসবের কিছুই জানতাম না। পড়চা খতিয়ান দেখে আমিই তো অবাক। ছিঃ ছিঃ কি বিশ্রী কাণ্ডই না করে গেছে ব্যাটা আমিন।

—তুই কিছু জানিস না? প্রভা বলে ওঠেন,

প্রবীর বলে— না মা। এসব দেখে আমিই এ্যাই দ্যাখো—কোর্ট পেপার এনেছি। বড়দা, সুবীর সই করে দিক এই আপত্তিনামায়—আমি সদরের অফিসে রেকর্ড সংশোধন করিয়ে দিচ্ছি। বড়দা—সুবীরকে ফাঁকি দেব আমি? ছিঃ ছিঃ।

—সই করে দাও বড়দা, সই কর সুবীর। এসব ঠিক করিয়ে নিচ্ছি। সমীর, সুবীর সই করে দেয়। প্রবীর কিছুক্ষণ থেকে ফিরে যায়।

মনু মুখুয্যে সবই দেখেছে। বলে সে প্রভাকে।

—বৌঠান, ব্যাপারটা কেমন গোলমেলে মনে হচ্ছে। জরিপের সময় এতবড় কাণ্ডটা ঘটলো প্রবীর জানে না? এখন আপত্তিনামা যদি জমা না দেয়?

প্রভা আজ এটা ভাবছে। মনু মুখুয্যে বলে,

—বলো তো আমিই আর একটা দরখাস্ত ওদের অফিসে দিয়ে আসি। খরচা তেমন কিছুই হবে না—ধরো শতখানেক।

সমীর বলে—তার দরকার হবে না মনুকাকা, এরপরও যদি প্রবীর না দিতে চায় কিছু করার নাই। ওইই নিক ওই জমি। মানুষের লোভকে ঠেকানো যায় না।

প্রভা বলে—না। আমিই আপত্তি করবো। এ আমি হতে দেব না। মনু ঠাকুরপো—তুমি অপিসে খোঁজ নাও আপত্তি জমা পড়লো কিনা। তারপর যা করার আমিই করবো। একদিন বহুকষ্টে এসব সম্পত্তি আমি বের করেছিলাম—অন্যায় ভাবে একজন লুটে নেবে তা হতে দেব না।

..সুবীর নন্দিনী চলে গেছে নিজেদের বাসায়। মিনাও ফিরে গেছে তার শ্বশুরবাড়িতে। সমীররাও কলকাতায় ফিরছে। প্রবীর রেখা নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত।

আজ শূন্য পুরী।

সমীর মাকে প্রণাম করে। দূর অতীতে সমীর মাকে প্রণাম করে নিঃস্ব অবস্থাতেই বের হয়েছিল মহানগরীর পথে ভাগ্য অন্বেষণে। সেদিন তার ঘাড়ে ছিল ছোট ভাই বোনদের দায়িত্ব, মা তখন অসহায়। বাবাও নেই।

সেই নিঃস্ব সমীর আজ মহানগরীতে নিজের ঠাঁই করে নিয়েছে। আজ ভাইরাও স্বনির্ভর, বোনও নিজের ঘরে সুখেই রয়েছে। সবাই সার্থকতা—পূর্ণতার প্রসাদ পেয়েছে।

কিন্তু প্রভাদেবী!

তিল তিল করে নিজের সবকিছু দিয়েছে তার সন্তানদের—নিজের নিঃস্বতা—

নিঃসঙ্গতার বিনিময়ে। আজ সে একা। কোন অভিযোগ নেই কারো বিরুদ্ধে। রুদ্ধ কণ্ঠে বলে প্রভা,

—ভালো থাকিস বাবা। তোরা ভালো থাকিস। সমীর দেখে যেন বিধাতার জীবন কাব্যে এক চির উপেক্ষিতা জননীকে।

গ্রাম ছেড়ে আসছে সমীর, লালমাটি শালবন, মহুয়ার পত্রহীন গাছে ফুলের মঞ্জরী, রাতের স্নিগ্ধতায় তারা ফুটে উঠবে—আবার ঝরে যাবে শুকতারার বিষণ্ণ চাহনিতে নিশিভোরের শেষ লগ্নে। তাদের সৌরভময় জীবনের পরমায়ু মাত্র কিছুক্ষণের জন্য—মানুষের জীবনের মতই। তবু মানুষের যাত্রা থামে না।

সমীর এগিয়ে চলেছে, পিছনে হারিয়ে গেল তার গ্রাম সীমা, মায়ের সজল চাহনি। তার পথ চলেছে সামনে—অনেক দূরে। এই সংসার এর সব অভিজ্ঞতা-জ্বালা-আঘাত—সব ছাপিয়ে মায়ের কথাই মনে পড়ে। ওই যেন তার জীবনের অনেক বড় পাওয়া। এই পাওয়ার তৃপ্তিই তাকে পথ চলার অনুপ্রেরণা দেয়।

——o——